সৈয়দ শামসুল হক

মাজনে এন্তুব্য

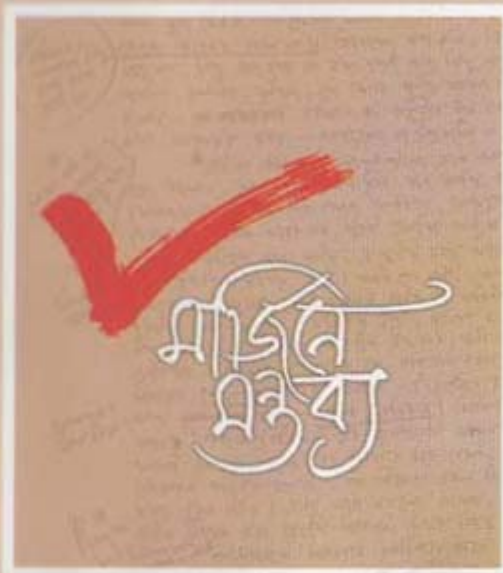

লেখা শেখার বই এটি কোনো অর্থেই নয়। বরং একে লেখার কলাকৌশলের দিকে আমাদের চোখ ফেরাবার বই বলা যেতে পারে। আমি কিছু সংকেত ও ভাবনা উপস্থিত করতে চেয়েছি। আশা এই, এ থেকে একজন নবীন লেখক উদ্বুদ্ধ হবেন আরো অনেক গভীরে ভাবতে এবং নিজের কলমের দিকে নতুন করে তাকাতে। তারপরও একটি কথা না বললেই নয়। সৃষ্টিশীল লেখক তাকান ভবিষ্যতের দিকে; ভবিষ্যতই তাঁর অবলম্বন। আর, লেখা সম্পর্কে যাবত আলোচনাই অতীত নিয়ে, যা লেখা হয়ে গেছে সে-সকল নিয়ে। লেখা শেখার আলোচনাও এক অর্থে অতীত কলাকৌশলেরই আলোচনা। এই দুই বিপরীত কালের ভেতরে সংঘর্ষ তো একটা হতেই পারে। সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর ভবিষ্যতমুখী কলমকে তিনি চালাতেই পারেন পুরোপুরি নিজের উদ্ভাবনায়।

... আমি আমার সামান্যই যা জানা ও বোঝা এ বইয়ে তার খানিক লিপি রেখে গেলাম।

... লেখা আমার কাছে প্রেমে পড়বার চেয়েও অনেক বেশি উত্তেজক ও ব্যক্তিগত, দূরাভিলাষী ও উচ্চয়নশীল। আমার এই বিশেষ প্রেমটির ইঙ্গিত ও ইতিহাস পাওয়া যাবে এ বইয়ে।

— সৈয়দ হক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :: কাইয়ুম চৌধুরী

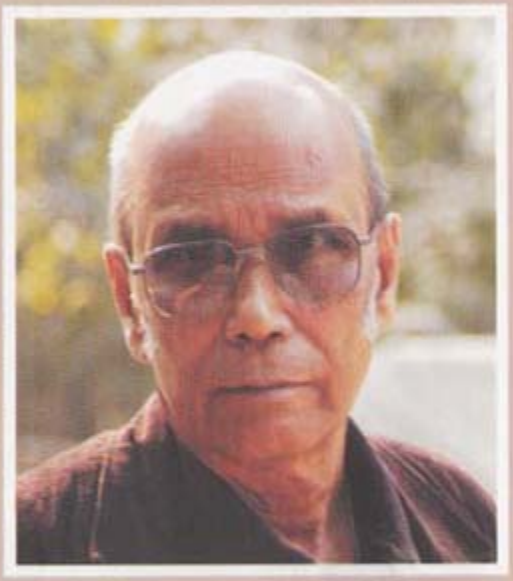

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

জন্মস্থান : কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ

পিতা : ডা. সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন

মাতা : সৈয়দা হালিমা খাতুন

শিক্ষাজীবন : কুড়িগ্রাম ও ঢাকা
মানবিক শাখা, বিজ্ঞান শাখা এবং ইংরেজি ভাষা সাহিত্য

পেশা : লেখা

প্রিয় : বই ও ভ্রমণ

গ্রন্থ সংখ্যা : কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ মিলে প্রায় দুইশ

পুরস্কার : কবিতায় আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, সমগ্র সাহিত্য কর্মের জন্যে বাংলাদেশের প্রধান পুরস্কারসমূহের মধ্যে— নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, জেবুন্নেসা-মাহবুবউল্লাহ্ স্বর্ণপদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কার, পদাবলী পুরস্কার,
রাষ্ট্রীয় একুশে পদক এবং স্বাধীনতা পদক

স্ত্রী : আনোয়ারা সৈয়দ হক

সন্তান : বিদিতা সৈয়দ হক
দ্বিতীয় সৈয়দ হক

বসবাস : ঢাকা ও লন্ডন

আলোকচিত্র :: বিশ্বজিৎ সরকার

মার্জিনে মন্তব্য

গল্পের কলকব্জা : কবিতার কিমিয়া

সৈয়দ শামসুল হক

অন্যপ্রকাশ

মার্জিনে মন্তব্য

কবিতা-প্রদোষে সান্নিধ্য যাঁদের পেয়েছি
জসিমউদ্দিন, আবুল হোসেন,
আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ

গদ্য-সূচনায় সারথী যাঁদের পেয়েছি
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শওকত ওসমান,
ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী

গভীর কৃতজ্ঞতায় এঁদের স্মরণ করি

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

মার্জিনে মন্তব্য

প্রেমপত্র ১৯
শিল্পী ও মিস্তিরি ২০
তরতর করে লিখে ফেলা ২২
মারাত্মক গুজব ২৫
লেখা শেখা ২৭
প্রতিদিনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা ২৯
ভাব আছে ভাষা নেই ৩১
ভাব ও ভাষার সম্পর্ক ৩৪
সাহিত্যের গদ্য কানে শোনার জন্যেই লেখা ৩৬
গদ্যের ভেতরে গতি ও ভঙ্গি ৩৮
বিষয় থেকে লেখকের অবস্থান ও দূরত্ব ৪১
দূরত্ব নির্মাণ ৪৩
দূরত্ব বদলে দেয় গদ্যের চাল ৪৫
গল্পে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপ ৪৭
ক্রিয়াপদের কালরূপে তৈরি হয় জাদু ৪৯
কালচেতনা ও কালরূপ ৫২
ক্রিয়াপদের কালরূপ নির্বাচন ৫৩
একই লেখায় যখন ক্রিয়াপদের একাধিক কালরূপ ৫৬
গল্পের শরীরে সংলাপ ৫৮
সংলাপ সতর্কতা ৬১
বর্ণনা থেকে সংলাপকে আলাদা করা ৬৩
মনের মধ্যে ছবি তৈরি ৬৭
বিষয়ের চেয়ে গদ্যকে বড় করে দেখা ৬৯
গদ্যের জাদু কোথায় ৭১

গদ্য আর পদ্য ৭৩
ভাষার সীমাবদ্ধতা ও লেখকের জিৎ ৭৬
কল্পনা আর উদ্ভাবন ৭৮
গল্পের খোঁজে ৮০
গল্পের জনপদ ৮৪
গল্প-উপন্যাসের গতিছন্দ ৮৫
লেখার স্থান ও সময় ৮৮
চলতি গদ্য ৯২
অনুবাদ ৯৪
লেখা শুরু করার বয়স ৯৬
উপন্যাস আর ছোটগল্প ৯৭
লেখকের ক্ষমতা ও বিবেক ৯৯
গল্পের বিষয় হিসেবে একাত্তর ১০১
সমালোচনার দৌড় ১০৫
লেখার গভীরে বিস্ফোরক ১০৮
কালের ধুলায় লেখা ১১২
ভাষার পরম্পরা ১১৫

গল্পের কলকব্জা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প *পোস্টমাস্টার* ১২১
পোস্টমাস্টার গল্পের কলকব্জা ১২৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প *নিশীথে* ১৩৪
নিশীথে গল্পের কলকব্জা ১৪৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র-র গল্প *তেলেনাপোতা আবিষ্কার* ১৫৪
তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পের কলকব্জা ১৬৩
জগদীশ গুপ্ত-র গল্প *দিবসের শেষে* ১৭৭
দিবসের শেষে গল্পের কলকব্জা ১৮২
মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প *ভয়ংকর* ১৯১
ভয়ংকর গল্পের কলকব্জা ১৯৮

কবিতার কিমিয়া

কবিতা কেন লেখা ২০৯
কবিতায় অর্থের শিবত্ব ২১৩
কবিতা লেখার শুরু ও ছন্দ তখন ২১৫
ছন্দটা কী ২১৯
গদ্য-ছন্দ : ভাব-ছন্দ ২২১
কবিতা কী করে হয় ২২৫
জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন : কিমিয়ার সন্ধানে ২৩০
রবীন্দ্রনাথের *শা-জাহান* : মহত্ত্বের দিকে ধাবন ২৩৫
কবিতায় প্রতীক হবে কতখানি স্পষ্ট ২৪৩
কবিতার ভেতরে কবি-চরিত্র ও তার দেখা বাস্তবতা ২৪৫
কবিতার সাঁটলিপি ২৫৩
অবচেতন থেকেও উঠে আসতে পারে কবিতা ২৫৬
কম্পিউটার যখন যুগ্মকবি ২৬০
কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে ছবিতা ২৬৫
একদা এক রাজ্যে এবং গদ্যছন্দ ২৭০
কয়েকটি খসড়ার পর একটি কবিতা ২৭৩
কবি কিনা প্রতিমাশিল্পী ২৮০
বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা : কবি ও কবিগণ কিভাবে ২৮২
সনেটের অধিকার ২৮৭
কবিতা এখন ২৯০
নেরুদার সাবধানবাণী ২৯১
সংবাদ তথ্য এবং কবিতা ২৯২
কবিকণ্ঠে কবিতার উচ্চারণ ২৯৪
শব্দ : সংগত ও অসংগত ২৯৬
কবি ও চিত্রকরের এই একটা মিল ২৯৮
কবিতা ছাড়া দেবার আর কিছু তো নেই ২৯৯
ভাব ও ছন্দ ৩০১
কবিতার কিমিয়া : টুকরো কিছু কথা ৩০৩

ভূমিকা

লেখাটা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর কাছে শিখতে হয় হাতেকলমে। গুরু সবসময় প্রত্যক্ষ কেউ নাও থাকতে পারেন— না থাকাটাই স্বাভাবিক। লেখা শেখা হয় অন্যের লেখা পড়ে, শেখা চলে পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে। পড়ারও দু'রকম আছে। শুধু যে *ভালো* লেখকের লেখা পড়ে শেখা যায় তা নয়, *খারাপ* লেখকের কাছেও শেখবার আছে। তাঁর কাছে শেখা যায় সবচেয়ে বড় শেখা যে ওইরকম লিখতে নেই! ভালো খারাপ দু'জাতের লেখকই আমাদের শেখান।

শেখার শেষ নেই। প্রতিদিন শিখেছি, পঞ্চাশ বছর পরে এখনো শিখছি। রবীন্দ্রনাথের এক লেখা থেকে আরেক লেখায় আঙ্গিকগত যে উত্তরণ লক্ষ করি, সেটাও তাঁর ওই প্রতিদিন শেখার ফলেই। নিজের লেখা থেকেও শেখবার আছে। সব লেখকেরই একটা পর্যায় আসে যখন সে নিজেই নিজের কাছে শিখতে থাকে। টি এস এলিয়টকে একবার এক তরুণের কথা বলা হয়েছিলো— সে কবিতা লেখে, আপনাকে তার কবিতা দেখাতে চায়। এলিয়ট জানতে চেয়েছিলেন, তার বয়স কত ? বয়সটা পঁচিশ শুনেই এলিয়ট বলেছিলেন, *ওকে ওর চল্লিশ বছর বয়সে আসতে বোলো, তখনো যদি কবিতা লেখে তবে যেন সে আমার সঙ্গে দেখা করে।* আসলে এলিয়ট যেটি বলতে চেয়েছিলেন, প্রথম বয়সে ঝোঁকের মাথায় আমরা অনেকেই লিখতে শুরু করি, লিখেও চলি, কিন্তু প্রায় সবারই আগুনটা একসময় নিভে যায়; আগুন কেবল তাদেরই থাকে যারা লেখার কলাকৌশল নিয়ে ভাবে, নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়। এই খুঁজে পাওয়াটার পেছনে নিরন্তর শ্রম দিতে হয়, সজাগ থাকতে হয়, ভাব-উত্তেজিত থেকে যাবার বদলে রচনা-শিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়।

একজন লেখককে বড় হতে হলে তাকে হতেই হয় তার লেখারই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে নিরপেক্ষ সমালোচক। আত্মসমালোচনার পথেই আসে উত্তরণ, হয় ভালো থেকে আরো ভালো লেখা। লেখার জন্যে মহৎ বিষয় পথে পড়ে পাওয়া যায়। লেখাটি মহৎ হয়ে ওঠে, কিম্বা যোগ্যই একটি লেখা, সে কেবল আঙ্গিকের কারণে। আমি যাকে বলছি আত্মসমালোচনা, জীবনানন্দ দাশ তাকেই বলেছেন— আত্মোপকার। এই সূত্রে তিনি কবিদের বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা ভাষাশিল্পের সব লেখকের জন্যেই সত্য : *কবি যখন তাঁর একটি কবিতা লেখা শেষ করেন, তখন হয় তা সফল হল, না হয় হল না। কি তা হল সবচেয়ে আগে কবির নিজেরই কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পীমানসের গঠনের ভিতর এই কঠিন আত্মোপকার প্রতিজ্ঞা রয়েছে; তিনি অতীত বা আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক যাই হন না কেন।*

কবি ডব্লু এইচ অডেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা-অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল। বিলেতে রাজকবি নিয়োগের প্রথা আছে, এরই গণসংস্করণ হচ্ছে অক্সফোর্ডের ওই কবিতা-অধ্যাপকের আসনটি; রাজকবির মতো দরবারের ফরমাশে তাঁকে কবিতা লিখতে হয় না, তাঁকে কবিতা বিষয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করতে হয় কেবল এবং কবিতা সংক্রান্ত প্রশ্ন কারো থাকলে উত্তর দিতে হয়। সেই অডেনকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিলো : কবিযশোপ্রার্থী কারো জন্যে আপনার কী উপদেশ ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, *প্রথমেই আমি জিগ্যেস করবো কেন সে কবিতা লিখতে চায়। যদি সে বলে, লিখতে চাই কারণ আমার কিছু বলবার আছে— তাহলে আমি বলবো কবি হবার আশাই সে করতে পারে*

না। কিন্তু সে যদি বলে, কবিতা লিখতে চাই কারণ আমি শব্দের চারধারে থাকতে চাই, শুনতে চাই পরস্পর কী তারা বলে, তবে অন্তত এটুকু বলা যাবে যে কাব্যকলার মৌলিক বিষয়ে তার উৎসাহ রয়েছে এবং কবি হবার আশা সে করতে পারে।

অর্থাৎ কবিতার ভেতরে শুধুই যারা বাণী খোঁজে, বাণী চায়, তারা কবিতা কী দিতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। শুধু কবিতা কেন, ভাষায় রচিত সকল লেখাই আঙ্গিকের ব্যাপার। এমনকি শিশুকে তার মায়ের মুখে মুখে বলা রূপকথার গল্পও তাই, দুর্ঘটনা থেকে ফিরে আসা আহতের জবানবন্দিও তাই। আঙ্গিকটাই আমাদের মনে রচনা করে বক্তব্যের জগত, বক্তব্যের বিভা, বক্তব্যের সংকেত। সংকেতের পর সংকেতে আমরা একটা পৃথিবী নির্মাণ করি আমাদের করোটির ভেতরে। এই হচ্ছে সাহিত্য।

কবি রবার্ট ফ্রস্টের একটি ঘটনা আছে। একবার তিনি একটি সমাবেশে বলছিলেন তাঁর কবিতার আঙ্গিকের কথা, আলোচনা করছিলেন তাঁরই কবিতার ছন্দ মিল পদবিন্যাসের কিমিয়া। শ্রোতাদের ভেতর থেকে এক ভদ্রমহিলা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন; বললেন, কিন্তু মিঃ ফ্রস্ট, আপনার এত সুন্দর কবিতাগুলো লেখার সময় কি ওইসব খটমটো কারিগরি কথাগুলো মাথায় রেখেই লেখেন? এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রবার্ট ফ্রস্ট বলেছিলেন, *শুধু মাথাতেই রাখি না, বরং আমি কাব্যকলা আর কবিতার আঙ্গিকের ওইসবে ভীষণ আলোড়িত থাকি!*

আঙ্গিক, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য নয়; এটি অর্জনের ব্যাপার। এই অর্জনও কেবল আঙ্গিকচর্চার পথে সম্ভব নয়; ওটি আসে জীবনের প্রতি, জীবন থেকে পাওয়া বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দৃষ্টিভঙ্গির এই নিজস্বতাই লেখকের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ, আর, এই দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতাই এক লেখক থেকে আরেক লেখককে আলাদা করে। দৃষ্টিভঙ্গি, শেখবার বা শেখাবার নয়। ওটি আসে অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই আলো ধরেই একসময় গড়ে ওঠে একজন কবির একজন লেখকের বিশেষ প্রবণতা— ভাষা ব্যবহারে, বাক্য গঠনে, ছন্দ নিরূপণে, বলবার ভঙ্গিতে ও সঙ্গীতে। আঙ্গিকের ভেতরে যে মিস্তিরির দিক আছে, তার শিক্ষা আমরা সাহিত্যপাঠ ও বিশ্লেষণ থেকে পেতে পারি। তাই লেখা যদি শেখারই ব্যাপার হয়, তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পড়া, পড়া এবং পড়া। অপরের লেখা পড়া, এবং নিজের লেখার দিকে ফিরে ফিরে তাকানো।

আমি যদি একে বলি লেখার মিস্তিরির দিক, রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে সেই ১৩০১ সনেই একে বলে গেছেন উদ্যম আর গৃহিনীপনা। লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের কথা কি এখনো আমাদের মনে পড়ে? স্বজন-পরিচয়ে ইনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজদাদা, নিজগুণে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট এক লেখক। আর কিছু আমাদের মনে না পড়ুক, সঞ্জীবচন্দ্রের একটি বাক্য আমাদের মনে পড়বে— প্রায় প্রবাদে পরিণত— তাঁর ভ্রমণকাহিনী *পালামৌ* থেকে : *বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে*। রবীন্দ্রনাথ এই বইটিরই সমালোচনা লিখতে গিয়ে খেদ করে বলেছিলেন,

তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিনীপনা ছিল না। ভালো গৃহিনীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে। যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিনীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সে-স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে-পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই। তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিনী নহে।

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘই দিলাম। বিষয়টা এতে স্পষ্ট হবে আশা করি। লেখা শুধু ভাব আর প্রতিভার ওপর নির্ভর করে না, তার জন্যে যত্ন আর অনুশীলন চাই; ক্ষমতা থাকাটা কিছু নয়— ক্ষমতাকে ব্যবহার করাটাই আসল— সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলোতে এরই সমর্থন পাই।

আমি অনেক সময় লঘু মেজাজে বলি, লেখাটা মানুষ খুন করার মতো। খুন সর্বোচ্চ একটি অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধকর্মের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। চোরের আছে, ডাকাতের আছে, পকেটমারের আছে প্রশিক্ষণ; পেশাদার খুনী বাদে আর সকল খুনিই ঝোঁকের মাথায় খুন করে। লেখাও তেমনি, একদিন আমরা হঠাৎই শুরু করি ঝোঁকের মাথায়। খুনটা করে ফেলবার পর খুনী যেমন আঁতকে ওঠে, আহ্, আমি খুনী; একজন প্রথম লেখাটির অক্ষরপাত করে উঠেই, আঁতকে নয়— এখানে তফাৎ— আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন— আমি লিখে ফেলেছি। তারপর ঝোঁকের মাথায় খুন-করা কোনো কোনো খুনী হয় পেশাদার খুনী, ঝোঁকের মাথায় লিখতে শুরু করে কেউ কেউ লেখক হয়ে পড়েন। শেখার কাজটা তাঁকে শিখতে হয় লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে। তারপর একদিন সে নিজেরই একান্ত এক বা একাধিক আঙ্গিক উদ্ভাবন করে বসে।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে ছোটবেলার কবিতা, কিম্বা জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিকের কবিতা, কিম্বা ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদারের যুবাকালে লেখাগুলো নিবিড়ভাবে পড়লেই আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো কীভাবে তাঁরা প্রথমত প্রচলিত আঙ্গিক ও ভঙ্গির ভেতরে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছেন এবং অচিরে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন আপন কণ্ঠ, নিজস্ব আঙ্গিক। এবং সেটিও স্থির থাকে নি এক চেহারায়, ক্রমেই তাঁর বদল ঘটেছে। রামকৃষ্ণ ভক্তজনদের সঙ্গে গিরগিটির মিল দেখতে পেতেন। গিরিগিটির কণ্ঠনালী রঙ পালটায়, কিন্তু সে গিরগিটিই থেকে যায়, চিনতে তাকে ভুল হয় না লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে নীল হয়ে গেলেও। কবি ও লেখকেরাও তাই— নানা আঙ্গিকের ভেতরেও একজন রবীন্দ্রনাথকেই আমরা দেখে উঠি।

লেখার সেই শুরুর সময়ে কেউ একজন যদি লেখার মিস্তিরির দিকটা ধরিয়ে দেন তো সময় বাঁচে। হারমোনিয়ামে ওস্তাদের সাহায্যে একদিনেই সা-রে-গা-মা চিনে নেয়া সম্ভব। ওস্তাদ যদি না থাকতেন, আর হারমোনিয়াম যদি হাতে পেতাম, বিশ বছর টিপতে টিপতে একদিন ঠিকই সা-রে-গা-মা খুঁজে বের করতে পারতাম। তারপরে তো গান! মাঝখান থেকে বিশটা বছর চলে যেত স্বর আবিষ্কারেই। লেখার ব্যাপারেও ওই কথা। গুরু পেলে বিশটা বছর বেঁচে যায়। আমারই আক্ষরিক অর্থে বিশ বছর লেগেছে বাংলা ক্রিয়াপদের নানা রূপ আর তাদের একেক রকম মেজাজ ও প্রয়োগ বুঝতে। ওই বিশটা

বছর আমি আর ফেরৎ পাব না। আমার প্রথম বিশ বছরের অনেক লেখাতেই দাগ রয়ে গেছে কাঁচা শিক্ষানবিশীর। বিষয়ের দিক থেকে যতটা উচ্চতায়, তার অনেক নিচেই থেকে গেছে তখন আমার আঙ্গিকবোধ ও গদ্য-পদ্যের ভাস্কর্য নির্মাণ।

উনিশশ' আশির দিকে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* পত্রে *মার্জিনে মন্তব্য* শিরোনামে ধারাবাহিক একটি কলাম লিখছিলাম। তখন এই রকম একটা ইচ্ছে ছিল, বিশটা বছর যদি নবীন লেখকের বাঁচিয়ে দিতে পারি! তার কিছুদিন পরে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন লেখকের কয়েকটি ছোটগল্প ঘড়ির মতো খুলে মেলে ধরে দেখাতে চেষ্টা করেছি ভেতরের দাঁত ও চাকার কাজগুলো। ওই লেখাগুলো একসঙ্গে নিয়ে একটা বইও বের হয়েছিল তার পরপরই। তখন অনেকেই বলেছিলেন— হা আমার ভাগ্য! আপনার এ বই পড়ে যাওবা লেখার কথা ভাবছিলাম, সর্বাংশে কর্পুর হয়ে উড়ে গেল!

তারপরও সে বইয়ের কাটতি এতটা ভালো দেখি যে, আমার আনন্দ হয় বইটি তবে অনেকেরই কাজে লেগেছে। আমি এমনও দেখি আমারই গল্পের কলকজা-র কোনো কোনো পর্যবেক্ষণ তরুণ লেখক কেউ তাঁর নিজের প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন উদ্ধৃতি-সংকেত ছাড়াই, যেন তাঁরই নিজের কথা। ওই আত্মসাৎ থেকেই বুঝে উঠি আমার পর্যবেক্ষণ এখন রাজসম্পত্তি হয়ে গেছে। এটা তখনই হয় যখন কারো কথা হাওয়ার মতো অমনি আমরা পাই ও বিনাশুল্কে তা শ্বাসপ্রশ্বাসে টানি। ক্রুদ্ধ হবার বদলে আমি তৃপ্তই হই আমার কথাগুলো সর্বজনের হয়ে যাওয়া দেখে। অনেকদিন আর ছাপা ছিলো না বইটি; এতদিনে, শেষ মুদ্রণের প্রায় দশ বছর পরে নতুন করে যখন উদ্যোগ নিই এ বই প্রকাশের, তখন দেখি আমার হাতে আরো কিছু লেখা জমে উঠেছে ওই লেখা নিয়েই। তাই এবারের মুদ্রণকে আর নিছক মুদ্রণ বলা যাবে না, সংস্করণও বলা ঠিক হবে না; এটি এখন নতুন বই। ভাষা আর ভাষায় সৃষ্টিশীল লেখার দিকে চিন্তা উস্‌কে দেবার বই।

প্রতিদিনের জীবনে আমরা ভাষা ছাড়া চলতে পারি না। অবিরাম ভাষা ব্যবহার করে চলি— সংসারে, কাজের জায়গায়, হাটেবাজারে, তর্কে, ঝগড়ায়, ভালোবাসায়, শাসনে, ক্রোধে, আনন্দে, এবং তুচ্ছ বা তুচ্ছ নয় এমন লাখো পরিস্থিতিতে। ফলে, আমাদের একটা ধারণা জন্মেই যায় যে, ভাষা আমাদের এতটাই আয়ত্বে যে তা দিয়ে সাহিত্য রচনার মতো কাজও সাংসারিক আর দশটা প্রয়োজনের মতোই অবিকল অবলীলায় করে উঠতে পারব। তা পারা যায় না! যে কাউকে অনুরোধ করুন, একটা গান শোনান তো! তিনি করজোড়ে বলবেন, আমি তো গান জানি না। নাচতে বলুন, তিনি আঁতকে উঠবেন। ছবি আঁকতে বলুন, ভাববেন আপনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু বলুন, একটা গল্প লিখতে। তিনি আঁতকেও উঠবেন না, করজোড়ে মাফও চাইবেন না। তাঁর মুখে শুনবেন— হাঁ, বসলে কি আর আমিও একটা গল্প কেন, উপন্যাসও হয়তো লিখে ফেলতে পারি। সময় আর স্বস্তির অভাবেই যেন লেখা তাঁর হয়ে উঠলো না!

এতেই বোঝা যাবে, লেখা ব্যাপারটাকে মানুষ খুব একটা বিশেষ প্রশিক্ষণ, চর্চা আর পারঙ্গমতার কাজ বলে মনে করে না। গায়কের গানের মতো, চিত্রকরের ছবি আঁকার মতো, নর্তকের নৃত্যের মতো, সাহিত্য রচনার জন্যেও ভাষা যদি আমাদের শিক্ষা ও রেওয়াজ করে নেবার ব্যাপার হতো তাহলে এত কম জেনে এত বড় মাপের কাজ— সাহিত্য রচনায় হাত আমরা দিতে পারতাম না।

এ সব কথা এ বইয়ের ভেতরে কিছুটা ভেঙে বলবার চেষ্টা করা গেছে। এখন এই যে বইটি, প্রথম সংস্করণ থেকে এর বিস্তার অনেকটাই ঘটিয়েছি। শুধু গদ্যই আর নয়, কবিতাকেও এনেছি। আর, প্রসঙ্গক্রমে আমার নিজের পড়া ও লেখার কিছু কথাও এসে গেছে। এসে গেছে, বিশেষ করে কবিতাখণ্ডে, আমার নিজের কয়েকটি কবিতা যে-কিমিয়ায় গড়ে উঠেছে, তার খানিক ইঙ্গিত। এ অংশটুকু হয়তো আরো নিবিড় করে বুঝতে হলে— আমার অনেক কবিতার বইই ছাপা নেই বহুকাল, এখন সে সকল সংকলিত হয়েছে আমার *কবিতা সংগ্রহ*-এ— খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত সে সংকলন হয়তো পাঠককে হাতে নিতে হবে। এর অর্থ কোনোক্রমেই এ নয় যে, আমি আমাকে কবিতা শেখার আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছি; বরং এমন— দেখাতে চেয়েছি কোন্ প্রক্রিয়া ও ভাবনায় একজনের কলম কিছু লেখে।

আমি যে আমারই কবিতা নিয়ে এই পর্বে কথা কয়েছি অধিক, তার একটা আরো যুক্তি আছে। আমার ধারণা, ভাষা-শিল্পের ভেতরে কবিতাই হচ্ছে সেই একমাত্র মাধ্যম যার অন্তর্গত কিমিয়াটি— বিষয় ও উপস্থাপনার দিক থেকে— কবির একেবারেই একান্ত নিজস্ব। এ জন্যেই কথাসাহিত্যিকের রচনা কৌশলের সঙ্গে আমি মিস্তিরি বা কলকব্জার মতো প্রায়োগিক শব্দ ব্যবহার করলেও কবিতার বেলায় বলেছি কিমিয়া— যেন সেই কিমিয়া, লোহাকে সোনা করবার অসম্ভব সেই কিমিয়া যার সন্ধানে প্রাচীন পণ্ডিতেরা জীবনপাত করেছেন। ভাষাশিল্পের সবচেয়ে সংকেতময় আঙুলটি ধারণ করে কবিতা।

কবিতা যেহেতু সবটাই মন-সংকেত-নির্ভর, গল্প উপন্যাস বা নাটকের মতো প্রত্যক্ষ বাস্তবতা এবং ঘটনা নির্ভর নয়, তাই এর সৃষ্টির দিকটাও অনেকটাই যেন মাতৃগর্ভের মতো গোপন ও অন্ধকার, পিচ্ছিল ও জন্ম-রসে এর ভ্রূণটি মজ্জমান। আমি তাই একে কিমিয়াই বলতে চাই। কবিতার কিমিয়া। আবার, এ কিমিয়া আলোচনাতেও ঠিক-ঠিক ধরা যাবে না; আভাসমাত্র দেয়া যাবে; নিজের হাতে করে-কম্মালেই কেবল পাওয়া যাবে এর রসায়নটির অধিকার।

বলে রাখা ভালো, লেখা শেখার বই এটি কোনো অর্থেই নয়। বরং একে লেখার কলাকৌশলের দিকে আমাদের চোখ ফেরাবার বই বলা যেতে পারে। আমি কিছু সংকেত ও ভাবনা উপস্থিত করতে চেয়েছি। আশা এই, এ থেকে একজন নবীন লেখক উদ্বুদ্ধ হবেন আরো অনেক গভীরে ভাবতে এবং নিজের কলমের দিকে নতুন করে তাকাতে। তারপরও একটি কথা না বললেই নয়। সৃষ্টিশীল লেখক তাকান ভবিষ্যতের দিকে; ভবিষ্যতই তাঁর অবলম্বন। আর, লেখা সম্পর্কে যাবত আলোচনাই অতীত নিয়ে, যা লেখা হয়ে গেছে সে-সকল নিয়ে। লেখা শেখার আলোচনাও এক অর্থে অতীত কলাকৌশলেরই আলোচনা। এই দুই বিপরীত কালের ভেতরে সংঘর্ষ তো একটা হতেই পারে। সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর ভবিষ্যতমুখী কলমকে তিনি চালাতেই পারেন পুরোপুরি নিজের উদ্ভাবনায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার বড় প্রিয় একজন চিত্রকর পল গঁগার কথা। উনিশ-বিশ শতকের অন্যতম প্রধান শিল্পী তিনি; তাঁর প্রভাব আমাদের সমসময় পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি ছবি আঁকা শেখেন নি কোনো স্কুলে; অনেকটা একজন লেখকের মতোই তিনি ছিলেন পুরোপুরি স্বশিক্ষিত; স্বনির্বাসিত তাহিতি দ্বীপে উনিশ শ' তিন সালের আটই মে তাঁর মৃত্যু হয়। এর মাত্র দিন দশেক আগে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু ফরাসি কবি-সমালোচক চার্লস মরিসকে। সেই চিঠিতে পল গঁগা লিখছেন : *অপরের*

কাছে দেখে দেখে আমি যা কিছুই শিখেছি, পদে পদে সে-সকলই আমার ছবি আঁকায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে এটাও তো সত্য, ছবি আঁকার কত সামান্যই না আমি জানি। তবে ওই সামান্যটুকুর প্রতিই আমার পক্ষপাত, কারণ ওইটুকুই আমার নিজস্ব, আমার উদ্ভাবিত। একদিন আমার এই সামান্যটুকুই ব্যবহার করে কেউ একজন বড় কিছু করতে পারবে কিনা, কে জানে! সেই পল গঁগার মতো আমিও আমার সামান্যই যা জানা ও বোঝা এ বইয়ে তার খানিক লিপি রেখে গেলাম।

সচেতনভাবে লেখা আমি শুরু করি উনিশ শ' বায়ান্ন সালের নভেম্বর থেকে। ততদিনে শামসুর রাহমান এসে গেছেন, আরো এসেছেন হাসান হাফিজুর রহমান— যিনি আমার কবিতা লেখার প্রবর্তক, এসেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্। আমি আমাদের এই প্রজন্মকে চিহ্নিত করি ভাষা আন্দোলনের সন্তান হিসেবে। ওই আন্দোলন আমাদের জন্যে ছিলো আরো এক মাত্রার— আমরা এই ভূখণ্ডের মানুষকে সাহিত্যে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি যে এতপ্রকার লেখা লিখেছি এবং এখনো লিখে যাচ্ছি, তা ভেতর-কথা প্রকাশের চাপে তো বটেই, আরো অন্তত একটি উদ্দেশ্যে— সে হচ্ছে, দরোজার পর দরোজা খুলে দেয়া। তাই আমার লেখায় অনবরত এসেছে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখনো আমি প্রথম দিনের মতোই বক্তব্যের জন্যে নতুন থেকে নতুনতর উপায় খুঁজে চলি।

আমি মনে করি, পঞ্চাশ দশকের কবি-লেখক আমাদের রচনা যাই হোক, একটি শিরোপা দেবেই দেবে ইতিহাস— আমরাই ছিলাম সেই অগ্রপথিক যারা অরণ্য কেটে, মাটি কুপিয়ে, জমি প্রস্তুত করেছি। সেই সময়ে পাকিস্তানের রাজনীতির কারণে বাংলাভাষার ওপর যে চাপ পড়েছিলো, বাংলাকেই লুপ্ত করবার যে ষড়যন্ত্র চলছিলো— সেদিন যদি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বাংলাভাষায় দুর্বলতম একটি প্রেমের কবিতাও আমরা লিখে থাকি, তবে সেটাই ছিলো আমাদের যুদ্ধ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখবার যুদ্ধ। এই অর্থে বাংলাদেশের জন্যে মুক্তিযুদ্ধটাই শুরু হয়েছিলো একাত্তরে নয়, পঞ্চাশের দশকে, আমাদেরই হাতে— রাজনীতিকদেরও অনেক আগে।

লেখা আমার কাছে প্রেমে পড়বার চেয়েও অনেক বেশি উত্তেজক ও ব্যক্তিগত, দূরাভিলাষী ও উড্ডয়নশীল। আমার এই বিশেষ প্রেমটির ইঙ্গিত ও ইতিহাস পাওয়া যাবে এ বইয়ে। এখন প্রতিদিন একটু একটু করে লিখে চলেছি আত্মজীবনি; এ বইও এক অর্থে আমার আত্মজীবনেরই একটি খণ্ড। লেখকের জীবনি তাঁর লেখার ভেতরেই থেকে যায়।

দিন অবসানের পর জীবন-কাহিনী আমাদের কোন্ কাজে লাগে জানি না; তবে, মানুষটি যে কাজের ভেতর দিয়ে দিনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে— সেই কাজ ও কাজটি নিয়ে ভাবনাচিন্তার বিবরণ সহপথিকদের তো কাজে আসবারই কথা। অন্তত তাঁরা জানবেন তাঁদেরই আগের একজন কী ও কেমন ভেবেছিলেন। মিস্তিরির কাছ থেকেই মিস্তিরি শেখে। মিস্তিরির কাজটা ভুল হলেও সেই ভুল থেকেই শেখবার আছে। ভরসা করি, আমার কাজ, আর কিছু না হোক, মিস্তিরির হাত-নিশানার একেবারে বাইরে নয়।

১৯শে নভেম্বর ২০০৪ সৈয়দ হক
লন্ডন

প্রেমপত্র

প্রতিদিন কতই না কাজে ব্যবহার করি ভাষা। কথা বলি— সংসারে, বাজারে, কাজের জায়গায়, টেলিফোনে, কখনো নিজের সঙ্গেও কথা বলি। চিঠি লিখি। দরখাস্ত লিখি। এই লেখার দিকটাই দেখা যাক। যদি প্রেমে পড়ি, চিঠি লিখি। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবো, আমাদের অন্যসব লেখা থেকে প্রেমের চিঠির ভাষা অনেক উন্নত, ঘন এবং তীব্র। প্রেমের চিঠিতে আমরা উপমা তুলনাও ব্যবহার করি যা প্রতিদিনের জীবনে করি না। কেন এমন হয় ? কেন আমাদের প্রেমপত্রের গদ্য অন্য লেখার গদ্য থেকে একেবারেই অন্যরকম ? যেন প্রায় সাহিত্য!

এটা হয় আমাদেরই আবেগের ঘনত্ব আর তীব্রতার ফলে। ওই আবেগই প্রকাশ পাবার তাড়নায় আমাদের দিয়ে খাটিয়ে নেয় তুমুলভাবে। আমরা শব্দের পর শব্দ খুঁজি, উপমার পর উপমা। আমরা যদি হাতের কাছে সেসব নাও পাই আমাদের আবেগের তুল্য ওজনে, আমরা হতাশ হই না। আমরা বরং চেনা শব্দকেই নতুন অর্থ দিয়ে নতুন করে তুলি। এর একটা উদাহরণ দিই। সে আমার প্রথম বয়সের কথা। একজন আমাকে তার প্রেমপত্র দেখিয়েছিলো। তার ইচ্ছে ছিলো পত্রটির ভাষা আমি দেখে দেবো। সে পত্রের শেষ একটি বাক্য দেখে, আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি চমকে উঠেছিলাম। সে লিখেছিলো, *আমি তোমাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালোবাসি!*

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ? রন্ধ্রের অর্থ ছিদ্র! কিন্তু আমরা হাসবো না। এখন আমি চমকাবও না। এখন আমি জানি ওই পত্রলেখকের অভিপ্রায় কী ছিলো। রন্ধ্র শব্দটি সে ব্যবহার করেছিলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি অবকাশ বোঝাতে। এর দরুণ সঠিক শব্দ তার জানা ছিলো না, তাই সে তারই জানা শব্দের ভাণ্ডার থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে শব্দ পেয়েছে— রন্ধ্র— সেটাই ব্যবহার করেছে। একজন জীবনানন্দ যখন *পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে* লেখেন, তখন নীড় আর চোখের তুল্যমূল্যতা দেখে আমরা চমকাই না। কবি ও-ভাবেই একটি অসম্ভবকে চিরসম্ভব করে তোলেন।

শব্দ থাকে অভিধানে; কবির কলমে অভিধানের সেইসব শব্দই হয়ে ওঠে নতুন— কবির নিজস্ব অভিপ্রায়ে। কবির হাতে শব্দ অভিধান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তার প্রচলিত অভিধা থেকে। বস্তুত যে-কোনো শব্দই যে নিতান্ত ধ্বনি মাত্র, অভিপ্রায়ই সব— শুধু কবি নয়, সবার উচ্চারণেই— এটি আমি প্রথম জেনেছিলাম সার্ভান্তেসের উপন্যাস *ডন কিহোতি* থেকে প্রথম। শব্দ সম্পর্কে গভীর একটি ধারণা তিনি আমাদের দিয়েছেন আপাত লঘুচালে এভাবে : ডন কিহোতি একাই যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়বেন, তার সঙ্গী হবেন সাঞ্চো পাঞ্জা। সাঞ্চো এসে ডন কিহোতিকে বলছেন, 'প্রভু, আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আমি আমার স্ত্রীকে সংযত করেছি।'

ডন কিহোতি বললেন, 'সংযত নয়, সাঞ্চো, সম্মত। বলো, সম্মত করিয়েছো।'

সাঞ্চোর উত্তর, 'যদ্দুর স্মরণ হয়, আমি আপনাকে এর আগেও বলেছি, প্রভু, আপনি যদি বুঝেই থাকেন কী আমি বলতে চাই, তাহলে আর আমার কথার কোনো শব্দ দয়া করে সংশোধন করবেন না।'

আমার দুঃখ হয়, সেদিন আমি সেই প্রেমিকের লেখা প্রেমপত্র থেকে রন্ধ্রে রন্ধ্রের মতো নিপুণতম শব্দপ্রয়োগটিকে শুধরে দিয়েছিলাম।

আমি মনে করি, সাহিত্য লেখা হচ্ছে আসলেই প্রেমপত্র লেখা। সাহিত্য— সময়ের কাছে লেখা প্রেমপত্র। আমরা যখন প্রেমে পড়ি, চিঠি লিখি, তখন আমাদের প্রেমপত্রে থাকে আমাদেরই অস্তিত্ব-অনুভবের কথা, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা, থাকে আমাদের অন্তর্গত বিষণ্ণতা, আনন্দ, ইচ্ছা, প্রত্যাশা, বিশ্লেষণ, এবং আত্ম-আবিষ্কারের সংকেত। সাহিত্যও অবিকল এই কথাগুলোই বলে। প্রেমিকের প্রেমপত্র লেখার তাড়না আর সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার তাড়না— অভিন্ন।

শিল্পী ও মিস্তিরি

আমার চিত্রকর বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরী একবার একটি কথা বলেছিলেন— 'আমরা মিস্তিরি মানুষ। এ বাড়িতে পোষালো না, র‍্যাঁদা-করাত-বাটালি চটের থলেতে পুরে অন্য গেরস্তর বাড়ি যাবো।' কাইয়ুম আর আমি একসঙ্গে বহু পত্রপত্রিকা আর প্রকাশকের বাড়িতে কাজ করেছি; কাজ নিয়ে একবার একজনের সঙ্গে খটাখটি লাগলে, আমি মন খারাপ করলে, ঐ কথাটি তিনি বলেছিলেন।

সত্যি বৈকি— খাঁটি সত্যি কথা।

শিল্পের গাড়ি নিছক প্রেরণার চাকায় চলে না। তিনি গায়ক হন, লেখক হন কি চিত্রকর, তাঁর ভেতরে নিদ্রাহীন দুই পুরুষ— প্রতিভাবান শিল্পী আর নিপুণ মিস্তিরি।

মিস্তিরির দিকটা বুদ্ধিনির্ভর, আর শিল্পীর দিকটি দৃষ্টিনির্ভর। দৃষ্টি আর বুদ্ধি, এ দু'য়ের রসায়নে হয় একটি ছবির জন্ম, কি একটি কবিতার। দৃষ্টি দিয়ে যা আয়ত্ব করলাম, বুদ্ধি দিয়ে তা পৌঁছে দিলাম। অধিকাংশ শিল্পচেষ্টাই যে শেষপর্যন্ত পৌঁছোয় না তার কারণ, আমি মনে করি, ওই মিস্তিরিটি ছিলো না।

একটি উপমা আমি প্রায়ই দিয়ে থাকি— চেয়ারের চারটে পা যদি মেঝের ওপর ঠিকমতো না-ই বসলো তো সে চেয়ার দেখতে যতই মনোহর হোক আমার তাতে কাজ নেই। চেয়ার বসবার জন্যে। মেঝের ওপর জুৎ মতো সেটি বসতে হবে, তার পা চারটে স্থিরমতো থাকতে হবে, কোথাও এতটুকু টলমল করবে না; তবে সে চেয়ারে আমি বসবো। বসে তারপর দেখবো আসন কতটা আরামদায়ক, পিঠ কতটা

সুখপ্রদ। সে-সব হলো তো দেখবো— চেয়ারটির নকশা কেমন, পালিশ কেমন; সবশেষে যাচাই করবো টেকসই কতদূর। তবেই সে চেয়ার হবে আমার চেয়ার।

লেখা সম্পর্কেও আমার একই দাবি। লেখাটি মিস্তিরির হাতে ওই চেয়ারের মতো পোক্ত হতে হবে। কবিতা হলে ছন্দের নির্ভুল ব্যবহার আমি দেখতে চাই; ছন্দ নির্ভুল তো আমি দেখবো কবিতার অন্তর্নিহিত যে যুক্তির সিঁড়ি সেটি আছে কিনা; থাকলে সে সিঁড়ি কতটা মজবুত। তারপর দেখবো কবিতায় বলবার কথাটি জ্যামিতিক সম্পূর্ণতা পেয়েছে কিনা। এই জ্যামিতিক সম্পূর্ণতা বলতে বোঝাতে চাচ্ছি ত্রিভুজ কিংবা বৃত্ত অথবা আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের মতো তৃপ্তিকর একটি নির্মাণ।

ছোট্ট করে এখানে বলে নিতে পারি যে, দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা ছাড়া মানুষ যে কিছুই আলিঙ্গন করতে পারে না, মানুষের এ এক অলঙ্ঘ্য সীমাবদ্ধতা, কিন্তু অনুকূল অর্থে। আর তাই আমার কল্পনায় মানুষের যে-কোনো সৃষ্টিশীল উচ্চারণ হয় বৃত্ত অথবা আয়তক্ষেত্র কিংবা ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

কবিতায় মিস্তিরির হাত চৌকশ দেখতে পেলেই আমি কবিতাটি কবিতা হয়েছে কিনা বিচার করতে বসবো। মিস্তিরির কাজটুকু কবিতা নয়। মিস্তিরির কাজটি কবিতাকে সামর্থ দিয়েছে মাত্র। আগে যে দৃষ্টির কথা বলেছিলাম, শিল্পীর সেই দৃষ্টিই রচনাটিকে হয় কবিতা করে তুলবে অথবা তুলবে না। যদি না তোলে তো বড়জোর সাময়িকপত্রের একাংশ পূরণ করবার যোগ্যতা স্বীকার করে নেবো মাত্র; আর যদি কবিতা হয়, যদি এমন করে এই কথাটি আর কেউ বলে না থাকে তো সে কবিতাকে সাময়িকপত্রের পাতা থেকে তুলে এনে অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করে রাখবো, কিংবা কবিতাটি নিজেই তার প্রবল শক্তিতে আমার অন্তর্গত হয়ে যাবে।

আসলে যে-কোনো ভালো লেখাই পাঠককে পরাস্ত করে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

আমি কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লিখে থাকি। শুরুতেই কবিতার কথা তুলে কি কবিতার প্রতি আমার গোপন পক্ষপাতটুকু প্রকাশ করে ফেললাম। গোপন কেন, এ পক্ষপাত তো প্রকাশ্য। আমি কি আমার প্রিয়তম ব্যক্তিটিকে উপন্যাসের চেয়ে কবিতার বই দিতে ভালোবাসি না ? আমাকে কবি বলে পরিচয় করিয়ে দিলে কি আমি অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করি না ?

ব্যক্তিগত থাক; আমার সিদ্ধান্ত— সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে যিনি কাজ করেন এবং যাঁর কাজের ভেতরে কবিতাও আছে, তিনি কবি এবং কবি ছাড়া আর কিছুই নন; কবি বলেই তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই পল্লীসংস্কারক পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। ডি এইচ লরেন্স কবি না হলে ঔপন্যাসিকই নন।

কবিতার কথা তুলেছি, কারণ একটি ক্ষত আমি এখনো বহন করছি। একদিন আমাদের এক তরুণ কবি আমাকে তাঁর নতুন লেখা একটি কবিতা দেখিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করি, এই কবি যাঁর বেশ কয়েকটি বই আছে, বাংলাদেশে

সাহিত্যপাঠক প্রায় প্রত্যেকেই যাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর ওই বারো লাইনের কবিতাটি দেখি ছন্দে নির্ভুল নয়। বিশেষ করে একটি লাইনে ছন্দের শোচনীয় পতন আমাকে দ্বিখণ্ডিত করে রাখে।

দশ বছর আগে হলে কবিতাটি কবির হাতে নীরবে ফিরিয়ে দিতাম; কিন্তু এখন সুকুমার রায়ের সেই নব্বুই বছর বয়সী নাজিরের মতো আমিও ভাবি— একদিন তো মরবোই, অতএব মন্ত্রীর জামা শুঁকে দেখতে ভয় কিসে ? কবিকে ছন্দের ভুলটা দেখিয়ে দিতেই, আরো অবাক, তিনি বললেন, এ ভুল তাঁর নতুন নয়, তাঁর বিভিন্ন বইতেও এ ধরনের পতন রয়ে গেছে এবং এখন এ নিয়ে তিনি আর কিছু মনে করেন না।

না, পারি না, আমি ভাবতেও পারি না, একজন কবি যদি তিনি কবি হন, এই অনুতাপবর্জিত উচ্চারণ তাঁর, এই অকুঞ্চিত মুখ ঠিক তাঁরই।

মিস্তিরি শিল্পী নন, কিন্তু প্রতিটি শিল্পীই নিপুণ মিস্তিরি। যে চেয়ারের পা টলমল করছে, পিঠে খোঁচা দিচ্ছে, তার নকশা যত নতুনই হোক, ঘরে দিন দুয়েক রাখবার পর গৃহস্থ তাকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে চাতালে, অবশেষে বিস্মৃতির গুদামে ফেলে রাখবেনই। মহাকাল নির্মম এক গৃহস্থ; তিনি এইসব আপাত-মনোহর আসবাব জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

তরতর করে লিখে ফেলা

লঘুকণ্ঠে আমি অনেকবার এরকম একটি কথা বলেছি যে, লেখাটা কোনো কঠিন কাজ নয়, যে-কেউ লিখতে পারেন; তবে কঠিন হচ্ছে, লেখাটিকে একটি পাঠের অধিক আয়ু দান করা। যে-লেখকের গল্প বা উপন্যাস এখন আর তেমন পড়াই হয় না সেই সমারসেট মম লেখার মিস্তিরির দিক নিয়ে বিস্তর লিখেছেন এবং তাঁর একটি চাঞ্চল্যকর মত হচ্ছে, যে-কেউ কাগজ কলম নিয়ে বসলেই অন্তত একটি উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন, তাঁর নিজের জীবন নিয়ে উপন্যাস।

এই যে আমি বলি 'যে-কেউ লিখতে পারেন' আর মম বলেন 'যে-কেউ অন্তত একটি উপন্যাস লিখতে পারেন'— ওই লেখাটাও কিন্তু কেবল কাগজ-কলম টেনে নেবার অপেক্ষাই করে না; ওই কাগজ কলমের কাছে পৌঁছুনোর জন্যে বিস্তর পরিশ্রম ও প্রস্তুতির দরকার হয়।

আমার এক ফুপা ছিলেন— তিনি বর্ধিষ্ণু কৃষক এবং তাঁর অঞ্চলে তিনি বৈষয়িক বুদ্ধি ও নেতৃত্বের জন্যে সম্মানিত পুরুষ— তিনি মনে করেন, যেমন অধিকাংশ লোকই মনে করে থাকেন, লেখার জন্যে একটা পরিবেশ পেয়ে যাওয়াই যথেষ্ট এবং সে

পরিবেশটি যদি নৈসর্গিক হয়, তাহলেই সর্বোত্তম, তাহলেই বাজিমাৎ। তাঁর ধারণা, বহু চিঠিতে তিনি আমাকে কতই না আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি তাঁর বসতবাড়ির বাহির প্রাঙ্গণের বিশাল জামগাছ তলায় খালের দিকে মুখ করে একবার যদি বসি, তাহলেই আমার হাত থেকে তরতর করে লেখা বেরুতে থাকবে।

লেখার জন্যে যে অভিজ্ঞতা, দৃষ্টি আর স্পষ্ট বিশ্বাসের দরকার হয়, এবং সেটাও যে রীতিমত অর্জন করে নিতে হয়— সে-কথায় না গিয়ে ঐ তরতর করে লিখে ফেলার বিষয়ে বরং কিছু বলা যাক।

তরতর করে লিখে ফেলা ? বাক্যবন্ধটি যতই তরল শোনাক, ব্যাপারটি গুরুতর। বহু মাননীয় লেখক আছেন, প্রচুর লিখেছেন এমন লেখক অনেকই আছেন, যাঁরা বড় ধীরে লিখেছেন, দিনমানে এক দু'পৃষ্ঠার বেশি এগুতে পারেন নি, এবং একটি উপন্যাস— এমনকি ছ'সাতশ' পৃষ্ঠার— একাধিকবার লিখেছেন। আবার এমন লেখকও আছেন, যাঁরা কাগজ কলম নিয়ে যখন বসেন, ব্রহ্মপুত্রের সাবলীলতা ধরে এগিয়ে যান, পাঁচ মিনিট পার হতে না হতেই পুরো একটি স্তবক রচিত হয়ে যায়, দিনমানে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে যায়, পাণ্ডুলিপি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়— প্রায় কোনো কাটাকুটি নেই, আয়াসের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও— যেন তিনি নিজে নতুন কিছু লেখেন নি, অন্য কারো লেখা দেখে নকল করে গেছেন মাত্র।

আসলে, এই দু'জাতের লেখক লেখার দুই ভিন্ন ধরনে অভ্যস্ত। একজাতের লেখক ভাবতে ভাবতে লেখেন, লিখতে লিখতে ভাবেন; তাঁদের মনের ভেতরে, চিন্তার ভেতরে, লেখাটি ভাস্কর্য-সম্ভব এক মার্বলখণ্ড হিসেবে যখন তাঁরা দেখতে পান, তখনই কাজে বসে যান এবং ছেনি-হাতুড়িতে ঠুকে ঠুকে রূপ সৃষ্টি করতে থাকেন; একটু বা করেন, থেমে যান, পিছিয়ে দাঁড়ান, দ্যাখেন, আবার কাজ করেন, আবার থামেন, আবার ভাবেন, আবার সক্রিয় হন; এমনকি, কাজ করতে করতে নিজেই অনুভব করেন, এটুকু ঠিক এভাবে হবে না, তবু এভাবেই কিছুদূর এগিয়ে যান এবং পরমুহূর্তে নিজেই তা বাতিল করে দেন— যেন, বাতিল করবার জন্যেও তাঁদের পক্ষে দরকার হয় বাতিল-যোগ্য অংশটি পরিষ্কারভাবে দেখে নেবার; তাই এ জাতের লেখকের কলম চলে ধীরগতিতে, তরতর করে মোটেই নয়, চারদিক দেখে-শুনে, আস্তে-সুস্থে।

আরেক জাতের লেখক— যাঁরা দ্রুত লেখেন— তাঁদের অভ্যেস, লেখাটি পুরোপুরি করোটিতে এনে, বস্তুতপক্ষে করোটির ভেতরেই লেখাটি সম্পূর্ণ করে তবে কাগজ-কলম নিয়ে বসা। এঁরা করোটির ভেতরেই পূর্বাহ্নে কাটাকুটি করেন, গ্রহণ-বর্জন করেন, সমালোচকের চোখে বারবার অবলোকন করেন এবং যখন সব তাঁর মনের মতো হয়, তখনি কেবল লেখার কাজে হাত দেন। ফলে, এঁদের পাণ্ডুলিপি হয় এত পরিচ্ছন্ন, প্রতারকভাবে এতটা অনায়াসসিদ্ধ। বলে দিতে হবে না, এই দু'জাতের লেখকই কিন্তু একটা কাজ অবশ্যই করে থাকেন, আর তা হলো সচেতনভাবেই তাঁরা

সৃষ্টি করেন; গ্রহণ, বর্জন, কাটাকুটি, এ সবই সেই সচেতন ক্রিয়ার প্রমাণ। তফাতটা এই, কাজটা কেউ করোটির ভেতরে করেন, কেউ কাগজের পৃষ্ঠায় করেন। আবার এর ভেতরেও উনিশ-বিশ আছে, যেমন জীবনের সবক্ষেত্রে আছে; কেউ কাজটা তাড়াতাড়ি করতে পারেন, কেউ একটু ধীরে।

আমি নিজে দ্বিতীয় রীতিতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ, লেখাটি পুরোপুরি মাথায় না এনে লেখার টেবিলে বসতে পারি না, এবং তারপরও আমাকে প্রায়ই দ্বিতীয় খসড়া করতে হয়— উপন্যাসের, গল্পের। গল্প-উপন্যাসের বেলায় আমার হাত দ্রুত এবং সাবলীলভাবে কাজ করতে পারলেও, গল্প-উপন্যাস কিন্তু দ্রুত বা অনায়াসে আমার মাথায় আসে না; দু'আড়াই বছরের আগে তো কোনো গল্প বা উপন্যাসই মনের মধ্যে দানা বাঁধে না; অধিকাংশ লেখাই গড়ে অন্তত বছর চার-পাঁচ নাড়াচাড়া করে তবে লিখতে বসেছি; আমার একটি উপন্যাস তো এখনো লেখাই হলো না, যেটি নিয়ে আমি সেই উনিশশো তেপ্পান্ন সাল থেকে ভাবছি— এখনো মাঝে মাঝেই নাড়াচাড়া করি এবং প্রতিবারই আশা করি যে, এবার হয়তো লেখার টেবিলে ওটা নিয়ে বসতে পারবো।

কবিতার বেলায় দশ পনেরো খসড়া হামেশাই আমাকে করতে হয়— এবং কবিতার বেলায় আমার যেটা ঘটে, তাৎক্ষণিক কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি সবসময়ই আমি কাগজে ধরে রাখি, একটা ব্রাউন রঙের বড় খামে সেগুলো জমতে থাকে, আর নিয়মিত আমি সেই পঙ্‌ক্তিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি; একসময়ে আবিষ্কার করি যে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ, হয়তো বহু দিনের ব্যবধানেই লেখা কয়েকটি অংশ, একটি সম্পূর্ণ ভাবনার বৃত্তে সহজেই স্থাপিত হতে পারছে; তখন সেই পংক্তিগুলো নিয়ে আমি প্রথম খসড়া তৈরি করি এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে ফেলে রেখে দিয়ে, আবার একদিন ওটা নিয়ে কাজ করতে বসি; এই দ্বিতীয় উপবেশনেই খসড়ার পর খসড়া করে যেতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না রূপটি চূড়ান্ত বলে নিজের কাছেই মনে হচ্ছে। আবার বহু বৎসর পরে আমি অনেক কবিতারই নতুন একটি পাঠ রচনা করে ফেলেছি এটা লক্ষ করে যে, আমার সর্বাধুনিক চোখে মানুষ ও বিশ্বকে যেভাবে দেখছি, তার সঙ্গে পুরনো পাঠ আর তেমন সংগতিপূর্ণ নয়; হয়তো নতুন একটি কবিতা লেখা যেত; হয়তো অনেকেই বলবেন, পুরনো কবিতা অক্ষত রেখে দিলে ভাবনার ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ করা সম্ভব হতো; কিন্তু না, আমার কবিতার কাজ ওভাবেই, আমার কবিতা আমাকেই অস্বস্তিতে ফেলে দেয় বারবার ওভাবেই, আর ওভাবেই আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করি বারবার।

নাটক লিখেছি— কাব্যনাট্য, গদ্যনাট্য, রূপান্তর এবং অনুবাদ; সব বেলাতেই নাটকটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে তৃতীয় খসড়ায় পৌঁছে; আসলে, দুটি খসড়া— রচনার; তৃতীয় খসড়া, নাটকটির অভিনয়-যোগ্যতার পরীক্ষাতেই নিবদ্ধ।

কথা তুলেছিলাম তরতর করে লিখে ফেলার ব্যাপারে। তরতর করে লিখে ফেলা ? বাক্যবন্ধটি যতই তরল শোনাক, ব্যাপারটি গুরুতর, এ কথাও বলেছি। তবে, লেখককে তরতর করে লিখতেই হবে, নইলে তিনি লেখকই নন, কিংবা লেখক মাত্রেই তরতর করে লিখতে পারেন— এর কোনোটিরই কোনো গুরুত্ব নেই। যে লেখাটা প্রকাশ্যে উপস্থিত করা হলো সেই লেখাটিই বিবেচ্য; কী গতিতে বা কোন প্রক্রিয়ায় তা লেখা হলো, সেটা নিতান্তই আকস্মিক, ব্যক্তিগত ও তাৎপর্যহীন।

মারাত্মক গুজব

তরতর করে লিখে ফেলার ব্যাপারটি যে কতখানি আকস্মিক, ব্যক্তিগত ও তাৎপর্যহীন, তার প্রমাণ হিশেবে কয়েকটি নজির উপস্থিত করছি।

শুনেছি, দস্তয়েভস্কি মনে করতেন, তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নেই; যেভাবে সময় নিয়ে গুছিয়ে বসে লিখতে চান, তা আর এ জীবনে হবে না; অতএব তিনি দ্রুত লিখেছেন এবং লেখাগুলোকে নিতান্ত একটি খসড়া বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ধারণায় যা খসড়া, সেগুলোই এখন আমাদের কাছে তাঁর উপন্যাসের চূড়ান্ত পাঠ।

আবার আমরা শুনেছি, টমাস মান লিখতেনই ধীরগতিতে; অধিকন্তু, লেখা শেষ হয়ে গেলে তাঁর ধারণা হতো— কিছুই হলো না এবং তখন আবার লিখতে শুরু করতেন; দশ বারো বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন একটি উপন্যাস নিয়েই কাজ করে যাওয়াটা তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক ছিলো।

দু'টি উপন্যাসের ভেতরে, একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি যুগ কলম বন্ধ করে রেখে দেন; একটি উপন্যাস শেষ করে, সে-রাতেই এবং সেই পৃষ্ঠারই শাদা অংশে পরবর্তী উপন্যাস শুরু করেন একজন আলেকজান্দার দুমা। স্বপ্নদংশিত ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো একজন ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স কলমের আঙুলের সঙ্গে চিন্তার গতির পাল্লা রাখতে পারেন না, এক মুহূর্তে তাঁর করোটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একডজন বাক্য এবং লেখা হতে না হতেই আরেক ডজন। আবার, ভাস্কর্যশিল্পীর মতো কায়িক অর্থে শ্রমিক ও অধ্যাবসায়ী একজন কমলকুমার মজুমদার কখনো কখনো একটিমাত্র বাক্য রচনাতেই ব্যয় করেন একটি সপ্তাহ, কখনোবা একটি মাস, এমনকি জীবনের প্রথম উপন্যাসও তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আবার হাতে নেন এবং ফাঁক পেলেই বইয়ের মার্জিনে একেকটি বাক্যের নতুন রূপ দিতে থাকেন।

এই কথাগুলো যে আমাকে বলতে হলো, তার একটিই কারণ; আমাদের দেশে এরকম গুজব চালু আছে যে, বসলেই লেখা হয়ে যায় এবং উপন্যাস তো ঈদের মৌসুমে ফরমায়েশ পেয়েই লেখকেরা দু'চারদিন দরোজা বন্ধ করে বা আপিস ছুটি

নিয়ে লিখে ফেলেন— কখনো কখনো একাধিক উপন্যাসও একই সপ্তাহে রচিত হয়ে যায়। গুজবটা দানা বাঁধে যখন দেখা যায় যে, ঈদের মৌসুমে পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে যাঁর লেখা দেখা যাচ্ছে, বছরের অপর সময়ে তাঁর লেখা দেখাই যায় না, বা সম্পাদকেরা চেয়েও পান না। আর, এ গুজব সমর্থিত হয়ে যায় যখন সম্পাদনা কর্মীদের মুখেই গল্প শোনা যায়, অমুখ লেখক তো তিনদিনে উপন্যাস শেষ করেছেন।

শুধু শোনা কথা কেন ? সাগরময় ঘোষ কি তাঁর বইয়ে লেখেন নি যে, সুবোধ ঘোষ পত্রিকার আপিসে বসে, রাত জেগে, পারব-না পারব-না বলেও, ঘুমহীন রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে *জতুগৃহ*-র মতো প্রথম শ্রেণীর একটি গল্প লিখেছেন; দু'তিনটি বাক্য লিখেছেন আর কম্পোজিটার এসে নিয়ে গেছে অক্ষর সাজাতে, এইভাবে রচিত হয়েছে এক বিস্ময় ? আমার তো মনে হয়, অচিরেই বাংলাদেশে কোনো সম্পাদক এ ধরনের স্মৃতিকথা প্রকাশ করবেন এবং আমরা জেনে যাবো, কীভাবে অমুক লেখককে দিয়ে তাঁর অমুক প্রধান রচনাটি, বলতে গেলে তিনিই জোর করে, এক অসম্ভব পরিস্থিতির ভেতরে লিখিয়ে নিয়েছেন এবং লিখিয়ে নিয়েছেন ঈদ সংখ্যা প্রকাশের শেষ তারিখের ঠিক আগের দিন, বা আরো নাটকীয় রকমে, আগের ঘণ্টায়।

আমার রীতিমত ভয় হয়, এইসব গল্প এবং গুজব এরই মধ্যে অনেক তরুণ বা নতুন লেখককে প্রভাবিত করে ফেলেছে; আমার সন্দেহ হয়, এই রাতারাতি উপন্যাস নামানোটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যেন এটা না করতে পারলে লেখকই হওয়া যাবে না, লেখক বলে কেউ খাতির করবে না। এই ভয় এবং এই সন্দেহ নিতান্ত অনুমানের ওপর প্রকাশ করছি না; চারপাশ থেকে এখনি আমি কিছু শুনি এবং কিছু নিজের চোখেও দেখেছি।

বড় লেখকের লেখা থেকেই কেবল আমরা শিখি না, অনেক সময় তার ব্যক্তিগত জীবন, আচরণ ও অভ্যেসও আমরা অনুকরণ করি প্রাথমিক অবস্থায়; এটা বরাবর হয়ে এসেছে, এদেশে ও বিদেশে; এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেবল ঈদের মৌসুমেই লেখা, কেবল চাপের মুখেই লেখা, কেবল চট করেই লেখা, এ সব গল্প আর গুজব নতুন ও তরুণ লেখকদের মধ্যে যদি ছড়িয়ে পড়ে, যদি অনুসৃত হয়, তাহলে সাহিত্যের কাননের বদলে সাহিত্যের গোরস্তানই আমরা রচনা করবো।

আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথ এবং তিনি একটি কলেজে ছাত্রদের পড়াতেন, ছেলেবেলায় বহুদিন তাঁর ক্লাশের দরোজার বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতাম। বাবা ছাত্রদের পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে সরস গল্প বলতেন; তাঁর মুখে শোনা একটি গল্প এখন আমার মনে পড়ছে। প্রবীণ এক ডাক্তারের নবীন এক কম্পাউন্ডারকে নিয়ে গল্প। কম্পাউন্ডার রোজ দ্যাখে যে, ডাক্তার সাহেব রোগীর রোগ-বর্ণনা শোনেন চোখ বোঁজা অবস্থায় উদাস ভঙ্গিতে, যেন ভালো করে শুনছেনই না, যেন অন্য কিছু ভাবছেন, তারপর একসময় হঠাৎ তিনি জেগে উঠে হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা ওষুধের

বাক্সো থেকে ভালো করে না দেখেই একটি ওষুধ বার করে রোগীকে দেন; রোগীটি পরদিন এসে নিরাময় হয়ে যাবার সুসংবাদ জানিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডার ভাবলো, আরে, ডাক্তারি করা এত সোজা ? তাহলে আর আমি কম্পাউন্ডারি করছি কী করতে ? সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, এক বাক্সো ওষুধ কিনে সোজা চলে গেল তার গ্রামে; সেখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বসে গেল প্র্যাকটিস করতে। অচিরেই প্রবীণ ডাক্তার খবর পেলেন, তাঁর প্রাক্তন কম্পাউন্ডারটি বিষ প্রয়োগে মানুষ খুন করবার দায়ে সদরে চালান হয়েছে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, রোগীর রোগ-বর্ণনা সে শুনেছিলো তাঁরই মতো চোখ বুঁজে এবং হাতের ডগায় যে-শিশি উঠে এসেছিলো, সেটাই দিয়েছিলো রোগীকে, আর সে শিশিতে ছিলো তীব্র বিষ।

আমার বাবা তাঁর ছাত্রদের মনোযোগী ও সাবধানী হবার জন্যে মানুষের ভঙ্গির পেছনে যে অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে গল্পটি বলেছিলেন। কিঞ্চিত পরিবর্তন করে নিলে গল্পটির সত্য লেখার বেলাতেও আমি ধরিয়ে দিতে পারি।

লেখা শেখা

পেছনের দিকে তাকিয়ে এখন শিউরে উঠি, লেখার কৌশল কত কম জেনে— আরো ভালো, যদি বলি কিছুই না জেনে— একদা কলম হাতে নিয়েছিলাম। লেখা যেহেতু কোনো একটি ভাষায় লেখা, এবং যেহেতু সেই ভাষা আমরা শিশুকাল থেকেই, জন্ম-বোবা না হলে অনবরত ব্যবহার করে থাকি, তাই আমাদের অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে একবারও মনে হয় না যে শিল্পের প্রয়োজনে ভাষা নামক এই উপাদানটিকে সম্পূর্ণ নতুন করে, দৈনন্দিন ব্যবহার-পদ্ধতি ও ব্যবহার-যুক্তি থেকে একেবারে আলাদা করে দেখে নিয়ে, কলম ধরতে হয়; যেন আমরা এ থেকে শুরু করি যে, কথা যখন বলতে পারি, চিঠি যখন লিখতে পারি, তখন কাগজ-কলম নিয়ে বসলে একটি গল্প বা কবিতাও লিখে ফেলতে পারব।

কবিতার ব্যাপারে হয়তো একটুখানি সচেতন চেষ্টার দরকার হয়, কারণ কবিতায় আছে ছন্দ, আর সেই ছন্দ ঠিক প্রতিদিনের উচ্চারণে প্রযুক্ত নয়। যে-মানুষ কবিতার দিকে প্রথম হাত বাড়ায় সেও ছন্দ জেনে নয়, বরং অতীতে পড়া, সম্ভবত বিদ্যালয়ে পড়া, কোনো কবিতার ছন্দকে আঁধারে হাত বাড়িয়ে তার শরীর অনুমান করে নিয়ে সেই শরীরেই শব্দ সাজায়; হয়তো এই কারণেই দেখা যায়, প্রায় যে-কোনো কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলো তার ঠিক আগের সময়ের বা সমকালের সবচেয়ে ব্যবহৃত ছন্দেই লেখা।

কিন্তু, লেখা যদি হতো ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া অথবা গান গাইবার মতো কোনো উদ্যম, তাহলে এতটা নিশ্চিন্তে, এতটা কম সচেতন হয়ে আমরা কলম ধরতে পারতাম না; অন্তত ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া বা গান গাইবার জন্যে রঙ তুলি, হাতুড়ি-ছেনি বা হারমোনিয়াম নিয়ে যতটুকু পাঠ এবং রেওয়াজ এবং আরো বড় করে যতটুকু সাধ্য সাধনা করা দরকার তা করে নিয়েই কাগজে কলম ছোঁয়াতাম।

যুক্তিবিজ্ঞানে যাকে বলে 'ভ্রান্ত সাদৃশ্যমূলক অনুমান'— জীবনে আমরা সেটারই শিকার হই বড় নির্মমভাবে; আর এ জন্যেই আমরা এই কথাটিতে সম্পূর্ণ আস্থা রাখি, এর ভেতরে আদৌ কোনো ফাঁক দেখি না যে, জলে নেমেই সাঁতার শিখতে হয়। সাদৃশ্যমূলক এই অনুমানটিকেই ব্যবহার করে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি যে, লিখতে শুরু না করে লেখা সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়, কিংবা শুধু ভাবের ঘোরে লিখতে লিখতেই লেখক হওয়া যায়!

এই অনুমানটিকে সম্প্রসারিত করে আমি যদি মহাশূন্যে যাত্রার উদাহরণ তুলে ধরি ?— তাহলেও কি 'জলে না নেমে সাঁতার শেখা যায় না' এই বচনটির সত্যতা আপনি দেখতে পাবেন ? পাবেন না; কারণ, জল আর মহাশূন্য ঠিক এক জিনিস নয়। মহাশূন্য সম্পর্কে সম্ভবপর ও জ্ঞাত সমস্ত তথ্য না নিয়ে, মহাশূন্যের বায়ুহীন অবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সঙ্গে না নিয়ে, মহাশূন্যের কম্পনাতীত উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার মতো পোশাক না পরে এবং এইসব আয়োজন সম্পর্কে ষোলআনা নিশ্চিত না হয়ে আপনি কিছুতেই নভোলোকে যাত্রা করতে পারেন না, পারবেন না। কাজেই এ ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, মহাশূন্যে না গিয়ে কেউ মহাশূন্য ভ্রমণ রপ্ত করতে পারে না।

এখন, লেখার ব্যাপারটিকে যদি মহাশূন্যে যাবার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, লেখার আগে লেখার কৌশল আমাদের পুরোপুরি জেনে নিতে হবে। কিন্তু, আরেক দিক থেকে এটাও একটি ভ্রান্ত সাদৃশ্যমূলক অনুমান। কারণ, এই দুটো উদ্যমের মৌলিক লক্ষ্যই ভিন্ন; তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাত নিয়ম মানতে হয়। এবং অজ্ঞাত নিয়মটাও বৈজ্ঞানিককে আবিষ্কার করে নিতে হয়; কোনো নিয়ম নিজে থেকে নির্মাণ করে চাপিয়ে দেবার কোনো উপায় তার নেই; অন্যদিকে একজন লেখককে জ্ঞাত নিয়ম জেনে নিতে হয় বটে কিন্তু তিনি নিজেও কিছু নতুন নিয়ম নির্মাণ করতে পারেন। আর যেহেতু তিনি নিজেই কিছু নতুন নিয়ম নির্মাণ করতে সক্ষম— তাঁর কাজের প্রকৃতিই তাই— অতএব একজন লেখককে সেইসব অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, বা তাঁকে যেতে দিতে হয়, যেখানে তিনি কখনো ভুলপথে চলছেন, কখনো আঁধারে হাঁটছেন, কখনোবা মেঘহীন পূর্ণিমায়। এ যদি না হয়, তাহলে শামসুর রাহমানের বদলে বাংলাভাষার সবচেয়ে বড় কোনো পণ্ডিত আমাদের সমকালের বড় কবি হতেন।

সত্যটা আছে আসলে মাঝখানে। লেখার আগে লেখা সম্পর্কে জ্ঞাত কিছু নিয়ম, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোঁজ রাখতে হবে, এবং এই খোঁজ রাখবার উপায় হচ্ছে সচেতনভাবে সাহিত্য পড়ে যাওয়া, অনবরত পড়ে যাওয়া; জানতে হবে ভাষার গঠন, তার ব্যাকরণ, বাক্য নির্মাণের ধারা, বুঝে নিতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার দুরত্ব— অর্থাৎ সৃষ্টিশীল নির্লিপ্ততা— আমার মতে যেটি না থাকলে বা রক্ষা করতে না পারলে লেখাই সম্ভব নয়; তারপর লেখায় হাত দিতে হবে।

শোচনীয়ভাবে লক্ষ করি, আমি অন্তত আমার জীবনে এই সূত্রটি রক্ষা করতে পারি নি। একেবারেই কিছু না জেনে, ভাষা সম্পর্কে একেবারেই অচেতন থেকে, দূর দুর্গম এক গন্তব্যের দিকে ষোলো বছর বয়সে যাত্রা শুরু করি। তার মাশুল দিতে হয়েছে এবং এখনো দিতে হচ্ছে পদে পদে, পথের প্রতি মোড়ে, রাত নেমে এলে শীতশিহরিত খোলা প্রান্তরে।

প্রতিদিনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা

সত্যিকার অর্থে যিনি লেখক তিনি ছাড়া আর প্রায় সকলেই প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার কোনো রকম ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন না। শামসুর রাহমান যখন প্রতিদিনের শব্দ ব্যবহার করে লেখেন,

বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তী, ভদ্রপাড়া আর
ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়ালাম।
কাঁচের আড়ালে কতো এরোপ্লেন, টিনের সেপাই।
ভালুক বাজায় ব্যান্ড, বাঁকা শিং হরিণের পাশে
বাঘের অঙ্গার জ্বলে, বিকট হাঁ করে আছে সিংহ,
সারি সারি রয়েছে সাজানো ওহো হরেক রকম
বাজনা বাঁশি বাদশা বেগম

তখন আর এরা প্রতিদিনের শব্দ নয় মোটেই। কথাটা কি ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে ? শামসুর রাহমান যে শব্দগুলো তাঁর এ কবিতার কাজে লাগিয়েছেন সেগুলো কি আমরা কবি না হয়েও নিত্যদিনের প্রয়োজনে তলব করি না ? অবশ্যই করি, এবং এখানেই রোপিত হয়ে আছে ভাষা সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার বীজ।

সাহিত্য রচিত হয় ভাষা দিয়ে, ছবি আঁকা হয় রঙ দিয়ে, সঙ্গীত ধ্বনির সাহায্যে।

যেসব ধ্বনির সমন্বয়ে সঙ্গীত— সেই ধ্বনিগুলো আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে না; বাঁশি বেহালা সেতার তবলা সরোদ ঢাক এসব যন্ত্র থেকে যে-ধ্বনি নির্গত হয় তা দিয়ে আপিসের কাজ নিষ্পন্ন করা যায় না, সংসার নির্বাহ করা যায় না, কুশল

বিনিময় করা চলে না; এই ধ্বনিগুলো একমাত্র সঙ্গীত রচনারই জন্যে ধরা রয়েছে; তাই, যদিও আমরা ধ্বনিসৃষ্টিকারী নানারকম কলিং বেল ব্যবহার করি, স্কুল কলেজে ঘণ্টা পেটাই, গাড়ির ভেঁপু বাজাই, আমরা পরিষ্কার জানি এগুলো প্রতিদিনের প্রয়োজনেই ব্যবহার করছি, সঙ্গীত রচনার কাজে লাগাচ্ছি না; বা, যেহেতু আমরা কলিং বেল টিপতে পারি, সাইকেলের বেল বাজাতে পারি— তাই আমরা একটু চেষ্টা করলেই বা ইচ্ছে হলেই সঙ্গীত রচনা করতে পারি এরকম কথা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করি না।

ছবি আঁকার রঙের ব্যাপারে অবস্থাটা ত্রিশংকুর মতো। সঙ্গীতের ধ্বনির মতো ছবির রঙ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়, আবার সাহিত্যের উপাদান যে-ভাষা তার মতো নিত্যব্যবহার্যও নয়। রঙ আমরা ঘরের দেয়ালে লাগাই, দরোজা-জানালায় লাগাই; আবার সেই রঙ দিয়ে ছবিও আঁকি। শিল্পী যে রঙ ব্যবহার করেন তার রাসায়নিক উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী হয়তো ভিন্ন— নিশ্চয়ই ভিন্ন— তবু শিল্পীর প্যালেটের রঙ আর মিস্তিরির বালতির রঙ চারিত্রের দিক থেকে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলে রঙের মিস্তিরি কখনোই মনে করবে না যে ইচ্ছে করলেই সে ছবি আঁকতে পারে; আপনি নিজে যদি কখনো আপনার জানালা দরোজা রঙ করে থাকেন তো আমি হলপ করে বলতে পারি আপনারও কখনো মনে হবে না যে আপনি এক টুকরো ক্যানভাস পেলেই কাইয়ুম চৌধুরীর মতো একটা ছবি এঁকে ফেলতে পারবেন। একজন ডি এইচ লরেন্স যদিও বাড়ির গেট রঙ করবার জন্যে আনা রঙ দিয়েই তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটি এঁকেছিলেন, আমরা সে ঘটনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করি, সাধারণের বাইরে একটি ঘটনা বলে ধরে নিই— অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এটাই স্বীকার করে নিই যে, দরোজায় রঙ লাগাতে পারলেই কিছু চিত্রকর হওয়া যায় না।

কিন্তু সাহিত্যের শারীরিক উপাদান, সঙ্গীতের ধ্বনির মতো, চিত্রকরের রঙের মতো যে-ভাষা, সেই ভাষা, কিংবা এবার আরো নির্দিষ্ট করে বলি শব্দভাণ্ডার, সংসারী এবং সাহিত্যিক দু'জনের জন্যেই সমান উন্মুক্ত এবং ব্যবহারযোগ্য। 'বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তী, ভদ্রপাড়া আর ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়ালাম'— এই বাক্যটি একজন শামসুর রাহমান কবিতায় উচ্চারণ করলেও, বিচ্ছিন্নভাবে এই একই বাক্য— অবিকল একই চেহারায়— একজন গৃহস্তের মুখেও উচ্চারিত হতে পারে। আর এ কারণেই, বাইরে থেকে দু'ক্ষেত্রেই বাক্যের ও শব্দ ব্যবহারের চেহারা অভিন্ন বলেই, লেখক ছাড়া আর সকলের কাছে মনেই হয় যে ভাষা তো হাতের কাছেই আছে, কেবল বড় রকমের বা চাঞ্চল্যকর একটি ভাব মাথায় আসবার অপেক্ষামাত্র; অথবা এমনও মনে হয়, ভাব আছে, ভাষাও আছে, সময় করে টেবিলে শুধু কাগজ গুছিয়ে বসা হচ্ছে না— এই যা!

যাঁরা বলেন, 'ভাব আছে, ভাষা নেই'— তাঁদের মনের কথাটি হচ্ছে, ভাষা নেই মানে অভিধানের বহু শব্দ তাঁদের জানা নেই, ব্যাকরণ সম্পর্কে অতটা জ্ঞান নেই, ব্যাকরণটা একটু রপ্ত করতে পারলেই এবং কিছু শব্দ আর অর্থ জেনে নিতে পারলেই মাথার ভাবটিকে তাঁরা দিব্যি লিপিবদ্ধ করে ফেলতে পারতেন। আসলে কিন্তু তা নয়।

ব্যাকরণ জানা থাকলে আর শব্দের ভাণ্ডার বৃহত্তর হলেই সাহিত্য লেখা যায় না। অনেকেই হয়তো জানেন না, তাঁদের যে ব্যাকরণ পরিচয় আছে এবং যত সংখ্যক শব্দ জানা আছে তা দিয়েই সাহিত্য রচনা সম্ভব, যদি— এবং এই যদিটুকুতেই যা কিছু তফাত— যদি তাঁরা শব্দগুলোকে প্রতিদিনের অর্থ থেকে বিযুক্ত করে দেখতে পারতেন।

প্রতিদিনের অর্থ থেকে শব্দকে বিযুক্ত করে দেখার ব্যাপারটা হচ্ছে চিত্রকরের রঙের মতো, সঙ্গীত-রচয়িতার হাতে ধ্বনির মতো ভাষার শব্দকে বিশুদ্ধ একটি উপাদানে পরিণত করে তোলা। এবং একবার এই বিযুক্তিকরণ সম্ভব হলেই আমরা দেখব শব্দের অর্থ-প্রতিভা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি দুটি শব্দ একে অপরের দেহে প্রতিফলিত হয়ে যুগলে নতুন একটি অর্থের জন্ম দিচ্ছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্করহিত দুটি বস্তুর ভেতরে এমন এক বন্ধন রচিত হচ্ছে যা শিল্প।

আমার একটি সিদ্ধান্ত আছে : শিল্প মূলত এমন দুটি বস্তু, এমন দুটি অনুভব, এমন দুটি অভিজ্ঞতার ভেতরে সম্পর্ক স্থাপন যা ইতোপূর্বে অজ্ঞাত ছিলো, অচিন্তিত ছিলো। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই, অতি ব্যবহৃত এই উপমাটি— 'চাঁদের মতো মুখ'। ভেবে দেখুন, পৃথিবীতে যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন চাঁদের সঙ্গে মুখের, সম্পূর্ণ ভিন্ন মণ্ডলের, ভিন্ন উপাদানের, ভিন্ন অস্তিত্বের এই দুটি বস্তুর ভেতরে একটি সম্পর্কসূত্র, তিনি কীই না দুঃসাহসিক ছিলেন কল্পনায়! সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন কবি, যদিও আজ ব্যবহারে-ব্যবহারে মলিন এই উপমাটি অতি নির্বোধ কোনো রমণীকেও শোনাতে আমরা ভীষণ ইতস্তত করব। প্রথম সেই ব্যক্তিটির পক্ষে এই উপমা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিলো কারণ তিনি 'চাঁদ' এবং 'মুখ' এই দুটি শব্দকে প্রতিদিনের ব্যবহার ও প্রতিদিনের শব্দার্থ থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন।

একজন লেখকের প্রথম শর্তই হচ্ছে, তিনি গদ্যই লিখুন আর কবিতাই লিখুন, দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে মুক্তি দিয়ে শব্দকে বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রহণ করবেন এবং তারপর তাঁর অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি সেই শব্দ-সকলের ভেতরে চারিয়ে দেবেন। এই চারিয়ে দেয়াটা ষোলোআনাই ভাব-নির্ভর, এবং এই 'ভাব' সম্পর্কেও আমাদের আছে মারাত্মক একটি ভুল ধারণা।

ভাব আছে ভাষা নেই

'ভাব আছে ভাষা নেই'— এ হতেই পারে না। ভাব থাকলে তার ভাষাও আছে। ভাষা যদি লেখককে পরাজিত করে তাহলে আমি অন্তত বুঝে নেব যে লেখকটির ভাবেই আছে গলদ। ব্র্যাকেটে আবার এও বলে রাখি যে 'ভাব আছে, ভাষাও আছে' তার মানে এ নয় যে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই তরতর করে লিখে ফেলা যাবে।

ভাব থাকা সত্ত্বেও লেখার পরিশ্রম আমাদের স্বীকার করতে হয়, মনে মনে বা কাগজের পাতায় বারবার কাটাকুটি করতে হয়, বাক্য কি কোনো অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদই হয়তো পুরো নতুন করে লিখতে হয়, এমনকি লেখা শেষ হয়ে যাবার পরও বর্জন-সংযোজন করতে হয়। সৃষ্টির আছে একটা অন্ধকার দিক, আর সে কারণেই লেখককে সতর্ক থাকতে হয়, বারবার আলো ফেলে দেখতে হয়, যে, তাঁর হাত দিয়ে যা বেরুলো সেটা সর্বাংশে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য হলো তো ?

লেখার পেছনে 'ভাব' থাকতেই হবে; গোলমাল এই 'ভাব' কথাটি নিয়েই।

'ভাব' বলতে আমরা কী বুঝি ? আমার এক গুরুস্থানীয় আত্মীয় ছিলেন, তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর গ্রামে যেতে বলতেন; বলতেন, তাঁর ওখানে গেলে, বিশেষ করে খালপাড়ে জামগাছের তলায় বিকেলবেলা বসলে, লেখার জন্যে প্রচুর 'ভাব' আমি পেয়ে যাবো। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি মফস্বলে চিকিৎসক; তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটালেই লেখার অনেক উপকরণ আমি পেয়ে যাবো অর্থাৎ 'ভাব' সংগ্রহ করতে পারবো। আবার এমন কিছু পরিচিত নারী-পুরুষ আছেন যাঁরা দেখা হলেই আমাকে তাঁদের 'ভাব'টি ধার দেবার জন্যে অধীর হয়ে পড়েন।

এই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, প্রথম যৌবনে আমরা যে ক'জন গল্প লিখছিলাম, আমাদের কারো কারো প্রধান একটি খেদ ছিলো যে আমাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নেই— জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা; তাই কোনো কোনো বন্ধু তখন বলতেন, এবার গ্রামে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে হবে, কিংবা মেঘনায় জেলেদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করতে হবে, নইলে আর লেখা যাচ্ছে না; এই সূত্রে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-র কথা তখন আমরা খুব আওড়াতাম।

কিন্তু সেদিন যেটা আমরা বুঝতাম না— নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্যই দরকার, তবে যেহেতু আমি বেঁচে আছি, বিশেষ একটা পরিবেশে বাস করছি, একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তাই এ কথা বলা যাবে না যে লেখায় ব্যবহারযোগ্য আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আমরা যে যেখানে আছি, যে যে-পরিস্থিতিতেই আছি, প্রতি মুহূর্তে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি; আর সমূহ এ অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে একটা উদ্যোগ দরকার। আর এই উদ্যোগটি ঠিক কী, তা আমাদের জানা নেই বলেই ইতোমধ্যে অর্জিত ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে হয় না; শূন্যতা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, শহরবাসী হয়ে গ্রামজীবন সম্পর্কে জানলাম না লিখলাম না বলে ব্যর্থ মনে করি নিজেকে, কিংবা আরো মারাত্মক— এমন সব লেখা লিখি, যার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই। বস্তুত, শোনা কথা বা যেমনটি হলে 'আহ, এই লেখকের বেশ জানা আছে তো জেলেদের বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের জীবন!'— এই কথাটি লোকে যেন বলে তেমনটি লেখার জন্যে আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্তু এই কথাটি যিনি বলছেন, তিনি কতটা পরিণত মনের মানুষ, কতটা সচেতন, তা আমরা বিচার না করেই এগোই এবং এদেরই কাছে প্রশংসা পেয়ে ধন্য বোধ করি।

আসল কথা, আমার তো তাই মনে হয়— আমরা কি লেখক কি লেখক-যশোপ্রার্থী কি পাঠক, সবাই আমরা আমাদের অনুভূতি-অভিজ্ঞতা এবং 'ভাব', এ দুই অভিন্ন করে দেখে থাকি, আর গোলমালটা এখানেই।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা অবিরাম অর্জন করে চলেছে, তা সে অভিজ্ঞতা রাস্তায় হোঁচট খাবার মতো তুচ্ছ এবং বিনাশী অভিজ্ঞতাই হোক, কিংবা পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু হতে দেখে নিজের ভেতরে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের প্রেরণাবোধ করবার মতো ত্রিকালছোঁয়া অভিজ্ঞতাই হোক।

অনুভূতি ছাড়া মানুষও নয়; প্রতি মুহূর্তই আমরা কোনো না কোনো অনুভূতির জন্ম হতে দেখছি আমাদেরই মন ও চেতনার ভেতরে। কিন্তু অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকাই ওই মানুষটির লেখক হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রেমে একজন প্রতারিত হয়েছেন, তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, কাউকে এখন আর তিনি বিশ্বাস করেন না— এরকম ব্যক্তি অনেকেই কোনো লেখককে, যদি কোনো লেখক তার পরিচিত থাকে, অনুরোধ করে যে আপনিই আমার কাহিনীটি লিখুন না দয়া করে— আমার ভাষা থাকলে আমিই লিখে ফেলতে পারতাম! কিন্তু না, ভাষা থাকলেও লেখা যায় না, যেমন কেবল অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা থাকলেই লেখা যায় না। কেন যায় না ? সেই কথাটিতেই এখন আসছি।

লেখার জন্যে যে 'ভাব' প্রয়োজন, সেটি অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা নয়। অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে যখন আমরা সমাজ, পরিবেশ এবং সময়ের পটভূমিতে স্থাপন করে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারি তখনই তা 'ভাব'; এই স্থাপন করাটা, এই সম্পর্ক আবিষ্কার করাটাই হচ্ছে লেখকের একেবারে গোড়ার কাজ। আর এ যিনি করতে পারেন তিনি এটাও জানেন, লেখার জন্যে তাঁর যে প্রয়োজনীয় জীবন-অভিজ্ঞতা আছে শুধু তাইই নয়, এত বেশি আছে যে কোনটাকে রেখে কোনটা নিয়ে তিনি কাজ করবেন সেটা নির্ণয় করাই তাঁর পক্ষে বিরাট এক সমস্যা।

যিনি বলেন, আমার এ অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি লিখুন, তিনি ভাষা নেই বলে যে অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগাতে পারছেন না তা নয়; তিনি ওই সম্পর্ক আবিষ্কার ও পটভূমিতে স্থাপন করতে অপারগ বলেই হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

অনেক ক্ষেত্রে খোদ লেখকেরাও এটা উপলব্ধি করতে পারেন না; আর তাই দেখা যায়, জামগাছ তলায় বসে ফসলের মাঠ দেখেও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন— এমনকি জীবন বিমুখ— রচনা তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসছে। আবার এর উল্‌টো যাত্রাও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমরা দেখি, পরিবেশ সমাজ ও সময়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেলাতে গিয়ে এতটাই কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়েছি যে বিশ্বাসযোগ্যতাই হারিয়ে গেছে।

অভিজ্ঞতাকে সময়ের পটভূমিতে স্থাপন করতে পারাটাই লেখকের আসল প্রতিভা। অন্যকথায় 'ভাব' কেবল তারই আসে যার আছে লেখার প্রতিভা। আর সবার জন্যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাই, অনুভূতি নিছক অনুভূতি।

ভাব ও ভাষার সম্পর্ক

আমি দেখেছি, লিখতে চান এমন প্রায় অনেকের কাছেই প্রধান এবং গোপন একটি দুর্ঘটনা হচ্ছে— তাঁদের ভাব আছে ভাষা নেই। আমার লেখক জীবনে কম করে হলেও শ'দুয়েক মানুষ আমাকে বলেছেন— যদি ভাষার ওপর তাঁদের দখলটা থাকত!

থাকলে কী হতো ? দখলটা থাকলে তাঁরা লিখতেন!— বাংলাদেশকে দুলিয়ে দিতেন!— এবং খ্যাতির রোদ্দুরে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতেন! এঁদের অনেকে আবার এত দূর মনে করেন যে, কেবল তাঁরা কলম ধরছেন না বলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা বাজার গরম করে রেখেছেন; যদি তাঁরা লিখতেন, যদি তাঁদের ভাষাটা থাকত তাহলে বর্তমান লেখকেরা রণে ভঙ্গ দিতেন!

আবার কিছু তরুণ লেখককে আমি খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করতে দেখেছি যে— ভাষাটা এখনো তাদের দখলে নেই। আর প্রায়ই এমন পুস্তক সমালোচনা আমার চোখে পড়ে যেখানে দুঃখ প্রকাশ করা হয়— আলোচিত লেখকটি ভাষার দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে পারতেন!

আমার মনে হয়, এসব কথার গোড়াতেই একটা ফাঁক আছে। ধরেই নেয়া হয়েছে যে ভাব এবং ভাষা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রয়োজন ও প্রেরণার ক্ষেত্রে ভাষা ছাড়াই ভাব এসে পড়তে পারে; কিংবা ভাষাটা আয়ত্ত্বে আছে, কেবল যুৎসই একটা ভাবই আপাতত হাতে নেই।

কিন্তু তাই কি ?

সাহিত্য থাক, দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকানো যাক। আমাদের ভেতরে ক্ষুধা তৃষ্ণাবোধ আছে, সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কিছু চাইবার আছে, কিছু দেবার আছে, শূন্যতা আছে, তৃপ্তি আছে, আর এগুলো আমরা অনবরত প্রকাশ করে চলেছি— প্রধানত ভাষার সাহায্যেই। ভঙ্গি বা অভিব্যক্তি দিয়েও প্রকাশ করি, এর মিশোল তো প্রায় সার্বক্ষণিক, তবে প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ওই ভাষাই।

কই, কখনো তো আমাদের মনে হয় না যে ভাষাটা ঠিক আয়ত্ত্বে নেই বলে মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারলাম না! ক্ষুধার সময় আহার্য চাইতে পারলাম না ভাষার অভাবে, ট্রেন লেট দেখে পাশের লোকটিকে আমার বিরক্তি জানাতে পারলাম না—

এমন দুর্ঘট আমার অন্তত জানা নেই। হয়তো কেউ বলবেন, এমন অনেকে সত্যিই আছেন যাঁরা কিছু বলতে পারেন না, এমনকি মুখ ফুটে খাবারও চাইতে পারেন না। আমি বলব, তাঁদের মুখ যে ফোটে না সেটা ভাষার অভাবের দরুন নয় বরং অনিচ্ছা থেকে; মুখচোরা যিনি, লাজুক যিনি কিংবা স্বভাবতই অপ্রতিভ যিনি, তিনি যে চুপ করে থাকেন তার জন্যে দায়ী ভাষা নয়, দায়ী তাঁর ব্যক্তিত্ব।

কখনো কখনো প্রয়োজনেই আমরা চুপ করে থাকি। যেমন ধরুন, কারো বাবা মারা গেছেন। মৃতদেহের সমুখে তাঁকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। আত্মীয়স্বজন বিলাপ করে চলেছেন কিন্তু তিনি নির্বাক। তাঁর দুঃখ হচ্ছে, শোক হচ্ছে, কিন্তু ভাষা নেই বলে তিনি তা প্রকাশ করছেন না তা নয়। এমনকি তিনি যদি বলেনও যে শোকে তিনি পাথর হয়ে গেছেন, বাক্যহারা হয়ে পড়েছেন, তবু বলবো তাঁর উক্তিটি সত্য নয়। কারণ, এই লোকটিই ধরুন, তাঁর প্রবাসী ছোট ভাইকে বাবার মৃত্যু সংবাদ সে-রাতেই যে লিখতে বসবেন, সে-চিঠিতে তাঁর শোক তিনি ঠিকই প্রকাশ করতে পারবেন, এবং তা প্রতিদিনের ভাষাতেই। তাঁর শূন্যতা প্রকাশের জন্যে তিনি যে চিঠির পাতা শাদা রেখে দেবেন, এটা কোনো উন্মাদও কল্পনা করবে না।

আমরা অনেক সময় বলি, প্রেমের ক্ষেত্রেই আসুন, যে, 'তোমাকে কতখানি ভালোবাসি তাহা ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারি না।'— এখানে আপনি যদি ধরে নেন যে বক্তা সত্যি সত্যি ভাষার কাছে পরাভব স্বীকার করছে, তাহলে ভুল হবে। আসল ঘটনা এই যে, ভাষা ও ভাবই কিন্তু ব্যক্তিটিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে; ঐ যে ভাষায় বোঝানোর অপারগতা— ওটা আসলে ভাষাতেই বোঝাবার বিশেষ এক রীতি। কিংবা অতিব্যবহৃত একটি পথ।

এখানে জনান্তিকে বলে রাখি, আমরা আমাদের নিবিড়তম, শুদ্ধতম, গভীরতম অনুভূতি ও চিন্তাগুলোকে যতই অসাধারণ এবং অপূর্ব বলে মনে করি না কেন, সেগুলো আমরা যে অতিপ্রচলিত, অতিব্যবহৃত, অতিমলিন শব্দগুচ্ছ ছাড়া, কি উচ্চারণে কি চিঠিতে, প্রকাশ করতেই পারি না— যতই আমরা মনে করি না কেন যে এই নারীকে আমি যেমন ভালো বেসেছি আর কেউ তেমনটি ভালো বাসে নি, তবু যে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'র চেয়ে ভিন্ন বা নতুন কিছু উচ্চারণ করতে পারি না— এখানেই লুকিয়ে আছে অনুভবের বিষয়টির সাহিত্য হয়ে ওঠার প্রধান চাবিকাঠি।

প্রতিদিনের প্রয়োজনের মুহূর্তে ভাষা আমাদের এড়িয়ে যায় না কখনোই। আর একথাও বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রয়োজন থেকেই ভাষার জন্ম। মানুষ যেমন সেই সুদূর অতীতে নিজের প্রয়োজনেই নির্মাণ করে নিয়েছে ভাষা, তেমনি আজো মানুষ তার প্রয়োজনের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও তীব্রতার চাপেই ভাষাকে অবিরাম ব্যবহার করে চলেছে। এমনকি নীরবতাকেও আমরা কখনো কখনো ভাষার মতোই, কিংবা ভাষার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলি এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই।

প্রতিদিনের জীবনে সাধারণ আমরা, আমরা যাঁরা লেখক নই, যখনই এই নীরবতাকে ব্যবহার করি, যখন কারো প্রশ্নের পিঠে নিরুত্তর থাকি উত্তর থাকা সত্ত্বেও, তখন নিজের অজ্ঞাতেই প্রমাণ রেখে যাই যে, ভাব ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক-জ্ঞানটি আমাদের রক্তের ভেতরেই আছে।

সম্পর্কটা খুব সোজা করে বলতে গেলে এই যে— অনুভূতি যত গভীরই হোক না কেন যে-ভাবটি আমার ভেতরে রয়েছে তাতে কতখানি বিশ্বাস করছি, আমার সমস্ত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাকে এরই সমমাত্রায় এনে ভাষার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করি, এরই সমমাত্রায় সাহস অর্জন করি শব্দ-সন্ধানের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে— কেবল শব্দই নয়, এ অভিযান উপমা চিত্রকল্প গদ্যভঙ্গি আবিষ্কারেরও বটে।

সাহিত্যের গদ্য কানে শোনার জন্যই লেখা

অভিধান বলে গদ্য হচ্ছে সেটাই যা ছন্দে লেখা নয়— কবিতার ছন্দ। এই যে এখন আমি লিখে চলেছি, এটি কবিতার ছন্দে লেখা নয়, এমনকি লাইন ভেঙে ছাপলেও কেউ এই বাক্যগুলোকে গদ্য-কবিতা বলেও ভুল করবেন না। কবিতা না হয় নাই হলো, অনেক ছন্দোবদ্ধ লেখাও তো কবিতা নয়, যেমন— সেকালে চায়ের বিজ্ঞাপনে পেয়েছি—

ইহাতে নাহিক কোনো মাদকতা দোষ,
কিন্তু পানে চিত্ত করে পরিতোষ।

আবার, ছন্দে লেখা নয়, অথচ কবিতা, এও তো হয়, যেমন— সমর সেনের রচনায়— *বাতাসে ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকার*— এ কবিতারই পঙক্তি, গদ্যে লেখা হলেও।

না, সে অর্থেও আমার এ লেখা কবিতা নয়। আমি লিখছি বিশুদ্ধ গদ্য। কিন্তু মজাটা এখানেই, অভিধানে যা লেখে নি, গদ্যেরও আছে ছন্দ এবং সেই ছন্দটা বাঁধা বা নির্দিষ্ট নয়। গদ্যের এ ছন্দ একেক লেখকের হাতে একেক রকম, বস্তুতপক্ষে প্রতিটি গদ্যলেখকই নির্মাণ করে নেন তাঁর নিজস্ব ছন্দ— তাঁরই, কেবল তাঁরই পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি ছন্দ; এবং সচেতন ও প্রতিভাবান গদ্যলেখক উদ্ভাবন করে নেন একাধিক ছন্দ। একাধিক হলেও সে-সকলের ভেতরে একটি মাতৃ-কাঠামো লক্ষ করা যায়, একটি প্রধান শরীর, যার অস্থি থেকে নির্মিত হয়েছে তাঁরই অপরাপর ছন্দ।

গদ্যের এই ছন্দটি কবিতার ছন্দের মতো বারোয়ারী, অর্থাৎ যে-কোনো লেখকের হাতে ব্যবহৃত হবার জন্যে ছন্দের গাণিতিক হিসেবে শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য নয় বলেই আমরা গদ্যের ছন্দ ঠিক লক্ষ করে উঠতে পারি না। আর এই অপারগতা থেকেই আমরা উচ্চারণ করে থাকি এইসব প্রশংসা যে, 'তাঁর গদ্য চমৎকার', 'তিনি ঝরঝরে গদ্য লেখেন' বা 'তাঁর গদ্যের হাত বড় মিষ্টি।'

গদ্যের ছন্দ আছে, বলা উচিত গদ্যেরও ছন্দ আছে, কিন্তু 'ছন্দ' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থে, কবিতার ছন্দ থেকে আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নিতে হবে। অগত্যা বিস্তৃত করেই বলি যে, গদ্যের এই ছন্দ আসলে একই সঙ্গে গতি এবং ভঙ্গি।

আমার একটি ধারণার কথা এখানে বলে নিলে ভালো হয়— সাহিত্য ষোলোআনাই কানে শোনার জিনিস। অক্ষর সাজিয়ে কাগজের ওপর আমরা সাহিত্য লিখি, সাহিত্য আমরা পৌঁছে দিই লিখিত বা মুদ্রিত অবস্থায়, আর কিছু ব্যতিক্রম স্বীকার করে মনে মনেই আমরা সবাই সাহিত্য পড়ে থাকি। তারপরও বলব, রচনার মুহূর্ত থেকে উপভোগের মুহূর্ত পর্যন্ত সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে কান নির্ভর, তা আমরা যতই অখণ্ড নীরবতার ভেতরে রচনা করি আর মনে-মনে পড়ি না কেন।

কবিতার বেলায় এ কথা মেনে নিতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু ধরুন রবীন্দ্রনাথের *গোরা*— এ উপন্যাস কি কানে শোনার জন্যে, উচ্চারণ করে পড়বার জন্যে লেখা ? আমার উত্তর : হ্যাঁ, অবশ্যই। তাই যদি না হয়, তাহলে, কী করে আমরা লক্ষ করি বাক্য থেকে বাক্য গড়িয়ে যাবার দোলা ? আর কেনই বা লেখক দীর্ঘ বাক্য লেখার পর ছোট ছোট বাক্য লেখেন এবং আবার ফিরে যান দীর্ঘ একটি বাক্যে ? কেন তিনি ক্রিয়াপদকে স্থাপন করেন কখনো এখানে, কখনো ওখানে ? একই সঙ্গে কান এবং মনকে নাড়া দিয়েই সাহিত্যের ধর্মরক্ষা হয়— এই কথাটি স্বীকার করে নিলে আমরা গদ্যেরও যে ছন্দ আছে তা অনায়াসে লক্ষ করতে পারবো।

কান উপেক্ষা করে গদ্য লেখা সম্ভব নয়, মনে মনে পাঠক পড়বেন এটা ধরে নিয়েও গদ্যলেখক কিন্তু জিহ্বায় উচ্চারণের জন্যেই তাঁর রচনাকে প্রস্তুত করেন। যিনি এই উচ্চারণের দিক অস্বীকার করেন কিংবা অনুভব করেন না, তাঁর কাছ থেকে আর যাই হোক 'গদ্য' আমরা আশা করতে পারি না। আর সেই গদ্য, এর ভেতরকার গতি ও ভঙ্গি, যদি বক্তব্যের সঙ্গে হাত ধরে চলে তো আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এক *'অনিন্দজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু'* প্রত্যক্ষ করবার আনন্দ পাই।

গদ্য যখন কানে শোনবার জন্যে নয়, তখন আর সেটা সাহিত্যের আওতায় থাকে না। তখন সে আইনের গদ্য। আসলে, আইনের চত্বরেই গদ্য একমাত্র 'লিখিত' হয়। আইনের গদ্যই মনে মনে পড়বার মতো গদ্যের একমাত্র উদাহরণ। যেমন দেখুন— বলা উচিত, পড়ুন— ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত এই ঘোষণাটি—

যেহেতু বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সংবিধান রচনার জন্যে প্রতিনিধি

নির্বাচনের লক্ষ্যে এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের ভেতরে ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে নির্বাচন করেছিলো এবং যেহেতু সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ডেকেছিলেন এবং যেহেতু আহুত ঐ অধিবেশন একতরফা ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি করে দেয়া হয়েছিলো এবং যেহেতু তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করবার বদলে এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা অব্যহত থাকাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায় এবং বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধ ঘোষণা এবং গণহত্যা শুরু করেন... এইভাবে একের পর এক 'এবং যেহেতু' দিয়ে শুরু বাক্যাংশগুলো আরো এক ডজন বার না পেরুনো পর্যন্ত আমরা জানতেই পারি না এইসব 'এবং যেহেতু'র শেষে আছে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা।

যদি সাহিত্যিক কারণে, অন্ততপক্ষে সাংবাদিক প্রয়োজনে, এই ঘোষণাটি রচিত হতো তাহলে প্রথমেই আমরা শুনতাম বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে, তারপর বর্ণিত হতো ঐ ঘোষণার পেছনে কারণগুলো, অর্থাৎ দৃশ্যত সম্পূর্ণ উল্টো মেরু থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত হতো।

কিন্তু আইনের গদ্য সৃষ্টিশীল গদ্য নয়, তার লক্ষ্য কান ও মনকে নাড়া দেয়া নয়, তার উদ্দেশ্য পাঠক-শ্রোতাকেও সৃষ্টিশীল করে তোলা নয়।

ওই যে বললাম, ওপরের ঘোষণাটি ভিন্ন প্রয়োজনে শেষ থেকে শুরু করতে হতো— এটাও কিন্তু শেষ কথা নয়। হয়তো বর্তমান ঘোষণার জন্যে ঠিক শেষ প্রসঙ্গ থেকেই শুরু করতে হতো, কিন্তু একটি বক্তব্য ঠিক কোন অংশ থেকে লেখক শুরু করবেন সেটা যেমন সৃষ্টির রহস্যময় আঁধার এলাকার ব্যাপার, তেমনি লেখকের নিজস্ব গদ্যছন্দেরও। বিশেষ করে ঐ লেখকের গদ্যভঙ্গির। একেক লেখায় একেক এই ভঙ্গিটুকুর জন্যেই একজন গদ্যলেখক নিজের জন্যে একাধিক ছন্দ উদ্ভাবন করে নিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তিনিই থেকে যান।

গদ্যের ভেতরে গতি ও ভঙ্গি

গদ্যের শরীরে রয়েছে দুটি ঘটনা— গতি এবং ভঙ্গি; ভালো করে দৃষ্টি করলে দেখবো, ওই গতিও ভঙ্গিরই অন্তর্গত। গদ্যের গতি এবং চাল বিষয় বুঝে পাল্টায়, কিন্তু ভঙ্গিটি অক্ষুণ্ন থেকে যায়; বলতে লোভ হয়, এবং বলেই ফেলি— লেখকের গদ্য তার ভঙ্গি, ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে; বস্তুত পক্ষে বাংলাভাষায় তাঁর মতো বিরামহীন দীর্ঘকাল গদ্য আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। প্রথম যৌবনে বিলেত থেকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছ থেকে শুরু করে শেষ বয়সে লেখা ছেলেবেলার স্মৃতি-বর্ণনা পর্যন্ত কত বিচিত্র মাধ্যমে কত রকমের প্রয়োজনেই-না রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেছেন— চিঠি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, লিখিত ভাষণ, মৌখিক উচ্চারণ, এমনকি নাটক— হ্যাঁ, তাঁর নাটকে পর্যন্ত আমরা লক্ষ করি বিশিষ্ট এক ভঙ্গি; হয়তো সে ভঙ্গি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো স্বাস্থ্য, আরো কান্তি পেয়েছে, কিন্তু চেনার বাইরে কখনোই বদলে যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব ভঙ্গিটির জন্যেই, তিনি সাধু কিংবা চলতি যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনে নিতে পারি স্বাক্ষরহীন অবস্থাতেও; এমনকি তাঁর প্যারডি রচনা করাও আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় ঐ ভঙ্গির ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র। 'সে চলে গেল। তার চলে যাবার সুরটি চিরকালের বাঁশী হয়ে রয়ে গেল কোথাও।'— এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, কিন্তু রাবীন্দ্রিক— শুদ্ধ এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গিটি এখানে ধার করা হয়েছে।

গদ্যের এই ভঙ্গি, আমার ধারণায়, কতগুলো উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে। অংকের মতো যোগ মিলিয়ে দিতে পারব না— সৃষ্টিশীল যে-কোনো কাজের বেলায় সেটা অসম্ভব প্রস্তাব; সৃষ্টির প্রক্রিয়া— তার সবটাই আলোকিত নয়; তবু চেষ্টা করতে পারি। আমার মনে হয়, গদ্যের ভঙ্গি— এর মূল শেকড়টি তার লেখকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত রুচি এবং যে শ্রেণীর জন্যে লেখা সেই শ্রেণীর সবচেয়ে উন্নত সদস্যদের গড় বাগ্‌ভঙ্গির ভেতরে প্রোথিত। এই তিন ক্ষেত্র থেকে রস নিয়েই গদ্যভঙ্গির বিস্তার— সংস্কৃতি, রুচি এবং উদ্দিষ্ট শ্রেণী; এর পরেই আসে বাক্যগঠন পদ্ধতি, উপমা-তুলনা-চিত্রকল্প সংগ্রহ করবার নিজস্ব ভাঁড়ার এবং আপন ব্যক্তিত্ব-প্রতিফলিত শব্দের ব্যবহার। এগুলো তো বটেই, এর অতিরিক্ত আরো কিছু উপাদান নিশ্চয়ই আছে যার সৃষ্টিশীল প্রয়োগেই আমরা বিশিষ্ট এক গদ্যভঙ্গি পাই।

একটু আগে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে 'এমনকি নাটক' কথাটা বলেছি; ওই 'এমনকি' ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। আমার ধারণা, গদ্য রচনার একমাত্র উদাহরণ নাটকেই কেবল লেখকের গদ্যভঙ্গি সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা যে কখনোই কোনো নাটকের গদ্য নিয়ে, তথা নাট্যকারের গদ্য নিয়ে কথা বলি না, তার কারণ, নাটকে গদ্য আসে সংলাপ হিসেবে এবং সে সংলাপ কোনো না কোনো চরিত্রের সংলাপ। নাট্যকার যখন সংলাপ লেখেন তখন তিনি তাঁর নিজস্ব কাঠামোর ভেতরে থেকে নয়, তাঁর সৃষ্ট সেই বিশেষ চরিত্রটির সামাজিক ও ব্যক্তিগত কাঠামোর ভেতরে থেকেই লেখেন। কথাটা ভালো বোঝা যাবে উৎপল দত্তের প্রবন্ধের গদ্যের পাশাপাশি তাঁর নাটকের 'গদ্য' রেখে দেখলে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য নাটকগুলোর সংলাপেই যে রচয়িতার পরিচয় প্রকাশ পায় তার প্রধান কারণ, চরিত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের মতোই

কথা বলে, তারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার একই ক্ষেত্র থেকে উপমা তুলনা চিত্ররূপ আহরণ করে, একই বাক্যগঠন রীতি অবলম্বন করে, বাক্যে ক্রিয়াপদও তারা একই ভাবে ও অবস্থানে বসিয়ে থাকে।

গদ্যভঙ্গির আরো একটি উপাদান— ইংরেজি বাক্যগঠন রীতি। ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠন রীতির অনেকখানিই আবার জর্মন রীতি থেকে ধার করা; তাই একে আমি এখন ইয়োরোপীয় রীতি বলব। এই রীতির প্রয়োগ বাংলা গদ্যে খুব বেশি দিন শুরু হয় নি; বলা যায় তিরিশের দশকে, প্রধানত তিরিশের কবিদের হাতেই এর সূত্রপাত। এ গদ্য যে বাঙালি কৃষকের মাথায় ইয়োরোপের ফেল্ট হ্যাট, তা নয়; অনুবাদ, তাও নয়। বাংলাভাষা জীবন্ত ভাষা, আর জীবন্ত বলেই তার ক্ষুধা আছে, নতুনতর ভাববহনের জন্যে অধিকতর বল সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে; সেই প্রয়োজনেই বাংলাভাষাকে ইয়োরোপীয় ওই বাক্যগঠন রীতি আত্মসাৎ করতে হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু, আমার ধারণা, ইয়োরোপীয় রীতির সঙ্গে বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির সবচেয়ে সক্ষম ও সফল বিবাহটি দিতে পেরেছিলেন। তাঁর সবশেষ গদ্যের বই 'মহাভারতের কথা' থেকে যে-কোনো একটি অংশ পড়ি—

কত সুখ হতো আমাদের, যদি সঞ্জয়ের শেষ পরামর্শটি মেনে নিয়ে এবং নিজের ইচ্ছার নির্দেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতেন— যদি সেই শোণিতস্রাবী আঠারো দিন ধরে আমরা তাঁকে চোখে না দেখতাম— অথবা দেখতাম বলরামের মতো কোনো স্নিগ্ধ তীর্থে, কোনো নির্জন নদী তীরে বিশ্রান্ত। কিন্তু তিনি যে শুধু শারীরিকভাবে দূরে গেলেন না তা নয়, পারলেন না মনের দিক থেকেও সরে যেতে : আমরা দেখছি জুয়োর মতোই জয়ের নেশাতেও মেতে উঠেছেন তিনি, আর সে জন্যে অন্যায় কাজও একের পর এক করে যাচ্ছেন।

বলে দিতে হবে না, এখানে বাক্যগঠন রীতি কোনো দিক থেকেই বাংলা ভাষার চেনা চলন বা বাংলা ব্যাকরণ সম্মত নয়; অথচ এ শুধু বাংলাই নয়, জীবন্ত বাংলা; এ গদ্য এক প্রতিভাবান লেখকের সৃষ্টিশীল গদ্য, তাঁর আপন গদ্য। গদ্যের যে ভঙ্গির কথা বলছিলাম, লক্ষ করা যাবে, বুদ্ধদেবের বেলায় বিশেষ এই বাক্যগঠনরীতিও তাঁর ভঙ্গি রচনায় বড় রকম সাহায্য করেছে।

গদ্যের ভঙ্গি নির্মাণের পেছনে আরো একটি জিনিশ কাজ করে। এ হলো লেখক নিজেকে পাঠক থেকে কতটা দূরত্বে স্থাপন করছেন; আর, এই দূরত্ব সরল রৈখিক অথবা তির্যক সেটাও একই সঙ্গে লক্ষ করতে হয়।

বিষয় থেকে লেখকের অবস্থান দূরত্ব

লেখক তাঁর একেকটি রচনায় নিজেকে একেক দূরত্বে রাখেন, কথাটা গল্প বা উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁদের বেলায় পুরোপুরি সত্যি বলে আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের বেলায় তা বলতে পারছি না; লক্ষ করেছি, পাঠক থেকে প্রবন্ধলেখকের দূরত্ব বিষয়ভেদে, এমনকি কালভেদেও ভিন্ন হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধও লিখেছেন, গল্প বা উপন্যাসে নিজের অবস্থান যিনি প্রয়োজনেই অনবরত বদলে নিয়েছেন, তাঁর প্রবন্ধে কিন্তু সেই বিচলনটি আমি আবিষ্কার করতে পারি না।

ভাষা এবং ছন্দ বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধ থেকে তিন কালের তিনটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক।

১৩০২ সনে তিনি লিখছেন—

একে বাংলা শব্দের কোনো ভার নাই, ইংরেজি প্রথামতো তাহাতে একসেন্ট নাই, সংস্কৃত প্রথামতো তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘনঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেই রূপে ঘনঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া।

এর বাইশ বছর পর ১৩২৪ সনে রচিত অন্য একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করি—

আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ডক্লাশের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নিচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ডক্লাশের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাশের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে।

আরো একুশ বছর পরে, জীবনের শেষপাদে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৩৪৫ সনে—

মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হলো চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদান-প্রদানে কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হলো মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই তিন উদাহরণ, এদের দিকে তাকিয়ে কি আমাদের চোখে পড়ে না অভিন্ন একটি ধারা— প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি মুখ, যে-মুখ একইভাবে এবং একই কোণ থেকে আমাদের দিকে ফেরানো ? কিন্তু এই কথাটি, এই অনুভবটি অর্জন করা যাবে না রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাসগুলোর সাক্ষাত পাবার পর। *রাজর্ষি, বৌঠাকুরানীর হাট, গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা*— প্রতিটি রচনায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব নিয়ে আমাদের সমুখে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর গদ্যের বোল পালটাচ্ছে, চাল পালটাচ্ছে, গঠন বদলে যাচ্ছে প্রতিটি বার। গল্পগুচ্ছের অখণ্ড সংস্করণ হাতে নিয়ে ওপর থেকে একবার চোখ বুলিয়ে গেলেও আমাদের নজর এড়াবার নয় যে প্রায় প্রতিটি গল্পে তিনি নতুন এবং ভিন্ন গদ্যলেখক।

আমার বিশ্বাস, লেখকের দূরত্ব এবং মুখ যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে, লেখকটির বিশ্বাসের ভেতরে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে; এবং সে পরিবর্তন যদি তাঁর আস্থা এবং অস্তিত্বের শেকড় পর্যন্ত, তবে কখনোই তাঁর আর আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়— ঠিক যেমন বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় মানবপূর্ব প্রাণীতে ফিরে যাওয়া।

মৌলিক এ ধরনের পরিবর্তন, উদাহরণ হিসেবে, লক্ষ করতে পারি সৈয়দ আলী আহসানের বেলায়। তাঁর মধ্যপঞ্চাশ-দশক পূর্বকালে রচিত প্রবন্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালের প্রবন্ধ বা গদ্য রচনাগুলো মিলিয়ে পড়লেই স্পষ্ট হয় যে, এই লেখকের চিন্তার জগত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে সম্পূর্ণ রকমে বদলে যায়, তাঁর বিশ্বাস পালটে যায়, আদর্শ ভিন্ন হয়ে যায়, ফলতঃ তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে যান; আমরা লক্ষ না করে পারি না চিন্তায় তিনি কীভাবে ক্রমেই নত হতে হতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ছেন, বিশ্ব-নাগরিক হবার বাসনা কীভাবে ক্রমেই তাঁর জন্যে মুখোশ হয়ে পড়ছে।

আবার এটাও লক্ষ করবার মতো, জীবনানন্দর কবিতা ঠিক যেভাবে বদলেছে, তাঁর প্রবন্ধ, প্রবন্ধের উচ্চারণ, গদ্যের চাল, তাঁর গদ্যের মুখ সেভাবে আদৌ বদলায় নি। বস্তুতপক্ষে জীবনানন্দর *কবিতার কথা* বইটির পাতা ওলটালেই আমাদের বিস্মিত হতে হয় দেখে যে— দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত তাঁর যে-কোনো দুটি প্রবন্ধ গদ্যশৈলীর দিক থেকে যমজভাইয়ের মতো; অভিজ্ঞতা পরিণত হয়েছে, দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে, উচ্চারণ সংহত হয়েছে— কিন্তু অভিব্যক্তি চেনার বাইরে চলে যায় নি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের দিকে তাকিয়ে, এই প্রথম একটি ব্যতিক্রম আমার চোখে ধরা পড়েছে— এই লেখকের মনের কাঠামো একই থেকে যাওয়া সত্ত্বেও, মৌলিক কোনো পরিবর্তন তাঁর রুচি ও বিশ্বাসের জগতে অনুষ্ঠিত না হলেও, তাঁর প্রবন্ধের গদ্য বদলে গেছে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ, বিশ শতকের এই দুই দশকের ভেতরে। *কালের পুতুল* এবং *মহাভারতের কথা* পাশাপাশি রাখলেই আমরা দেখবো— প্রবন্ধ লেখকেরও গদ্য বদলে যায়, যেতে পারে। আমার সন্দেহ, বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে এই বদল সম্ভব হয়েছে পাঠকের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্বোধনের দূরত্ব এবং কোণ বদলে নিয়েছেন বলেই।

দূরত্ব নির্মাণ

একমাত্র নিজের দিনপঞ্জি আর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে লেখা নোট ছাড়া মানুষ সবক্ষেত্রেই কাউকে না কাউকে উদ্দেশ্য করেই কিছু লেখে। সাহিত্য থেকে ক্ষণকালের জন্যে সরে এসে মানুষের ব্যক্তিগত গদ্যের দিকে তাকানো যাক। দিনপঞ্জি এবং স্মারক— এ দুই যাঁদের লেখার অভ্যেস আছে, লক্ষ করলেই ধরা পড়বে সেখানেও তাঁরা নিজের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব কল্পনা করেই লিখে যাচ্ছেন।

মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে সে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিবহির্ভূত বলে চিহ্নিত করতে পারছে।

ধরা যাক, প্রিয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে আজ আমি অবহেলা পেলাম, তার বাড়িতে গিয়ে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনাটি পেলাম না; এই কথাটি দিনপঞ্জিতে যখন লিখি তখন অভিজ্ঞতাটি আর আমার থাকে না, তখন সে অভিজ্ঞতা আমার অব্যবহিত পূর্বের কোনো অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা, আর তাই মনের ভেতরে আমি ঘটনাটির অভিনয় দেখতে সক্ষম হই, ঘটনার শরীরে ধৃত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিটি একই সঙ্গে আমার এবং অন্য কারো বলে অনুভব করে উঠি— আমার কলম দিনপঞ্জির পাতায় এগিয়ে চলে।

যদি এই দূরত্বটুকু রচিত না হয়, যখন তা হয় না, তখনি কলম থেমে যেতে চায়, শব্দের অগ্রসরণ ব্যাহত হয়, আমাদের থেমে ভেবে নিতে হয়; সে ভাবনা কেবল উপযুক্ত শব্দ সন্ধানের নয়, আমার বিশ্বাস দূরত্বটুকু রচনা করে নেবারই ভাবনা সেটি। আরো সাক্ষাৎ করে বলতে পারি— সে ভাবনা 'কীভাবে লিখব', 'কেমন করে লিখব', 'কী করে লিখলে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বর্ণনা হবে আমার বিচারে'— এ সকল ভাবনাই বটে।

লক্ষ করে দেখি, এই 'কীভাবে' 'কেমন করে' আর 'কী করে' আমাদের মনেই পড়তো না যদি না নিজের অভিজ্ঞতা নিজেরই জন্যে লিখতে গিয়ে এবং গিয়েও, আমরা নিজেরই সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব না অনুভব করতাম।

এই যে দূরত্ব নির্মাণ, সাহিত্যেও এই কাজটি আমরা করে থাকি। আমরা যখন গদ্য লিখি, হোক প্রবন্ধ কিংবা কাহিনী, ভ্রমণকথা অথবা আত্মস্মৃতি, যা কিছুই আমরা লিখি না কেন, পাঠকের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব আমরা রচনা বা নির্ণয় করে নিই। এই 'দূরত্ব' শব্দটিকে বিনাশী অথবা প্রতিকূল অর্থে ধরে না নিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

দূরত্ব বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, লেখক নিজেকে ঠিক কোথায় স্থাপন করছেন পাঠকের অবস্থান থেকে। আমি বাংলা ভাষায় রচিত চারটি উপন্যাসের নাম করছি— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ*, রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*, শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*। বাংলা সাহিত্য যাঁরা হেলাফেলা করেও পড়েছেন, আমার বিশ্বাস তাঁরাও এই চারটি উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত। আমি এখন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো উপন্যাস চারটির কাহিনী নয়, বলবার ভঙ্গি; এবং এমন আশা করা মোটেও আমার পক্ষে অন্যায় হবে না— বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যে যুবা ও গৃহিণীগণ তাঁরাও লক্ষ করতে পারবেন, এই চারটি উপন্যাসের বলবার ভঙ্গি সম্পূর্ণ চার রকম। তফাৎটা ভাষার নয়, সাধু কিংবা চলিত; তফাৎটা কাহিনী নির্মাণের কৌশলের নয়; এমনকি বর্ণনা ও সংলাপের বণ্টনজাত তফাৎটাও গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ নয়; তফাৎ এইখানে যে, এই চারটি উপন্যাসে চার জন লেখক চারটি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে আমাদের হাতে অভিজ্ঞতা বিতরণ করছেন।

উপন্যাস চারটি আবার পড়লে, আমি নিশ্চিত, আমার মতো আপনাদেরও চোখে পড়বে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *আনন্দমঠ* উপন্যাসে বর্ণিত পৃথিবী এবং সময় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত রেখে, প্রত্যক্ষ কোনো মন্তব্য করা থেকে বিশ্বস্ত রকমে বিরত থেকে, মহাভারতের সঞ্জয় চরিত্রটির মতো দরবারী দূরত্বে থেকে, ঘটনাকে নির্মম নগ্নতায় অবলোকন করতে করতে বলে চলেছেন। আবার, *শেষের কবিতা*-য় রবীন্দ্রনাথ নিজেরই হাতে তৈরি কিছু প্রতিমায় যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, সেই সপ্রাণ প্রতিমাগুলো এখন তাঁকেই সকৌতুকে উপেক্ষা করে একটি জীবন যাপন করে গেছে; এবং তিনি এখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট একটি অন্তরঙ্গ আসরে সস্নেহে তাদেরই ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে পাঠকের মুখোমুখি বসে আছেন এবং খুব কাছেই তাঁর আসনখানি; আর বঙ্কিমচন্দ্র একটু আগে ছিলেন পাঠকের পাশাপাশি এবং উভয়েরই দৃষ্টি একই সঙ্গে ছিলো ঘটনা ও চরিত্রের দিকে।

এদিকে, শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে আমরা অনুভব করি, লেখক ও পাঠকের ভেতরে বস্তুত কোনো দূরত্বই নেই; এখানে দু'জনেই আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং ক্রমাগত সঞ্চরণশীল; এ উপন্যাসের পৃথিবী এবং সময়ের ওপর লেখকের কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই, কখনোই তিনি তা দাবি করেন না; তিনি আমাদেরই স্তরে অবস্থান নিয়ে কথা বলে চলেছেন এবং তাঁর উচ্চারণগুলো মনে হয় যেন আমাদেরই উক্তি।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* আমাদের সন্ধান দেয় লেখক ও পাঠকের মধ্যে আরেক ধরনের দূরত্বের। এ দূরত্ব একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দূরত্ব, যে-আত্মীয়টি জীবনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বোধ করেছেন, কিন্তু সেই বিস্ময়টুকু, বিস্ময়ের পেছনে রহস্যটুকু তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট হয় নি বলে তিনি পাঠকের সঙ্গে, পাঠক অপরিচিত হলেও, তারই সঙ্গে অতি পরিচয়ের সখ্য অনুভব করবার মতো আন্তরিকতা ধরে আছেন। এই পাঠককে তিনি হাত ধরে দাঁড় করান উপন্যাসে, ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে তিনি যেন নিজেই বুঝে নিতে চান জীবনের এই বিস্ময়ের উৎস এবং রহস্যের সূত্র।

লেখকের এই দূরত্ব, এই অবস্থানগত সম্পর্ক বন্ধন, গদ্যের ওপর কতখানি ক্রিয়াশীল তা লক্ষ করা যাবে উল্লেখিত ওই চারটি উপন্যাসের দিকে তাকালে। এবং এই দূরত্ব যে একই লেখকের দুই রচনায় দু'রকমের হতে পারে, তা বোঝা যাবে একই লেখকের দুটি উপন্যাসের দিকে যদি আমরা তাকাই। যেমন, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *দিবারাত্রির কাব্য*— এ দুই উপন্যাসে এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের সঙ্গে দু'রকম দূরত্ব স্থাপন করেন বলেই রচনা দুটির গদ্যভঙ্গিও সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এতক্ষণে বলা যায়, এই দূরত্ব রচনা আসলে গল্প বলার কৌশলেরই অন্তর্গত। কৌশলটি যখন উৎরে যায়, আমরা অনুভব করি *শেষের কবিতা*-র আঙ্গিকে *আনন্দমঠ* লেখা যেতো না, কিংবা *শ্রীকান্ত*-র অবস্থানবিন্দু থেকে *পদ্মানদীর মাঝি* কখনোই। আরো লক্ষ করা যায়, বলবার এই দূরত্ব লেখকের গদ্যের ওপর বিশেষ একটা কাজ করে থাকে— গদ্যের চাল পালটে দেয়, গদ্যের গতি ভিন্ন রকম হয়ে যায়।

দূরত্ব বদলে দেয় গদ্যের চাল

একই লেখকের দু'টি লেখা নিয়ে কথাটা আরো খানিক বুঝে নেয়া যেতে পারে : রবীন্দ্রনাথের *জীবিত ও মৃত* এবং *ছুটি*। আপাতচোখে মনে হবে দুটি গল্পই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন একই অবস্থানবিন্দু থেকে, অর্থাৎ দুটি গল্পই তিনি বলছেন পাঠক থেকে এক নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রেখে; লেখক এর কোনোটিতেই নিজে কোনো চরিত্র নন, যেমন তিনি ছিলেন *কাবুলিওয়ালা* গল্পে মিনির পিতা; কিন্তু একটু ভালো করে পড়লেই আমরা আবিষ্কার করব— না, একইভাবে বলা মনে হচ্ছে বটে, সে মনে হওয়াটা ভুল; সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দূরত্বে লেখক নিজেকে রেখেছেন এ দু'টি গল্পে।

জীবিত ও মৃত গল্পটি বলা হয়েছে এমনভাবে যেন লেখক ঘটনাটি শুনেছেন, কিন্তু ঠিক পুরো শোনেন নি, যতটুকু শুনেছেন তার ভেতরকার যুক্তিতর্কের সিঁড়িটাও যেন তাঁর কাছে সবসময় স্পষ্ট হয় নি এবং শ্রোতা পাছে কোথাও অবিশ্বাস করে বসে তাই লেখকের ভেতরে এক ধরনের ব্যাকুলতা এ গল্পে লক্ষ করা যায়, যে-ব্যাকুলতা থেকে তিনি মাঝে মাঝেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি সরবরাহের চেষ্টা করেছেন।

এই সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে *জীবিত ও মৃত* গল্পের তিনটি বাক্যে। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য— *সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সময়মতো পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়।* এই বাক্যটির শুরুতেই 'সকলেই জানেন' লক্ষ

করা দরকার; রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলেই এ দুটি শব্দ বাদ দিতে পারতেন, কিন্তু দেন নি এবং আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনের অনুরোধে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তিনি শব্দ দুটি লিখেছেন; আর এতেই আমরা যেন গল্পের বক্তাটিকে একপলকের জন্যে দেখে নিতে পারছি, যিনি আমাদের মনে ক্ষণকালের অবিশ্বাস দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি তথ্য জানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় বাক্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষ দিকে, *সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা।* বলে দিতে হবে না, ওই 'জানি না' কথাটি একেবারে স্পষ্ট করে দিচ্ছে পাঠক থেকে লেখকের দূরত্বটুকু; এখানেও রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলেই 'জানি না' কথাটি কেটে দিতে পারতেন— দেন নি।

আর গল্পের শেষ বাক্য, সেই বিখ্যাত বাক্য যা এখন আমাদের মুখে প্রবচনে পরিণত— *কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।*—এই বাক্যটি কি আমাদের নিশ্চিত করে দিচ্ছে না একজন বক্তার উপস্থিতি ?— এবং এমন একজন বক্তা যিনি এতক্ষণ নিজেই অনুভব করছিলেন যে, হয়তো তাঁর শ্রোতারা গল্পটি অবিশ্বাসের সঙ্গেই শুনে এসেছে, তাই এখন তিনি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, সবচেয়ে মর্মান্তিক ও নির্মম প্রমাণটি ছুঁড়ে দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমাদেরই দিকে এবং তাঁর নিজেরই চারদিকে এখন কল্লোলিত হয়ে যাচ্ছে একটি হাহাকার।

এর পাশাপাশি *ছুটি* গল্পটি পড়লে আমরা দেখব, লেখক দাঁড়িয়ে আছেন খাঁটি নিরপেক্ষ দূরত্বে; কোথাও তিনি এক মুহূর্তের জন্যে সমুখে আসেন নি, যুক্তি সরবরাহ করেন নি, পাঠকের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে তা গণনায় এনে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ গল্পে লেখক প্রথম বাক্য থেকেই জানেন গল্পের পরিণতি কী হবে; তাই প্রথম বাক্যটিই তিনি দীর্ঘ করে লিখলেন। এই প্রথম বাক্যে যে তিন বাক্যাংশ আছে, অনায়াসে দাঁড়ি ব্যবহার করে তিনটি বাক্যে তা ভেঙে নেয়া যেত, তিনি নিলেন না। তিনি লিখলেন,

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

দীর্ঘ এই বাক্যগঠন বারবার ফিরে এসেছে *ছুটি* গল্পে; আর এটা যখন লক্ষ করি তখন আমরা বুঝে ফেলি যে, একটা দীর্ঘশ্বাস ভেতর থেকে কাজ করে চলেছে, কৈশোর-মৃত্যুর মেঘ এসে ছায়া ফেলছে; এই মৃত্যুর কি আবশ্যকতা ছিলো, ঈশ্বরের তাতে কোন দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য সাধিত হলো— এই বেদনা সঞ্চারিত করে দেবার জন্যেই, আমার অনুমান, রবীন্দ্রনাথ *ছুটি* গল্পে গদ্যের চাল এরকম নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন।

ছুটি গল্পের যে-কোনো একটি অংশ যদি এরকম হয়—

কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত, ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

— তাহলে এর পাশাপাশি পড়া যাক *জীবিত ও মৃত* গল্পের যে-কোনো একটি অংশ—

এমন সময়ে তাহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একবার ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

আমাদের বলে দিতে হবে না, দুই অংশে গদ্যের চাল দু'রকম, গঠন দু'রকম, যতি পড়ছে দু'রকমে। *ছুটি*-র গদ্য দীর্ঘশ্বাস জড়ানো এবং ধীর, *জীবিত ও মৃত*-র গদ্য থেমে থেমে চম্‌কে চম্‌কে এগিয়ে চলেছে। আমরা অনুভব করি, *ছুটি*-র মতো করে *জীবিত ও মৃত* লেখা যেত না, কিংবা *জীবিত ও মৃত*-র মতো করে *ছুটি*। আমরা আরো ভেতরে তাকিয়ে দেখি, লেখক তাঁর এ দু'টি গল্পে পাঠক থেকে দু'প্রকার দূরত্বে অবস্থান করছেন বলেই আপাত চোখে এক আঙ্গিকের গল্প বলে মনে হলেও আসলে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন; আর এই ভিন্নতার অস্থি লক্ষ করা যাবে এ দু'টি গল্পের গদ্যের শরীরেই— আর কোথাও নয়।

গল্পে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপ

গল্প বলবার কৌশলের ভেতরে একটি বড় প্রশ্ন লুকিয়ে রয়েছে— ক্রিয়াপদের কোন্ রূপটি ব্যবহার করবো ? বাংলার আগে ইংরেজির দিকে তাকানো যাক। ইংরেজি ভাষায়— এই ভাষাটির সঙ্গে মাতৃভাষার পরেই আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়— গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখকেরা ক্রিয়াপদের যে কালরূপটি ব্যবহার করেন তা হচ্ছে 'পাস্ট ইনডেফিনিট' অর্থাৎ সাধারণ অতীত— সিলভিয়া ঘরে ঢুকল, পিটার বলল, জেনি হাত থেকে রুমালটা ছিনিয়ে নিল; ইরেজি কথাসাহিত্যে ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপটি সেই আদি থেকে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলাতেও ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীতকাল রূপটি গল্প বলায় বারবার ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। লক্ষ না করে পারি না, মা যখন শিশুকে রূপকথা বলেন, সে

রূপকথার ক্রিয়াপদগুলো সাধারণ অতীত— রাজপুত্র আস্তে করে দরোজা খুলল; দেখল সোনার খাটে শুয়ে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যা। ভারতবর্ষের আদিকাব্য মহাভারত, যার ভেতরে এই ভূখণ্ডের বহু উপখ্যানের মূল কাঠামো আমরা আবিষ্কার করতে পারি, সেখানেও আদি কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপটি মূল কাঠামো হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।

রাজ শেখর বসুর অনুবাদ থেকে—

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহৃদগণ রয়েছেন দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যুদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকোচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে।

কাহিনী বলতে গিয়ে ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীতকাল রূপটিকে মূল বলে আশ্রয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। *ছুটি* গল্প থেকে—

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা মানিক আমার।' ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।' মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।' ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আদি স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্রও ক্লান্তিহীনভাবে ব্যবহার করেছেন ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীতকাল রূপ। তাঁর *চন্দ্রশেখর* উপন্যাস থেকে—

প্রতাপ ডাকিল, 'শৈবলিনী— শৈ।' শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল— হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে 'শৈ' অথবা 'সই' বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, প্রতাপ, আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?

তারাশঙ্কর, তাঁরও প্রিয় ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপ। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* থেকে—

মুখ খুলেছিল পানু, কিন্তু তার আগেই একটা সুঁচালো বাঁশীর শব্দ বেজে উঠল। সেই শিসের শব্দ। শব্দটা আসছে— বাঁশবাদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশ বন থেকে। সকলে চকিত হয়ে কান খাড়া করে চুপ করে রইল। বনওয়ারি বসে ছিল উত্তর মুখ করে, বাঁ হাতে ছিল হুঁকো— সে ডান হাতটা কাঁধর উপর তুলে, পিছনে তর্জনীটা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিলে সকলকে। পিছনে দক্ষিণ দিকে বাঁশ বেড়ের মধ্যে শিস বাজছে। আবার বেজে উঠল শিস। ওই।

লক্ষ করে দেখবো আজও বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে যত গল্প উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে— সন্দেহ হয়, রক্তেরই অন্তর্গত একটি বোধ দ্বারা চালিত হয়ে— ব্যবহার করে চলেছেন ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ। গল্প লেখার মূল কালরূপ যে এটাই তা কি এই কারণে যে, আগুন যেমন উর্ধ্বগামী, জল যেমন নিম্নগামী, গল্পেও ক্রিয়াপদ তেমনি সাধারণ অতীত ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না ?

আমার সন্দেহ আছে। আমার পড়াশোনা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে, ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপও অনেক লেখকই ব্যবহার করেছেন এবং অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনামণ্ডিত সেই ব্যবহার— কোনো লেখক তাঁর কোনো কোনো রচনায়, আবার কোনো লেখক তাঁর সব লেখাতেই। আমার নিজের লেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাংলা গল্প উপন্যাস বা কথকতায় ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপটিও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* থেকে—

কি কারণে তবারক ভুঁইয়া থামে। বাইরে, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে, নদীর বিক্ষুব্ধ অশ্রান্ত পানি আর্তনাদ করে। সে-আওয়াজই সহসা কানে এসে লাগে। শ্রোতাদের মধ্যে একজনের চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে, মুখটা ঈষৎ খুলে সোজা হয়ে বসে সে ঘুমায়। শান্ত মুখ, তাতে ঘুমের কোনো ছায়া নেই। তাই মনে হয় সে বুঝি জেগেই চোখ বুঁজে রয়েছে, অথবা সে অন্ধ। তারপর আবার তবারক ভুঁইয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

ক্রিয়াপদের কালরূপে তৈরি হয় জাদু

বাংলাভাষায় গল্প উপন্যাসে ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ প্রধান; নিত্যবৃত্ত বর্তমান রূপটিও উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; এছাড়া ইংরেজিতে যা দেখি না, বাংলায় আমরা পুরাঘটিত বর্তমান এবং পুরাঘটিত অতীত— অর্থাৎ সে বলেছে, সে করেছে এবং সে বলেছিলো, সে করেছিলো— এ দু'টিও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছি। কোনোটা কম কোনোটা বেশি লাগালেও গল্প বলায় যে ক্রিয়াপদের এতগুলো কালরূপ বাংলাভাষার লেখকদের হাতে রয়েছে— এর একটা মস্ত বড় লাভের দিক আছে।

আবার এই লাভের দিকটাতেই রয়েছে মেঘ ও ঝড়। অস্ত্র বিভিন্ন হলে তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি তো বটেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রও ভিন্ন হতে বাধ্য। ক্রিয়াপদের কোন কালরূপ ব্যবহার করবো, সচেতনভাবে বুঝে না নিলে এবং প্রতিভার আলোয় নির্ণয় করে নিতে না পারলে, বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপের শক্তিকেই আমরা

জং ধরিয়ে দেবো। তথ্যটি সাধারণ ও সরল, কিন্তু শুনে চমকে উঠতে হয় যে মানুষের হাজার হাজার ভাষার ভেতরে বহু ভাষা আছে যাদের কোনো লিপি নেই, অথচ এমন একটিও ভাষা নেই যার অস্তিত্ব কেবল লিপিতেই, মুখে নয়। এই থেকে এই কথাটিই কি আমাদের মনে আসে না যে, ভাষার এবং সেই কারণেই সাহিত্যিকের লেখা যে কোনো বাক্যের মূল আবেদন কানের কাছেই ?

গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়াপদের কালরূপ বাংলাভাষায় যেগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার ভেতরের শক্তি এবং রঙ বুঝতে হলে, আমি অনুরোধ করবো নিচের উদাহরণটি উচ্চারণ করে পড়ে দেখতে। আমি আরো যা করতে চাই, একই অংশ বিভিন্ন কালরূপে রচনা করে দেখবো এবং ধারণা নিতে চেষ্টা করবো যে, ওই বিভিন্নতার দরুণ শিল্পের দিক থেকে, মর্মের কাছে আবেদনের দিক থেকে, কীভাবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সচেতন এবং সবচেয়ে মৌলিক ঔপন্যাসিকদের একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি ছোটগল্প স্তন; গল্পটি তিনি লিখেছেন তাঁর প্রিয় কালরূপ নিত্যবৃত্ত বর্তমান ব্যবহার করে। এই গল্পের শেষ দিকের অংশ পড়া যাক—

মাজেদা আর দেরী করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচ থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়, তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ণ ব্যথা তীরের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তবে সে টু শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবার সে মর্মান্তিক ব্যথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে সে নিজেকে সুস্থির করে। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।

এবারে এই একই অংশ লিখে দেখা যাক ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে— যে কালরূপ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই, বাংলায় তো বটেই, লেখকদের এত প্রিয়; ব্যাসদেব, হোমার থেকে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। নিচের অংশটুকু উচ্চারণ করে পড়া যাক এবং ওপরে ওয়ালীউল্লাহর মূলের উচ্চারণ-বিভার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক।

মাজেদা আর দেরী করল না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করল। বালিশের নীচ থেকে একটু হাতড়ে তুলে নিল মাথার সরু একটি দীর্ঘ কাঁটা। তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ তীরের মতো ঝলক দিয়ে

উঠল সুতীক্ষ্ণ একটি ব্যথা। নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল সহসা। তবে সে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে দিল। আবার জেগে উঠল মর্মান্তিক সেই ব্যথা। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হল, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে নিজেকে সে সুস্থির করল। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা করলেও সে বুঝতে পারল, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দু'টি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু হয়ে গেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দুর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।

লক্ষ করে দেখবো, ক্রিয়াপদের কালরূপ বদলাতে গিয়ে কিছু শব্দের অবস্থান বদলাতে হয়েছে— এটা করতেই হয়, কালরূপ কিছু দুরকম টুপি নয় যে একটা খুলে আরেকটা সহজেই পরে নেয়া যায়; ক্রিয়াপদের কালরূপ বাক্যের ভেতর থেকে কাজ করে, বাক্যের দোলা বদলে দেয়। আশা করি, উচ্চারণ করে পড়বার পর দোলার এই তফাৎ কানে ধরা পড়েছে।

একই অংশ এবার আরেকটি কালরূপ প্রয়োগ করে দেখা যাক— ক্রিয়াপদের পুরাঘটিত অতীত কালরূপ। এটিও আমাদের ভাষায় অনেক লেখকের কাছে প্রিয় একটি কালরূপ।

মাজেদা আর দেরী করেনি। তার সময় ছিল না। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম উন্মুক্ত করেছিল, প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন। তারপর বালিশের নীচ থেকে তুলে নিয়েছিল মাথার একটি সরুদীর্ঘ কাঁটা। এবং নিষ্কম্প হাতে ক্ষিপ্রভাবে কাঁটাটি সে বসিয়ে দিয়েছিল কুচাগ্রের মুখে। তৎক্ষণাৎ তীরের মতো ঝলক দিয়ে উঠেছিল সুতীক্ষ্ণ একটি ব্যথা। নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সহসা চতুর্দিক। তবে সে টু শব্দটি করেনি। আরো একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে দিয়েছিল। আবার জেগে উঠেছিল মর্মান্তিক সেই ব্যথাটি। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়েছিল, সে চেতনা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে নিজেকে সে সুস্থির করে রেখেছিল। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পেরেছিল, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু হয়েছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়ে গেছে। স্তন থেকে দুধ সরতে তখন আর বাধা ছিল না।

আমার বিশ্বাস, যে-কোনো সতর্ক পাঠক প্রথমে মূল এবং পরে দুটি পাঠান্তর উচ্চারণ করে পড়বার পর অবশ্যই ধরতে পারবেন, ক্রিয়াপদের কালরূপের ভিন্ন প্রয়োগ ভিন্ন সুরের জন্ম দিচ্ছে, ঘটনা থেকে একেক দূরত্বে আমাদের স্থাপিত করছে, ঘটনার ব্যাপ্তিও কমে যাচ্ছে কি বেড়ে যাচ্ছে, বস্তুতপক্ষে নির্মিত বিশ্বটারই বর্ণবদল ঘটছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, লেখক জীবনের প্রথম প্রায় পনেরো বছর ক্রিয়াপদের কালরূপ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। সেই সময়ের গল্প-উপন্যাস যা আমার কলম লিখেছে, এখন সখেদে আবিষ্কার করি, তার ভেতরে, কখনো কখনো একই রচনায়, ক্রিয়াপদের অবিরাম কাল-অস্থিরতা। ছাপার অক্ষরের কালি বড় নির্মম; আমার সেই শিক্ষানবিশি কালের ক্রিয়া-কলংক মেখে পাতার পর পাতা এখনো লজ্জায় নুয়ে আছে। এখন আমি প্রধানত ব্যবহার করি ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত কালরূপ। অন্য রূপ যে ব্যবহার করি না, তা নয়; একই শিল্পী যেমন জলরঙেও ছবি আঁকেন, তেলরঙেও আঁকেন, একই হাতে দুই আঁকার ভেতরে পার্থক্য থাকে— মেজাজের ও দেখার এবং দেখাবার; সৃষ্টির এ এক সচেতন ভিন্নতা; লেখক কোন লেখায় ক্রিয়াপদের কোন রূপ ব্যবহার করবেন, সেটিও ঠিক ওই জল আর তেলরঙের ভেতরে প্রসঙ্গ বুঝে বাছাই করে নেবার ব্যাপার।

ভুলের অনেক মাশুল দেবার পর, লেখার এতগুলো বছর আর বর্তমান জীবন-বাস্তবতা দেখার পর আমার এখন এতটুকু বলবার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে— বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদের যতগুলো কালরূপ আছে তার ভেতরে সাধারণ অতীত কালরূপটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও, ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপটি চিন্তার জটিলতা যতখানি ধারণ করতে সক্ষম, সাধারণ অতীত কালরূপ তার ধারে কাছেও যেতে পারে না।

সত্য, রবীন্দ্রনাথের মতো বড় লেখক সাধারণ অতীত কালরূপ প্রায় আজীবন ব্যবহার করেছেন, অত্যন্ত সাফল্য এবং মৌলিকত্বের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু সেই তিনিও জীবনের শেষভাগে বহু রচনায়, বিশেষ করে নাতিদীর্ঘ কাহিনীগুলোতে, নিত্যবৃত্য বর্তমান কালরূপটিতেই বারে বারে ফিরে গেছেন; এবং অন্যত্র, যেখনে তিনি যান নি, সেখানেও ক্রিয়াপদের কালরূপে নিত্যবৃত্ত বর্তমানের সুর লেগেছে। এটা আকস্মিক নয়। আর ক'টা বছর তিনি বেঁচে থাকলে, আমরা হয়তো দেখতাম গল্প উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অতীত একেবারেই বর্জন করেছেন।

আমার এই অনুমানের কারণ, চল্লিশ দশকেই বাঙলা গল্প উপন্যাস কিশোর এবং স্বল্পশিক্ষিত গৃহিনীদের পাঠ্যতালিকা ছাড়িয়ে সাবালকের মস্তিষ্কের দিকে যাত্রা শুরু করেছে; আর, এই আমাদের সময়ে যখন কাহিনী আর কোনো কথাই নয়, মনের ভেতরটাই হচ্ছে ক্ষেত্র, যখন মানুষ যাচ্ছে অনেক বেশি বর্জন আর গ্রহণের ভেতর দিয়ে, যখন মানুষ তার অস্তিত্বকে রাজনৈতিক এবং দার্শনিক দুই দিক থেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, তখন অনিবার্যভাবেই আমাদের এ অভিজ্ঞতা বহনের উপযোগী ভাষা এবং কাঠামোও তৈরি করে নিতে হচ্ছে বা নেয়া কর্তব্য। সেই কর্তব্যের একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক— ক্রিয়াপদের কালরূপ সম্পর্কে নতুন ভাবনা করা।

আমার মনে হয়, ঠিক এই ভাবনাটিই প্রয়াত কমলকুমার মজুমদারকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি মুখের ভাষার ভেতরে চিন্তা চেতনা ও অভিজ্ঞতার জটিলতা ধরে রাখবার উপায় হিসেবে মুখের ভাষাকেই বর্জন করে সাধু ভাষার আতিথ্য স্বীকার করেন। তা যদি তিনি না করতেন, যদি মুখের ভাষা থেকে সরে না আসতেন, আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছ থেকেই আমরা বাংলা ক্রিয়াপদের কালরূপের প্রতিভাময় ব্যবহার দেখতে পেতাম।

তবে এখানে এই কথাটিও বলে রাখবার যে, ক্রিয়াপদের কয়েকটি কালরূপের ভেতরে আমি যে নিত্যবৃত্তকেই আমার কলমে প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করে চলেছি, এটা আমার জন্যে সত্যি, অপর লেখকের জন্যে প্রস্তাবিত আদর্শ এটি নাও হতে পারে; না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সব লেখককেই তাঁর নিজের মতো করে পথ বেছে নিতে হয়।

আমাদের সময়ের দেশ মানুষ ও জীবনের বর্তমানের কথা বলেছি, বলেছি এই বর্তমানে আমাদের অভিজ্ঞতা গল্প-উপন্যাসে ধরিয়ে দেবার উপায় আমি দেখি ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্তটি রূপটিতেই; বলবার পরও থমকে দাঁড়াচ্ছি, কারণ, আমি জানি, সৃষ্টিশীলতার ভেতরে অনেকটাই আছে মাতৃগর্ভের অন্ধকার; সে অন্ধকারে ভ্রূণ কীভাবে বেড়ে উঠবে তা জানে শরীর— আর লেখকের লেখার বেলায় সে শরীরটি হচ্ছে তাঁরই কল্পনা-করোটি; আমি সেভাবেই ক্রিয়াপদের ওই রূপটিকে জেনেছি, সেভাবেই এখনকার আমার গল্প-লেখা আমার গড়ে উঠছে।

বাংলাভাষায় আছে ক্রিয়াপদের আরো তিনটি রূপ— ভবিষ্যতরূপ হিসেবে না এনেই। প্রতিভাবান লেখক ক্রিয়াপদের ভবিষ্যতরূপটিকেও যে কাজে লাগাতে পারেন অসামান্য বিভা সৃষ্টি করে, তার উদাহরণ প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছোটগল্প *তেলেনাপোতা আবিষ্কার*। এ গল্পে কালচেতনার এক নতুন মাত্রা আমরা আবিষ্কার করি। এ চেতনার মূলেই আছে ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপটি।

ক্রিয়াপদের কালরূপ নির্বাচন

ক্রিয়াপদের কালরূপ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ওটা গল্পের সুর বেঁধে দেয়; লেখক ঠিক কীভাবে কোন পথে গল্পের অভিজ্ঞতার ভেতরে আমাদের নিয়ে যেতে চান এবং গল্প-বিষয়টি থেকে কোন দূরত্বে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে চান, ক্রিয়াপদের কালরূপ দেখেই তা সনাক্ত করা যায়।

লেখক ভিন্ন ভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন কালরূপ ব্যবহার করতে পারেন, সেটা তিনি করবেন লেখাটির সঙ্গে পাঠকের যে-সৃষ্টিশীল দূরত্ব তিনি নির্ধারণ করেছেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে; আবার কোনো লেখক ক্রিয়াপদের একটি মাত্র কালরূপকেই তাঁর

সারাজীবনের জন্যে অবলম্বন করতে পারেন। যদি আমরা দেখি যে, কোনো লেখক গল্পের পর গল্পে ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ কালরূপই ব্যবহার করে চলেছেন তাহলে তা থেকে আমরা তাঁর বিশেষ একটি প্রবণতাই আবিষ্কার করে নিতে পারি, জীবন ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর একটি দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা সাধারণভাবে চিনি নিতে পারি।

ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপটাই লেখকদের হাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন— সে ঘরের ভেতর এলো। দেখলো ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় গেলো, সেখানেও কেউ নেই। তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। সে চুপ করে বিছানার ওপর বসে রইলো, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে লেখা এই অংশটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি লেখক চান 'সে' চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘরে ঢুকি, ঢুকে চরিত্রটির সঙ্গেই আবিষ্কার করি যে ঘর শূন্য, তারই পাশাপাশি হেঁটে আমরা বারান্দায় যাই এবং ফিরে এসে তারই মতো কারো জন্যে অপেক্ষা করি। অর্থাৎ, ঘটনাটি আমাদের খুব কাছে এবং চোখের ওপরই ঘটছে, এবং এক্ষুনি, এই মাত্র তা ঘটে গেলো।

কিন্তু এই অংশটুকুই যদি ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ ব্যবহার করে লেখা যায় তাহলে কী দাঁড়ায়? 'সে ঘরের ভেতরে যায়। দেখে ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় যায়, সেখানেও কেউ নেই। তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়। সে চুপ করে বিছানার ওপর বসে থাকে, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করে।' পড়বার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ যদি উচ্চারণ করে পড়ি, তাহলে দেখতে পাবো ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ অর্থাৎ 'যায়', 'দেখে' 'করে' আগেকার 'গেলো', 'দেখলো' 'রইলো' 'করলো' এগুলোর তুলনায় অনেকদূর পর্যন্ত ধাবিত হচ্ছে, এর ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস হাহা করছে, উচ্চারিত হয়েও যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে না, অনন্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর এরই ফলে আমরা আবিষ্কার করছি, চরিত্রটির শূন্যতা এবং এমনও আমাদের অনিবার্যভাবে মনে হচ্ছে যে, এ ঘটনা শুধু এখনই ঘটলো বা ঘটছে তা নয়, আগেও ঘটে গেছে, এখন ঘটছে এবং আগামীতেও ঘটতে পারে কিংবা ঘটবে।

তবে কি ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত রূপের শক্তি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপের চেয়ে কম? তাও তো নয়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের *স্বর্ণমৃগ* ছোটগল্পটি— সেই যে-গল্পে বৈদ্যনাথ নামে গরীব এক গ্রামবাসী স্ত্রীর তাড়নায় গুপ্তধনের আশায় কাশী পর্যন্ত গিয়েছিলো, তারপর প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছিলো; এর শেষ অংশটি পড়ে দেখা যাক; ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত ব্যবহার করে লেখা—

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দু'জনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম ছম করিতে লাগিল। এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত

পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড়ো ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, 'বাবা।' তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, 'বাবা।' কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না। আবার ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাত হইল না।

নিশ্চয়ই আমরা অনুভব করতে পেরেছি ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে লেখা এই অংশটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে, আমরাও যেন হতভাগ্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে নিঃশব্দে গ্রাম থেকে মাঝরাতে বিদায় নিলাম, আমরাও একটি ছোট, ব্যক্তিগত, কিন্তু ভয়াবহ রকমে সর্বগ্রাসী একটি অভিযোগ অনন্ত এবং উদাসীন পৃথিবীর কাছে রেখে গেলাম যে— পৃথিবীর কিছুই আসে যায় না এক বৈদ্যনাথের কী হলো না হলো, তাতে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর প্রধান লেখাগুলো লিখে গেছেন ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ ব্যবহার করে। তিনি যে ক্রিয়াপদের বিশেষ এই কালরূপটি— 'যায়', 'খায়', 'করে', 'দেখে'-র মতো অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা— বেছে নিয়েছেন তা আকস্মিক নয়; তিনি সর্বাংশে সচেতন শিল্পী। তাঁর উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* ধরা যাক। আমরা একটু মনোযোগী হলেই আবিষ্কার করি, এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটির নাম মুহম্মদ মুস্তফা, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের যে নাম সেই নাম; আরো যখন দেখি যে মুস্তাফার স্ত্রীর নাম খোদেজা, যে-নাম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের প্রথম স্ত্রীর নাম, তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত সচেতনভাবেই নদীর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে একটি প্রতীক রচনা করতে চেয়েছেন; আর সেই প্রতীকটিকে নির্দিষ্ট কোনো অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যতে না রেখে সর্বকালে তা ছড়িয়ে দেবার জন্যেই ক্রিয়াপদের এই কালরূপ তিনি বেছে নিয়েছেন— অন্য কালরূপ দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না; তা যে হতো না সেটা বোঝা যাবে এ বই থেকে যে-কোনো একটি অংশ পড়লে। যেমন এটুকুই পড়ি না কেন ?—

নিঃসন্দেহে কোথাও কে যেন কাঁদে— তা কি আর বিশ্বাস করা যায় ? অবিশ্বাসটি ধীরে ধীরে কমজোর হয়ে ওঠে, অবিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর সন্দেহের দোলায় দুর্বল হয়ে পড়ে, কেউ কেউ আবার তা নীরবেই সহ্য করতে শুরু করে, যেমন দুঃখ কষ্টে মতিভ্রষ্ট মানুষের যুক্তিহীন বিলাপ অসহ্য মনে হলেও অনেকে নীরবে সহ্য না করে পারে না। হয়তো তাদের মনে হয় রহস্যময় দুনিয়ার সবকিছু তারা জানে না। হয়তো সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে সব মানুষের মনে একটি আশা লুকিয়ে থাকে যে হঠাৎ একদিন

অলৌকিক কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে, সে-আশাটিই হঠাৎ জেগে ওঠে। কাল্পনিক খাদ্যে মানুষের যেমন পেট ভরে না, তেমন যা ধরতে পারে না ছুঁতে পারে না, চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হয় না— তাতে বিশ্বাস রেখেও মানুষের চিত্ত ভরে না। যে-কান্না এত মানুষ শুনতে পায় সে-কান্নার কথা সত্যি অবিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়; সে-কান্না সত্যের রূপই গ্রহণ করে— এমন একটি সত্য যা ব্যাখ্যা করা যায় না। অবিশ্বাস করা যায় না বলে ভয়টিও বাড়ে, মনের গভীর আশঙ্কাটি ঘনীভূত হয়। কে কাঁদে? মোক্তার মোছলেহ উদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে বিস্ময়কর কথাটি বলেছিলো তা সবাই যথাসময়ে শুনতে পেয়েছিল কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়, নদী কি করে কাঁদে?

একই লেখায় যখন ক্রিয়াপদের একাধিক কালরূপ

গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়াপদের কালরূপ নিয়ে আলোচনা করে যাবার কালে আমার ছোট্ট একটি আশঙ্কা ছিলো; সেটা এই যে, কেউ মনে করে বসতে পারেন আমি একটি গল্পে ক্রিয়াপদের একটিই মাত্র কালরূপ দেখতে চাই— মিশ্রণ ঘটলে তা দোষের হবে। আশঙ্কাটি সত্যি হয়েছে। একজন জানতে চেয়েছেন, একই লেখায় ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপ ব্যবহার করা কি সম্ভব? অথবা উচিত?

অবশ্যই সম্ভব এবং প্রয়োজনের ওপরেই এর ঔচিত্য নির্ভর করছে। এই প্রয়োজনটা যদি ঠিক মতো আমরা সনাক্ত করতে না পারি তাহলে লেখাটিই গন্তব্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

আসলে— ক্রিয়াপদের একটা মূল কাঠামো ঠিক করে নিতে হয়; কাহিনীটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কিংবা সাধারণ অতীত অথবা অন্য কোনো একটি কালরূপে বর্ণনা করবো, বক্তব্যের সুর, ভঙ্গি এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটি নির্ধারণ করাটাই হচ্ছে কাঠামোর কাজ; তারপর সেই কাঠামোর ভেতরে থেকে গল্পটি বলে যাবার জন্যে আমাকে অবশ্যই কখনো এগিয়ে যেতে হবে, কখনো পিছিয়ে আসতে হবে, কখনো বা দূরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে হবে ঘটনা প্রবাহ, আর এইসব মুহূর্তে মূল কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়েই আমাকে বেছে নিতে হবে একই লেখায় ক্রিয়াপদের অন্যতর কালরূপ।

দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের *কাবুলিওয়ালা* গল্পটি। এর মূল কাঠামো ক্রিয়াপদের সাধারণ কালরূপ। কিন্তু গল্পটি শুরু হয়েছে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ দিয়ে। যেমন—

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর

কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না।

কিছুদূর এগোবার পর দেখি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করছেন, এই একই গল্পে, ক্রিয়াপদের ঘটমান বর্তমান কালরূপ। যেমন—

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলা আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।

বেশিদূর যেতে হবে না, এই একই গল্পে এরপর আমরা দেখব ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত অতীত কালরূপটিকেও কাজে লাগানো হয়েছে।

রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, 'কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা তোমার ও ঝুলির ভিতর কি ?' রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, 'হাঁতি।'

লক্ষ করবার মতো, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন এই কালরূপগুলো ব্যবহার করা হয়েছে গল্পটির মূল কাঠামো সাধারণ অতীতেরই ভেতরে; আর এই মূল কাঠামো আমরা অচিরেই দেখতে পাই যখন আমরা পড়তে থাকি—

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই। তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, 'কিরে রহমত, কবে আসিলি ?

এবং মর্মস্পর্শী শেষ দু'টি অনুচ্ছেদ—

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলন-সুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।' এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গল্প উপন্যাস যাঁরা পড়েন তাঁদের কাছে ক্রিয়াপদের কালরূপ কতটা ধরা পড়ে— আমি অর্ধমনস্ক পাঠকদের কথা এখন ভাবছি— সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। কিন্তু লেখককে নিশ্চিত না হলে চলে না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা বলে, বক্তব্যের এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে ক্রিয়াপদের কালরূপ। কালরূপটি ঠিক লাগসই না হলে কথার ধার অনেকখানি ক্ষয়ে যায়— সাহিত্যের যে অপরপক্ষ, অর্থাৎ পাঠক, তাঁর মনে লেখক যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে চান সেই তরঙ্গের আকার এবং প্রকার দুইই

এতে করে অনভিপ্রেত রকমে ভিন্ন হয়ে যায়। আর তাই, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-র মূল কাঠামো সাধারণ অতীত বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান হলে *পদ্মানদীর মাঝি* বলতে যা বুঝি তা আর হতো না; এমন আরেকটি উদাহরণ দিই— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* হয়তো নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপের কাঠামোয় না লিখে সাধারণ অতীত ব্যবহার করে লেখা যেতো, কিন্তু আর সেই বাকাল নদীর মৃত্যু যে-কোনো মানুষের মৃত্যুর মতোই জীবনের সকল প্রদীপ নেভানো অন্ধকার ডেকে আনতে পারতো না।

লেখকের দক্ষতা বা মিস্তিরির নিপুণ হাত এখানেই যে, তিনি তাঁর মনোনীত কালরূপের কাঠামোর ভেতরে ভিন্নতর কালরূপ অনায়াসে নির্ধারণ করে নিতে পারেন; বাংলা ভাষার বহু লেখকই অনেক সময় এমনকি তাঁদের প্রধান রচনাতেও তা পারেন নি। নাম করে রোষ কুড়োতে চাই না। সচেতন পাঠক ও লেখক নিজেরাই বইয়ের পাতা উলটে এমন ব্যর্থতার নজির খুঁজে পাবেন। এই খোঁজাটাও আমাদের লেখা-শেখার একটি উপায় বৈকি!

গল্পের শরীরে সংলাপ

উনিশ শো উনসত্তরের দিকে সাপ্তাহিক *চিত্রালী*-র কোনো এক সংখ্যায় একটি ছোটগল্প লিখেছিলাম, লেখাটি এখন হারিয়ে গেছে, আর খুঁজে পাই নি; গল্পটির নাম ছিলো *সে* এবং এতে একটিও সংলাপ ছিলো না। তখন পর্যন্ত গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের কখন দরকার, কেন দরকার, কোথায় দরকার— এসব নিয়ে সচেতনভাবে কিছু ভাবতাম না, লেখার সময় কলমের টানের ওপরই ভরসা রাখতাম— কলমের টানে সংলাপ এলো তো এলো, না এলো তো নেই। এমনকি ওই গল্পটি লেখার সময়েও ঠিক করে লিখতে বসি নি যে এতে একটিও সংলাপ থাকবে না।

আমার গল্পটা ছিলো এক ধনবান ব্যবসায়ীকে নিয়ে; অভিজাত একটি এলাকায় সুন্দর একটি বাড়িতে সে থাকে; তার আছে চমৎকার একজন স্ত্রী আর দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এমন একটি ছেলে। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোনো একটি অসুখে সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে; শুয়ে শুয়ে সে তার চারদিকে সংসারের স্রোত বয়ে যেতে দেখে; এবং একদিন লক্ষ করে সে নিজেই কখন একটি আসবাবে পরিণত হয়ে গেছে; বাড়িতে সে আছে কি নেই এটা আর কারো কাছেই কোনো সংবাদ নয়। একদিন সে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে, তার পরিচিত সমস্ত কিছু ছেড়ে যখন চলে যায়, তখনো কেউ তার অনুপস্থিতি অনুভব

করতে পারে না। এই ছিলো গল্পের কথা। আমি শুরু করেছিলাম প্রধান চরিত্রটি যখন শয্যাগত তখন থেকে; গল্পটিকে দেখেছিলাম তাঁর চোখ থেকে; আমার এমন একটা ইচ্ছে ছিলো পাঠক ও প্রধান চরিত্রের ভেতরে কোনো দূরত্ব থাকবে না; যেহেতু চরিত্রটি নীরবে সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে, তাই কলমের টানে আর সংলাপ আসে নি; সমস্ত কিছু ঘটে গেছে অখণ্ড নীরবতার ভেতর দিয়ে, স্তবকের পর স্তবকে কেবলি বর্ণনায়।

গল্পটি ছাপা হয়ে যাবার কয়েক সপ্তাহ পর হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, এই আমার প্রথম একটি গল্প যাতে কোনো সংলাপ নেই। এবং সেই মুহূর্ত থেকেই, এখনো মনে করতে পারি, আমি প্রথম সচেতন হই গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার সম্পর্কে। তখন আমি নিজের পুরনো কিছু লেখা তো বটেই, যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদেরও কিছু লেখা আবার দ্রুত পড়ে ফেলি— সংলাপ ব্যবহারের প্রয়োজন ও কৌশল বুঝে দেখবার জন্যে। হতাশার সঙ্গে আবিষ্কার করি, আমার অধিকাংশ পুরনো লেখাতেই আমি বড় অবহেলার সঙ্গে, অমনোযোগীভাবে সংলাপের মতো গল্প বলার প্রধান একটি হাতিয়ারকে ব্যবহার করেছি। বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি, বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সেই সংলাপ— *পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?*— সাধুভাষার দূরত্ব সত্ত্বেও কেন আমাদের কানে সদ্য শোনা জীবন্ত উচ্চারণের মতো অবিরাম ধ্বনিত হতে থাকে; আর কেনইবা রবীন্দ্রনাথের *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পে মেহের পাগলার *তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়* এই দুর্বোধ্য এবং বিশাল এবং প্রতিরোধহীন জীবনের প্রতি ছুড়ে দেয়া একটি ব্যর্থ কিন্তু রক্তাক্ত মন্তব্যের মতো আমাদের কাছে মনে হয়।

অনিবার্যভাবে গল্প-উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার তখন আমার মনোযোগ দখল করে বসে। আমার মনে পড়ে, আবছা মনে পড়ছে, কার যেন গল্পে চরিত্রের মুখে একটি সংলাপের পাশে ব্র্যাকেটে আর একটি করে সংলাপ লেখা ছিলো। লেখকের অভিপ্রায় ছিলো, চরিত্রটির যে সংলাপ ব্র্যাকেটের বাইরে তা উচ্চারিত, আর ব্র্যাকেটের ভেতরে যে সংলাপ তা সেই মুহূর্তে তার মনের অনুচ্চারিত কথা। বানানো উদাহরণ এইরকম দেয়া যেতে পারে— ধরা যাক— আমি চাইছি সে চলে যাক কিন্তু সামাজিকতার খাতিরে তাকে বসতে বলছি— 'কী খবর কতদিন পরে দেখা। (কেন এসেছ ? আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।)' লোকটি হয়তো এসেছে আমাকে ধার পরিশোধের তাগাদা দিতে, তাই বলছে— সামাজিকতায় সেও কম যায় না— 'এই এলাম, অনেকদিন তো দেখা হয় না। (আমার টাকাটা এখনো ফেরত পাই নি!)'

আমার মনে পড়ে যায়, ওই গল্পটি পড়বার পর আমি কিছুদিন একটি বীজ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম। ভেবেছিলাম এমন একটি গল্প লেখা কি সম্ভব নয় যার বেশির ভাগ জুড়ে থাকবে সংলাপ ?— আর সেই সংলাপও সরল হবে না; প্রতিটি সংলাপের ব্র্যাকেটে থাকবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বক্তব্যের সংলাপ। এমনও তখন ভেবেছিলাম,

একটি গল্প হয়তো এভাবে লেখা সম্ভব— ব্র্যাকেটের বাইরে অর্থাৎ উচ্চারিত সংলাপগুলো পড়ে একটি গল্প জানতে পারবো, আর শুধু ব্র্যাকেটের ভেতরে অর্থাৎ অনুচ্চারিত সংলাপগুলো পড়ে গেলে ভিন্ন একটি গল্প পাবো!— এবং এখানেই শেষ নয়; ব্র্যাকেটের ভেতর-বাইরে দুই ভিন্ন সংলাপ একই সঙ্গে পড়ে পড়ে গেলে পাবো তৃতীয় একটি গল্প!

এ ধরনের গল্প লেখা সম্ভব কিনা জানি না, এটুকু জানি মানুষ যা কল্পনা করে তার বাস্তব রূপ অবশ্যই সম্ভব— বর্তমানে না হোক ভবিষ্যতে কখনো; এবং এরকম একটি গল্প লিখে ফেলতে পারলে আর কিছু না হোক সংলাপের মতো জরুরি একটি বিষয়ে আমার ধারণা আরো আগেই স্পষ্ট হয়ে যেতে পারতো। বলাবাহুল্য, আমার অনেক ইচ্ছার মতোই এই বিশেষ গল্পটি লিখে ফেলার ইচ্ছাও বহু কাপ কফির তলায় আশাহীনভাবে একসময় ডুবে যায়।

আবার একবার ভেবেছিলাম, এমন একটি গল্প লিখবো যেখানে কোন্ সংলাপ কে বলছে সেটা জানা জরুরি নয়, সংলাপের বক্তব্যটুকুই গল্পের জন্যে আসল, অতএব সংলাপের আগে-পরে বক্তার কোনো নির্দেশ থাকবে না। এই পরীক্ষাটি বাস্তবেই করেছিলাম *জেসমিন রোড* নামে আমার এক উপন্যাসে। সিকান্দার আবু জাফর তখন বেঁচে ছিলেন, তাঁর কাছে পরীক্ষাটির কথা বলবার পর তিনি *সমকাল*-এ প্রকাশের জন্যে আমন্ত্রণ জানান; এবং পরের মাস থেকেই ওই মাসিকপত্রে *জেসমিন রোড* প্রকাশিত হতে থাকে; কিন্তু মাত্র দুই কি তিন সংখ্যা লেখার পর অনুভব করি সংলাপ নিয়ে এভাবে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। লেখা বন্ধ করে দিই; জাফরভাইয়ের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও যখন আর পরের কিস্তি দাখিল করি না, তখন *সমকাল*-এর পাতায় লেখক হিসেবে আমার মৃত্যুর যে ঘোষণা তিনি কালো বর্ডার দিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা পুরনো পাঠক এখনো কারো কারো হয়তো মনে আছে।

বছর দশেক পরে সেই *জেসমিন রোড* আবার আমি নতুন করে লিখতে বসি *দুঃসহবাস* নামে। এবার সংলাপ নিয়ে ওই পরীক্ষাটি আর করি না। সংলাপ কে বলছে কে বলছে না বলছে তার পতাকা বিশ্বস্তভাবেই পুঁতে দিয়ে যাই *দুঃসহবাস*-এ। তবে, এখনো আমার ইচ্ছে আছে, ভবিষ্যতে অন্তত একটি গল্প লিখবো যেখানে সংলাপ কে বলছে তার কোনো নির্দেশ থাকবে না। আমার মনে হয়, এখনকার বাংলাদেশে অভিজ্ঞতার এমন একটা পর্যায়ে আমরা আছি যখন বক্তার চেয়ে বক্তব্যই একজন ঔপন্যাসিকের কাছে বেশি ব্যবহারযোগ্য মনে হতে পারে; কারণ, আমরা কি দেখি নি, আমরা কি দেখছি না— আমাদের মাথার ওপরে এবং আমাদের চোখের সমান্তরালে এমন মানুষের সংখ্যাই বাড়ছে যারা নিতান্তই সংখ্যাবাচক; নাম ভিন্ন হলেও উক্তি, পোশাক এবং কৌশল তাঁদের অবিকল এক।

সংলাপ সতর্কতা

নাটক তো সংলাপ ছাড়া নয়; গল্প উপন্যাসও কি তাই ? আমার মনে হয়, আমরা ধরেই নিয়েছি মানুষ যেমন সমাজে বাস করলে গায়ে পিরান দেবে, কিছু না জুটুক এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া তাকে পরতেই হবে, তেমনি গল্প লিখতে বসে চরিত্রের মুখে কিছু না হোক দু'টো সংলাপ দিতেই হবে লেখককে, এ নিয়ে যেন প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই।

আর আমার সন্দেহ, চারদিকের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস পড়ে আমার সন্দেহ হয়, লেখকেরাও সংলাপ নিয়ে, সংলাপ থাকবে কি থাকবে না, থাকলে কতটুকু থাকবে, গল্পের ঠিক কোন অংশটুকু সংলাপে দেয়া দরকার এ নিয়ে সচেতনভাবে তেমন একটা ভাবেন না। সংলাপ যেন কলমের টানেই চলে আসবে; যেন লেখকের দায় গল্প ভাবা, কলমের দায় সংলাপ লেখা। বাংলা ভাষায় লেখা, কি বাংলাদেশে কি পশ্চিমবঙ্গে, অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেই দেখি লেখকের সংলাপ ব্যবহার করা মুহূর্তের অপরীক্ষিত প্রেরণায়— হয়তো বর্ণনার একঘেঁয়েমি দূর করবার জন্যে, অথবা, এমন কঠিন সন্দেহ করাও অমূলক হবে না যে, লেখক সংলাপ দিচ্ছেন লেখাটির দৈর্ঘ্য নিছক বাড়াবার জন্যে।

অথচ, আমরা এই বাংলা ভাষারই শ্রেষ্ঠ একজন গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ লক্ষ না করে পারি না। তিনি তাঁর *একরাত্রি* গল্পটিতে একটিও সংলাপ লেখেন নি; আবার *ছুটি* গল্পের কেবল শুরু ও শেষভাগে সংলাপ লিখেছেন; *অতিথি* গল্পে যেন পরিষ্কার রাতে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সংলাপ ছিটিয়ে দিয়েছেন কাহিনীর চৌদ্দ আনা জুড়ে, তারপর হঠাৎ যেমন একখণ্ড কালো মেঘ দিগন্তের এক কোণ ছেয়ে ফেলে তেমনি তিনিও এ গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন বর্ণনা দিয়ে এবং সে বর্ণনার বাক্যগুলো দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ, জটিল এবং তামস করতালিপূর্ণ। আমরা আরো না লক্ষ করে পারি না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের গল্পগুলোতে কমিয়ে আনছেন বর্ণনা, সংলাপের ভাগ বাড়িয়ে দিচ্ছেন; এবং তাঁর পক্ষে শুধু সংলাপ অবলম্বন করেই *শেষের রাত্রি* লেখা সম্ভব হচ্ছে; কেবল তাই নয়, তিনি গল্পগুচ্ছেই *কর্মফল*-এর মতো রচনা গ্রন্থিত করতে ইতস্তত করেন নি, যে-গল্প ষোলো আনাই সংলাপ নির্ভর, নাটকের মতো অভিনয়ও এর সম্ভব, কিন্তু এ নাটক নয়, গল্পই— কিংবা এখনকার তরুণেরা একে মিনি-চিত্রনাট্য বলতেও লুব্ধ হবেন; রবীন্দ্রনাথ *কর্মফল*-কে ছোট গল্পই বলেছেন, অন্তত তাঁর গদ্য নাটকের তালিকায় এই লেখাটিকে তিনি জায়গা দেন নি।

আর কাউকে না হোক রবীন্দ্রনাথকে সমুখে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো সংলাপ একটি গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমাদের কল্পনার ভেতরে গল্পটিকে প্রবিষ্ট করাতে কীভাবে সাহায্য করে। অথবা, হাতের কাছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* থাকলে, শুধু এই একটি বইই আরো একবার সতর্কভাবে পড়লে,

আমরা অনুভব করতে পারবো তিনি, মানিক, কতখানি প্রতিভা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে।

বহুদিন থেকেই আমার মনে হয়েছে, আমাদের লেখকেরা সংলাপের বিষয়ে সবচেয়ে উদাসীন; তাঁরা যেন ধরেই নেন, গল্পে বা উপন্যাসে যখন যেখানে দরকার কলমই এনে দেবে সংলাপ— এ নিয়ে আগে থেকে ভেবে রাখবার দরকার নেই। সে কারণেই বোধহয় দেখি, যেখানে সংলাপ দরকার নেই, যেখানে সংলাপ নতুন কোনো তথ্য আমাদের দিচ্ছে না, নতুন কোণ থেকে আলো ফেলছে না, সেখানে পাচ্ছি বন্যার মতো সংলাপ! আর ঠিক যে জায়গাটিতে প্রয়োজন ছিলো সংলাপের, লেখক সেখানে বর্ণনার কাঁধে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন!

বাংলা ভাষায় গত বিশ-তিরিশ বছরে যত গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার ভেতর থেকে আপনি চাইলে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে পারেন না পথে হঠাৎ দেখা হবার পর সংলাপ ?— চা খাবার আমন্ত্রণ ?— কুশল জিজ্ঞাসা ? এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায় যাবার আগে অন্তবর্তী কালটুকু হরণের জন্যে যাবতীয় কথাবার্তা ?— তরুণ-তরুণী বা দম্পতির রাগ অথবা বিরাগের বিরামহীন উচ্চারণ ?

আমার ধারণা— সম্ভব, খুবই সম্ভব; এবং আমরা দেখবো এই জাতীয় লক্ষ্যহীন সংলাপ আমাদের লেখা কতখানি জুড়ে আছে। বস্তুতপক্ষে এমন লেখার সন্ধান পাওয়া কঠিনও হবে না, যেখানে অর্থহীন, কারণহীন, পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধির সংলাপই লেখা হয়েছে ক্লান্তিহীন কলমে।

মনে পড়ছে, আমাদের অগ্রজ লেখক-সম্পাদক প্রয়াত ফজলে লোহানীর কথা; আমরা তাঁকে প্রতিভাবান টিভি উপস্থাপক হিসেবে মনে রাখলেও পঞ্চাশের দশকে তিনি *অগত্যা*-র মতো একটি ব্যঙ্গনিপুণ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে পাকিস্তান, মুসলিম লীগ আর পাকিস্তানের দালালদের যে ন্যাংটো করে ছেড়েছিলেন, বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে যে বিরতিহীন উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, সে-কথা আমরা ভুলে গেছি। তিনি গল্প কবিতাও লিখতেন— স্বনামে ও ছদ্মনামে; তাঁর অনেকগুলো ছদ্মনামের ভেতরে দু'টি এখন মনে পড়ছে— *অগত্যা*-র পাতায় অনেক গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসেবে পাওয়া যাবে— আবদুল্লাহ জয়নুল আবেদিন আর মনসুর মুসা। সেই তিনি তাঁর এক গল্পে এক তরুণ এবং তাঁর প্রেমিককে নিরালায় বসিয়ে এইরকম এক সংলাপ-শ্রেণী রচনা করেছিলেন— মেয়েটি, মিলি, কথা বলতে চাইছে না— ছেলেটি তাকে দিয়ে কথা বলাবেই— স্মৃতি থেকে থেকে উদ্ধৃত করছি—

—মিলিয়া–মিলিয়া।

মিলি চুপ।

—মিলি–মিলি।

মিলি এখনো চুপ।

—মিলি।

মিলির সাড়া নেই।

—মি-মি-মি।

সাড়া নেই।

—মি ই ই ই ই।

এরপর লোহানি যে সংলাপটি মিলির মুখে বলিয়েছিলেন সেটি কম্পোজ করাবার জন্যে তাঁকে ছাপাখানায় কম্পোজিটরের পাশে বসতে হয়েছিলো। ছেলেটির একনাগাড়ে ডাক শুনে শুনে মিলি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলো— ঁ —ওপরে চন্দ্রবিন্দু, নিচে হ্রস্ব উ— অর্থাৎ প্রায় শোনা যায় না এমন একটি অনুনাসিক উচ্চারণ!

লোহানী আমাকে বলেছিলেন, 'উপন্যাস লম্বা করবার জন্যেই ওরকম সংলাপ-শ্রেণী আমি রচনা লিখেছিলাম, আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো না।' এ থেকেই বোঝা যাবে, লেখার দৈর্ঘ বাড়বার জন্যে একজন লেখক কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন।

আসলে, গল্প আমরা লিখি বাহ্যিক দুটি উপাদান হাতে নিয়ে; বর্ণনা— বাইরের এবং করোটির ভেতরের, এবং— সংলাপ। এই উপাদানগুলো ঠিক মাত্রায় মেশাতে না পারলে গল্প কখনোই সম্ভবে না, পৌঁছুবেও না। এই উপাদান দু'টির পরিমাণ ও মাত্রা ঠিক করবার একটিই উপায়— গল্পের ব্যক্তিত্বটি বুঝে নেয়া। হ্যাঁ, মানুষের মতো প্রতিটি গল্পেরও ব্যক্তিত্ব আছে; রবীন্দ্রনাথের প্রায় সংলাপবিহীন *ক্ষুধিত পাষাণ*-এর পাশে পুরোপুরি সংলাপনির্ভর *শেষের রাত্রি* গল্পটি মিলিয়ে দেখলেই আমাদের বুঝে নিতে দেরি হবে না যে, একেকটি গল্পের ব্যক্তিত্ব কীভাবে একজন লেখককে বলে দেয় 'বর্ণনা ও সংলাপ' এই দু'য়ের পরিমাণটি ঠিক কেমন হবে।

বর্ণনা থেকে সংলাপকে আলাদা করা

আমরা গল্প উপন্যাস যখন পড়ি তখন আমরা বর্ণনার ভেতরে সংলাপের অবস্থানগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে চাই। এই বোঝানোর দায়টা লেখকেরই। কাজটা সারবার বেশ কয়েকটি কৌশল আছে। মূলে তারা একই বটে, ডালপালায় ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুন্ডলা* উপন্যাস থেকে অণুগল্পের স্বাদ-লাগা একটি অংশ উদ্ধৃত করে কৌশলের ব্যাপারটা দেখি না কেন?— নবকুমারের সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাত হলো পান্থনিবাসে।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে, তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন,

"আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটিও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটিও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিনী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন— আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি কে কোন্ সংলাপটি বলছে। বুঝতে পারছি প্রত্যেকটি সংলাপের আগে পরে দুটি করে " উর্ধ্বকমার স্থাপন দেখে। সংলাপের এটাই অনেক পুরনো একটি নিয়ম— সংলাপ থাকবে উর্ধ্বকমার ভেতরে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে, তাঁর পরেও অনেক লেখকের, এবং এখনো কারো কারো কলমে, দুটি উর্ধ্বকমার ব্যবহার থাকলেও, ক্রমে তা একটিতে এসে দাঁড়িয়েছে— '—। যেমন ওপরের একটি অংশ এরকম হতে পারতো :

'মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন— আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?'

নবকুমার কহিলেন, 'আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।'

আবার, এরকমও লেখা হতে পারে সংলাপ— উর্ধ্বকমা ছাড়াই :

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?

এবং আমাদের কোনো অসুবিধেই হতো না কোন্‌টি বর্ণনা আর কোন্‌টি সংলাপ নির্ণয় করতে।

আর একটি জিনিশ লক্ষ করি ওপরের এই অংশে— অপরিচিতা হেসে যে কথাটি বলেছেন, *আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?* বঙ্কিমচন্দ্র এই সংলাপটি দিয়েছেন বর্ণনা-বাক্যের পরের লাইনে। না দিলেও চলতো। এখনো অনেক লেখক এ রকম লেখেন— বর্ণনা-বাক্যের পরের লাইনে সংলাপ লেখেন; আমি মনে করি, এটা বোধহয় তাঁরা করেন রচনার লাইন বাড়াবার জন্যে, বইয়ের পাতা বাড়াবার জন্যে। বঙ্কিমচন্দ্র, আমার মনে হয়, সে উদ্দেশ্যে পরের লাইনে এ সংলাপ লেখেন নি, এমন লিখলে তিনি সব সংলাপই বর্ণনা-বাক্যের পরের লাইনে লিখতেন। আমি মনে করি, এই বিশেষ সংলাপটি— *আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?*— এর ওপর বিশেষ একটা জোর দেবার জন্যে, ভাবের দিক থেকে কথাটা যে চমকপ্রদ ও আলাদা, এটা দেখাবার জন্যেই পরের লাইনে একে স্থাপন করেছেন।

সংলাপ বোঝাতে কেবল উর্ধ্বকমাই নয় ড্যাশ-এরও ব্যবহার অনেকে করেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অংশকে উর্ধ্বকমা বাদ দিয়ে ড্যাশ সহযোগে লিখে দেখাই :

উত্তরকারিণী কহিলেন, তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিনী?

—কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

—বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

—আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

চরিত্রের নাম উল্লেখ না করে ড্যাশ দিয়ে সংলাপ শুরু করার কৌশল এখনো অনেকেই ব্যবহার করেন। একসময় দেখেছি, বিশেষ করে আমি যখন লেখা শুরু করি তখন, এবং আমি নিজেও এ কৌশলটি প্রথম কিছুকাল ব্যবহার করেছি— বক্তার চিহ্নহীন সংলাপ ডবল ফুটকি দিয়ে শুরু করা।

: কেন ? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ ?

: বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

: আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয় ?

এ রীতি এখন একেবারে উঠেই গেছে বলে দেখতে পাই।

মুশকিল হয় একটা ক্ষেত্রে এসে— যেখানে একই বক্তার সংলাপের মধ্যে তার কিছু বর্ণনা দেবারও দরকার হয়। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্যটি : *যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী।"*— তিনি যদি মনে করতেন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করার বর্ণনাটি আনবেন *অভাগিনী বাঙ্গালী নহে*-র পরে, অতঃপর উচ্চারণ করাবেন *পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী* তাহলে কীভাবে লিখতেন ? দেখা যাক :

"অভাগিনী বাঙ্গালী নহে", যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী।" এভাবেই কি ? অথবা এভাবে— অভাগিনী বাঙ্গালী নহে, যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি কহিলেন, পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী।

এখনকার চোখে পরিচ্ছন্ন দেখাবে দ্বিতীয়টি, এতে সন্দেহ নেই। এবং এটাই এখনকার লেখকদের কলমে আমরা পাই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, টানা সংলাপের মাঝখানে কমা দিয়ে বর্ণনা লিখেও পার পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন, মন থেকে বানিয়ে এবার একটা অংশ দেখাই :

তখন বন্ধুটি হেসে উঠে, আরে তোমার বোন রাজি, বলেই তার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, তুমি এখনি যেয়ো না। এই অংশে সংলাপের ওই প্রথম কমাটি যদি ছাপার কোনো কারণে বাদ পড়ে যায় তাহলে কী হয় ? *তখন বন্ধুটি হেসে উঠে, আরে তোর বোন রাজি বলেই তার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, তুমি একটু দাঁড়াও তো!* বোঝাই দুষ্কর হাত ধরে টান দিলো সংলাপের বক্তা, না তার বোন, আর দাঁড়াতেই বা বললো কে কাকে ? বন্ধুটি বললো সংলাপের উদ্দিষ্টকে ? না, বোন বললো তাকে যার কথায় সে রাজি!

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে উদ্ধৃত অংশটুকু প্রথম পড়বার সময়েই আমাদের নজর হয়তো এড়ায় নি যে, একটা পর্যায়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্র সংলাপের আগে নাম ব্যবহার করেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে :

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিনী ?"

নব। কেন ? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয় ?

বর্ণনা-বাক্যের যখন আর প্রয়োজন নেই, শুধু সংলাপই যখন মুখ্য, সংলাপের সেই অক্ষুণ্ন ধারার ভেতরে বক্তা যেন হারিয়ে না যায়, পাঠক যেন গোলমালে না পড়ে, তখনই দরকার পড়ে এ কৌশলের। কিম্বা পড়তো— একদা সে দরকারটা পড়তো— রবীন্দ্রনাথও তাঁর কোনো কোনো রচনায় এ দরকার বোধ করেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের ছাপা পৃষ্ঠায় আর কখনোই নয়।

সংলাপের ধারা বর্ণনা-বাক্য বিনা দীর্ঘ হলে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারে; পাঠকের ধন্দ লাগতে পারে কে কোন্ কথাটা বলছে। অনেক উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমার নিজেরই এরকম হয়। আমি পিছিয়ে গিয়ে আঙুলে টিপ দিয়ে দিয়ে সনাক্ত করি কোন্ সংলাপটি কার। এই ধন্দ থেকে পাঠককে রেহাই দেবার জন্যে সব লেখকই একটা কৌশল করেন। দু'তিনটি সংলাপের পরই, যখন মনে হয় পাঠক খেই হারিয়ে ফেলছে, লেখক তখন সংলাপের আগে অনাবশ্যক কিন্তু আবশ্যক বাক্য বসান— *তখন অমুক বললো— তার উত্তরে সে বললো—* কিম্বা, কৌশলটা গোপন করবার জন্যে এরকম বাক্যও লেখেন— *সে হেসে বললো— তার উত্তরে মুখ ভার করে সে বললো—* বা, *সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললো— চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললো— উদাস গলায় বললো* ইত্যাদি ও ইত্যাদি। আমরা একটু সতর্ক হয়ে পড়ে দেখলেই আবিষ্কার করবো ওই হেসে বলা, উত্তরে বলা, সিগারেটে টান দিয়ে বলা, উদাস গলায় বলা— গল্পের যাত্রায় এরা মোটেই জরুরি ছিলো না।

সংলাপ লিখতে এখন আমি বেশ কিছুদিন থেকে উর্ধ্বকমা ব্যবহার করি না; বক্তার চিহ্নহীন সংলাপের আগে ড্যাশ বা ফুটকিও ব্যবহার করি না। চারদিকের আর সকলের লেখা পড়ে দেখি, সংলাপ আর বর্ণনা আলাদা করবার কৌশল কোনো একটিতে কারো কিছু স্থির নয়। আর তারপরেও আছেন প্রকাশকেরা; তাঁরা অনেকেই আজকাল দেখি, লেখক লিখলেও, উর্ধ্বকমা বাদ দিয়ে দেন, ড্যাশ কেটে দেন, লেখা ছাপতে গিয়ে। আমি মনে করি, অর্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে সংলাপ-চিহ্ন যত বাদ দেয়া যায় ততই আরাম পায় চোখ, ছাপা পৃষ্ঠাও নন্দনযোগ্য হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে ছবি তৈরি

আমরা যখন গল্প-উপন্যাস পড়ি তখন কী হয় ? একটা ছবি তৈরি হতে থাকে আমাদের মনের ভেতরে। গল্পের জায়গাটা আমরা কল্পনায় দেখে উঠি, চরিত্রগুলোও যেন আবছা একটা চেহারা নিয়েই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। অন্তত এরকমটাই হওয়া উচিত। গল্প পড়তে পড়তে যিনি ছবি না দেখে ওঠেন, মুখ না অনুভব করেন— বুঝতে হবে, গলদ একটা আছে কোথাও। আমি এর জন্যে পাঠককে দায়ী করবার বদলে লেখককেই করবো। বলবো, লেখকই পাঠাতে পারেন নি সংকেত।

সংকেত ? লেখায় একজন লেখক তো এটাই করেন। আমি তো এরকম বুঝি যে, লেখায় আমরা কখনোই সবটা পুরোপুরি বলতে পারি না— সেটা অসম্ভব প্রস্তাব; আমরা কেবল যা পারি, তা হচ্ছে লেখার ভেতর দিয়ে সংকেতের পর সংকেত তৈরি করতে পারি। এবং তা পাঠকের কাছে পাঠাই। পড়তে পড়তে একের পর এক সেইসব সংকেত পেয়ে পাঠকের মন সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে— তার কল্পনা উত্তেজিত হতে থাকে, সে ছবি তৈরি করতে থাকে, কানে যেন সংলাপও সে শুনতে পায়। এই কাজটা যখন খুব ভালোভাবে হয়ে যায়, তখনি গল্প উপন্যাসের চরিত্র আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে যায়— ঠিক যেমন নিজেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা জানা শোনা মানুষেরা হয়। যদি আমাদের দেখা বা প্রত্যাশার সঙ্গে মিলে যায় গল্পটা, তাহলে তৃপ্তি পাই; যদি নতুন কিছুর সাক্ষাত পাই তবে বিস্ময় নিয়ে বলে উঠি, আহ্ এরকম তো হয় ও হতে পারে; বলি, আমি নতুন কিছু পেলাম; বলি, আমার অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত হলো।

এই সংকেতের ব্যাপারটা আরো একটু গোড়া থেকে বলা যাক। প্রথমেই দেখা যাক প্রতিদিনের জীবনে আমাদের কথা বলাটা। এই কথা বলার সময় কী ঘটে ? স্তরগুলো নির্ণয় করি। বক্তার মনে একটা ভাব আসে, সেই ভাবটি শব্দ অবলম্বন করে, সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করেন বক্তা। শ্রোতা সেই শব্দগুলো শোনেন, শব্দগুলো থেকে তিনি বক্তার ভাবটি আঁচ করেন। হ্যাঁ, আঁচ! পুরোটা নয়। পুরোটা তৈরি করে নেন শ্রোতা এবং মজার কথা হচ্ছে শ্রোতার তৈরি করে নেয়া ভাবের ওই পুরো শরীরটা বক্তার মনের ভাবটির শরীরের হুবহু নাও হতে পারে। বক্তা যেমন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাব ও শব্দ পান, শ্রোতাও তেমনি সেই ভাব ও শব্দসকল নিজের অভিজ্ঞতা বা জানা-বোঝা থেকে তৈরি করে নেন। দুটো যে একই হবে, হতেই হবে, এমন কোনো কথাই নেই। কখনো তা হয়ও না।

একটা সাধারণ উদাহরণ দিই। দোকানে গিয়ে বললাম, আমি একটা ভালো চায়ের পেয়ালা খুঁজছি। দোকানি তখন চায়ের একটা পেয়ালা তুলে আমার হাতে দিলেন। ব্যাপারটা কি এতই সহজে মিটে গেলো ? না। আমি যখন চায়ের পেয়ালার কথা বললাম, বললাম ভালো পেয়ালা— তখন আমার মনের মধ্যে ভালোর একটা ধারণা তো ছিলোই, দোকানি যখন একটি চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন তো এটা চলবে কিনা, তখন সে তার— তারই ধারণায় যেটি ভালো সেটিই সে দেখালো। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখবেন, অধিকাংশক্ষেত্রেই ক্রেতা ও বিক্রেতার 'ভালো' একরকমের হয় না। যদি বলতাম চিনেমাটির ভালো পেয়ালা, তাহলে আরো খানিকটা নির্দিষ্ট হতো; যদি বলতাম চিনেমাটির নীল রঙের ফুলআঁকা ভালো পেয়ালা, তাহলে আরো অনেকটাই কাছাকাছি হবার আশা করা যেতো— বাস্তবে দেখবো, তবু কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার ভাব-কল্পনা মিলছে না। ক্রেতা বাছাবাছি করেই চলেছেন। দোকানিও একের পর এক দেখিয়েই চলেছে এবং প্রশ্নচোখে আপনার দিকে বারবার তাকাচ্ছে— অর্থাৎ বুঝতে চাইছে আপনার মনে ঠিক কোন্ পেয়ালার ছবিটি আছে।

লেখার বেলাতেও এটা হয়। আমি একটা উদাহরণ প্রায়ই দিই। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালি* উপন্যাস। গ্রাম আছে, অপু আছে, দুর্গা আছে; মনে পড়বে অপুদের গ্রাম সীমান্তে রেললাইন, ট্রেনের হুইসিল। এখন একবার ভেবে দেখুন বিভূতিভূষণ যে-গ্রাম যে-অপু যে-মানুষ যে-রেললাইন তাঁর উপন্যাসে এনেছিলেন সে সকলই তিনি যে রকমটি দেখেছিলেন আমরা যখন উপন্যাসটি পড়ি আমারও কি অবিকল সে সবই দেখি না দেখতে পাই ? আমরা বরং দেখি আমাদেরই দেখা গ্রাম, আমাদেরই কল্পনায় গড়া অপু, আমাদেরই কল্পনার দুর্গা, আমাদেরই চোখে দেখা রেললাইন, ট্রেন, কানে শোনা হুইসিল। আমরা যে এ সকল আমাদেরই কল্পনা ও অভিজ্ঞতার জমিন থেকে উদ্ধার করে দেখে উঠি— কেন উঠি ? কেন ওই চরিত্রগুলো, জায়গাগুলো আমাদের কাছে এত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ? ওঠে, কারণ, বিভূতিভূষণ বড় নিপুণভাবে সংকেতের পর সংকেত পাঠাতে পেরেছেন বলেই।

কারো গল্প-উপন্যাস পড়ে যদি আমরা এমত প্রত্যক্ষ করে আমাদের কল্পনায় দেখে না উঠি, তবে দায়টা লেখকেরই এ কারণে যে সংকেত তিনি যথেষ্ট সমর্থ করে পাঠাতে পারেন নি।

বিষয়ের চেয়ে গদ্যকে বড় করে দেখা

তাঁর গল্প বা উপন্যাস নিয়ে কথা উঠলেই— সমসাময়িক একজন লেখকের কথা আমি এখন মনে করছি— তাঁর গদ্যের প্রশংসা অকুণ্ঠ সকলে করে থাকেন। বছরের পর বছর, আড্ডা থেকে আড্ডায়, ভোজসভা থেকে ভোজসভায় ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনির মতো অনিবার্য এই উচ্চারণ আমি শুনে আসছি— 'তাঁর গদ্যটি চমৎকার'। প্রতিবার আমি আশা করেছি তাঁর লেখা সম্পর্কে কোনো মত কোনো মন্তব্য এবার হয়তো পাবো, প্রতিবারই আমি হতাশ হয়েছি; তাঁর গদ্য এবং একমাত্র গদ্যেরই প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই আমার কানে পশে নি; যেন এই লেখক কখনোই কোনো গল্প লেখেন নি কিংবা উপন্যাস; যেন তাঁর হাতে তৈরি হয় নি কোনো স্মরণীয় চরিত্র, উদ্‌ঘাটিত হয় নি মানুষের কোনো উত্তাপ অথবা শৈত্য।

আমি এখন প্রয়াত এক নাট্যকারের কথাও মনে করছি যাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা বিস্ময় এবং ঈর্ষার অনুভব ছাড়া স্মরণ করতে আমরা অক্ষম। আমরা স্মরণ করি, উল্লেখ করি এবং আর কখনো দেখতে পাবো না বলে আক্ষেপ করি— তাঁর উপস্থিত বাক্য গঠনের চাতুর্য, শব্দ-সংগ্রহের ক্ষিপ্রতা, স্বরপ্রক্ষেপের চারু নাটকীয়তা। কিন্তু একবারও কি দৃষ্টিপাত করি তাঁর বক্তব্যের দিকে ?

গদ্য তো এমন কোনো কুসুম নয় আকাশে যার চাষ! গদ্য কিংবা পদ্য, বস্তুত ভাষা ব্যবহার— সাহিত্যে বা সংসারে, কৃষিকাজের অবিকল একটি উদ্যোগ; ধান, সরষে কিংবা গোলাপের মতোই বিশেষভাবে নির্বাচিত, অর্জিত, কর্ষিত একটি ভূমিখণ্ডে তার বপন ও ফলন।

তাহলে ? তাহলে আমরা যখন বলি 'তাঁর গদ্যটি চমৎকার' এবং তাঁর বিষয়, প্রস্তাব, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলবার মতো কিছুই আর খুঁজে পাই না, তখন কি এমন এক অট্টালিকার সমুখে আমরা দাঁড়িয়ে নই যার পলেস্তারা আছে দেয়াল নেই, কার্নিশ আছে ছাদ নেই ? এমনটা কি হতে পারে আসলে ওই লেখকেরই নতুন কিছু বলবার নেই; আমরা বন্ধু বা সহৃদয় বলেই তাঁর এ অভাবের দিক গোপন করে যতটুকু তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ তাঁর গদ্য, তারই উল্লেখ ক্লান্তিহীন করে চলেছি ? সত্য যদি এই হয়, তাহলে আরো সত্য— সময় কিন্তু আমাদের মতো সহৃদয় নয়।

আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করি তখন কি প্রথমেই বলি, এবং এটুকু বলেই কি বিদায় নিই যে, 'তাঁর ছন্দ চমৎকার' ?

আমরা যখন পিকাসোর ছবির সমুখে দাঁড়াই, তাঁর রঙের ব্যবহারটুকুই কি আমাদের প্রথম এবং একমাত্র চোখে পড়ে ?

পল রোবসনের গান শুনে কেবল তাঁর সরগমের দক্ষতাটুকু ?

রবীন্দ্রনাথ কি ছন্দের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ? পিকাসো, পিকাসো হন রঙ ব্যবহারের চাতুর্যেই কেবল ? শুধু গায়কির জন্যেই একজন রোবসন ? প্রম্পট করবার দরকার আছে কি যে এর সবগুলোরই উত্তর— নির্মম সংক্ষিপ্ত একটি 'না' ?

'তাঁর গদ্য চমৎকার'— শুনে আমার মনে হয়, একটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার পর যখন জিগ্যেস করা হলো 'লোকটি কেমন ?' উত্তর হলো 'তাঁর স্বাস্থ্যটি ঈর্ষণীয়।' জানা গেলো না সে উন্মাদ কি সুস্থ, তার মূল্যবোধ আছে কি নেই, সিদ্ধান্ত করতে পারা গেলো না তার সখ্য কাম্য কিংবা নয়।

অথচ ঠিক এই ব্যাপারটিই আমরা করে চলেছি; ঠিক এই ফাঁকটিকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি যখনি এই বিশেষ লেখকটির কথা উঠে পড়ছে। যদি, ধরে নেয়া যাক যদি, তাঁর গদ্য এতই চটপটে ঝলমলে গনগনে যে তাঁর লেখা পড়ে প্রথমেই আক্রান্ত হতে হয় ঐ গদ্যের হাতে, আমি বলবো— চাই না সে গদ্য; আমি বলবো— স্বয়ং লেখকেরই জন্মশত্রু তাঁর ওই গদ্য; এবং বন্ধু হিসেবে, তাঁকে বলবো— সতর্ক হোন।

কারণ, গদ্য তো বাহন মাত্র; পাল্‌কির জেল্লাদার নকশায় আরোহিণীর রূপই ম্লান হয়ে যাচ্ছে যে! কখনো তাকে তো চোখেই পড়ছে না! উপমাটিকে আরো খানিকটা খাটিয়ে নিতে পারি; বলতে পারি— কেবল নকশাই নয়, বাহনটির বিশেষ নির্মাণ সম্পর্কেও ভাবতে হবে। জলে পাল্‌কি চলে না, অতএব যমুনা পাড়ি দিতে পাল্‌কির ফরমাস করাটা প্রতিভা নয়— বাতুলতা বলেই ধরে নেবো। খাড়া পাহাড়ে উঠতে চাই ভিন্ন কোনো বাহন; সমুদ্রের গভীরে নামতে অন্য কোনো যান।

উপমান ও উপমেয়র সীমাবদ্ধতা আছে, অতএব এখানেই থামতে হলো। এতক্ষণে আমার বলবার কথাটিও শীত-গ্রীষ্ম সইবার মতো স্বাস্থ্য পেয়ে গেছে যে—

গদ্যের জৌলুশ বিড়ম্বনা মাত্র;

উক্তির আসন গদ্যের ওপরে;

উক্তির ফাঁক গদ্য দিয়ে পূরণ করা যায় না— গদ্যের দুর্বলতাও উক্তির সালসায় কখনোই কাটে না;

উপলব্ধির হাত ধরে আসে গদ্য;

বিষয় এবং প্রস্তাব অনুসারে গদ্যের চাল পালটায়;

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন আনে তাঁর গদ্যের বিবর্তন;

যে লেখকের গদ্যের প্রশংসাই কেবল করি, বস্তুত তাঁর নিন্দাই আমরা করে যাই— আমাদের এ উচ্চারণ প্রকারান্তরে তাঁর ব্যর্থতাকেই সনাক্ত করে।

গদ্যের জাদু কোথায়

'চমৎকার গদ্য'— সংক্ষিপ্ত এবং প্রতারক এই প্রশংসা বাক্যটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে। ও বছর নভেম্বরে আমার গল্পের প্রথম বই *তাস* বেরুবার পর একাধিক বন্ধু বলেন— 'সৈয়দ হক চমৎকার গদ্য লেখে'। শুনে খুশি হই নি বললে মিথ্যে বলা হবে; তবে একই সঙ্গে সত্য এই যে, তখনই আমার মনের ভেতরে সন্দেহের একটা ছোট্ট কুশও অনুভব করেছি।

চমৎকার গদ্য ? শেলফ থেকে একটা বই নেয়া যাক। মাহমুদুল হকের উপন্যাস *জীবন আমার বোন*। যে-কোনো একটি জায়গা বের করি; পড়ে দেখি।

হীরের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো নীলাভাবী। খোকা হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলাভাবীর দু'চোখ দিয়ে। মাঝখানে দুটি বিন্দুর মতো দু'জনকে বসিয়ে অকারণ আনন্দে চারটি দেয়াল যেন হাত ধরাধরি করে শিশুর মতো নেচে নেচে ঘুরপাক খাচ্ছে; দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান। লেসের কাজে মোড়া টিপয়ের ছাউনি দুলছে, দুলছে ফুলদানি, দুলছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রজনীগন্ধাগুচ্ছ, ট্রানজিস্টার যেন বনবিড়াল, খাড়া করে মৃদু মৃদু নাড়ছে এরিয়েল-লেজ; হাওয়া, এত হাওয়া আসে কোথা থেকে, সমুদ্রের খুব কাছে তারা, কিংবা একটা জাহাজের ভিতর হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে কাণ্ডজ্ঞানহীন বহু মত ও মন্তব্যের অহরহ উৎপাত থাকলেও, এবং কারো সঙ্গে কারোরই কখনো ঐক্যমতের সাধারণ কোনো

ক্ষেত্র, এমনকি সংকীর্ণতম কোনো ক্ষেত্র লক্ষ করা না গেলেও, এই একটি মন্তব্য প্রায় নিষ্কন্টক যে, 'মাহমুদুল হক চমৎকার গদ্য লেখেন।'

তাঁর সেই চমৎকারিত্ব তাহলে কোথায় ?

ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি আমি আবার পড়লাম। পাকা হাত; কিন্তু শিল্পটুকু কোনখানে ? আরো একবার পড়ে দেখিনা কেন ?

এবার চোখে পড়ছে জ্যামিতিক একটি বিন্যাস। অনুচ্ছেদটিতে মোট পাঁচটি বাক্য। প্রথম তিনটি বাক্য প্রায় এক মাপের, চতুর্থ বাক্যটি প্রথম তিনটি বাক্যের যোগফলের প্রায় সমান জায়গা নিচ্ছে, আর পঞ্চম বাক্যটি দ্বিগুন জায়গা নিচ্ছে চতুর্থ বাক্যটির। যেন চোখে দেখতে পেলাম— তিনটি এক মাপের সরল রেখা একের নিচে আর, তার নিচে দীর্ঘতর একটি রেখা, সবশেষে দীর্ঘতম রেখাটি।

এই বিন্যাস, এই পরিকল্পনা— চমৎকারিত্ব কি এখানেই ?

অথবা, মনে মনে নয়, উচ্চারণ করে পড়বার সময় দেখছি প্রথম তিনটি বাক্য অকম্পিত। চতুর্থ বাক্যের শেষ অংশে 'দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান' বলতে গিয়ে এই প্রথম মৃদু একটি দোল। তারপর পঞ্চম বাক্যে এসে অনবরত দোল, ছোট ছোট দোল। সবশেষে 'হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে' আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল স্থির কিনারায়। স্থির, কিন্তু এখনো কি আমরা অনুভব করছি না আমাদের শ্রুতির ভেতরে সদ্য অতীত সেই দোলা এবং রক্তের ভেতরে অভিজ্ঞতার একটি বিচ্ছুরণ ?

তাই কি আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, তিনি কী সুন্দর গদ্য লেখেন ?

আমি এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না। তাহলে আবারো পড়ে দেখা যাক।

অনুচ্ছেদটির প্রথম তিনটি বাক্যে আছে শাদা তথ্য, মুখোমুখি দু'টি চরিত্র সম্পর্কে। এই তথ্য কোনো নাটক বা চিত্রনাট্যেও পাওয়া যেতে পারতো— যা অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষেই কেবল জরুরি। কিন্তু এরপরই লেখক এমন এক সংবাদ দিচ্ছেন যার সম্ভবপরতা নিয়ে বাণিজ্যিক এলাকায় গুরুতর প্রশ্ন উঠবে; অথচ আমরা আমাদের ভেতরে তাকালেই দেখতে পাবো এ রকমটি হয়, হয়েছে, হতে পারে। লক্ষ করি, লেখক আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন আমাদেরই পরাচৈতন্যের ভেতরে এবং পঞ্চম বাক্যে এসে তিনি আমাদের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা নিয়ে জাদুকরের মতো দু'হাতে লোফালুফি করছেন— তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজেদের সমর্পণ করেছি আমরা। এই যে তিনি আমাদের বাস্তব বল হরণ করতে পারলেন, এখানেই কি লেখকের নৈপুণ্য ?— তাঁর গদ্যের চমৎকারিত্ব ? এখনো ইতস্তত করছি। নিশ্চিত হয়েও ঠিক আশ্বস্ত হতে পারছি না।

তাহলে আরো একবার অনুসন্ধান করে দেখব কি ?

উপমাগুলো এবার ঝকমকিয়ে উঠল। চরিত্র দুটি, দুটি বিন্দুর মতো হয়ে গেছে। ঘরের চারটে দেয়াল ব্যক্তিসত্তা পেয়ে গেছে— সেই ব্যক্তিসত্তার ভেতরে এই মুহূর্তে

শৈশব ফিরে এসেছে। ট্রানজিস্টার হয়ে গেছে বনবিড়াল; আর তারই জের ধরে এরিয়েল হয়ে গেছে বনবিড়ালের লেজ। সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও অনুভব করলাম— শহরের সড়ক হয়ে গেছে সমুদ্রের উপকূল, বাইরের সমস্ত শব্দ এবং কোলাহল এখন মাছের ফিশফিশানি। আর উপমা রচনার সাহস বেড়ে উঠে 'শূন্যতাবোধ' নামে সম্পূর্ণ বিমূর্ত একটি অনুভূতি পেয়ে গেছে চাঁদের উপমান— তাও ওজনহীন এক চাঁদ। এবং সেই চাঁদ সাঁতার কাটছে। কোথায় কাটছে সাঁতার ? লেখক বলে না দিলেও আমরা অনুমান করে নিতে পারি চরিত্র দুটির প্রত্যক্ষ ব্যবধানের ভেতরে যে অন্তর্গত ব্যবধান, তা এখন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এই যে একবহর উপমা, যার অধিকাংশই লেখকের সৃষ্টি এবং কিছুটা আমাদেরও নির্মাণ, এই যে লেখকের প্ররোচনায় আমরাও ক্ষণকালের জন্যে অনুলেখক হয়ে উঠলাম, তাঁর ছুড়ে দেয়া বল লুফে নিয়ে আমরাও যে সেটি একবার আকাশে ছুড়ে দিলাম— গদ্যের জাদু কি এখানেই ? উপমা রচনাতেই গদ্যের চমৎকারিত্ব তবে ?

মনে হতে পারে লেখক যখন অনুচ্ছেদটি লিখেছেন তখন এত কিছু হিসেব করে লেখেন নি, কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করি না, এমনকি লেখক স্বয়ং বললেও না। কোনো লেখক, যদি সত্যিকার অর্থে লেখক হন, তিনি সচেতনভাবেই তাঁর প্রতিটি বাক্য রচনা করেন। লেখায় কোনো কিছুই আকস্মিক নয়। আর 'হাতের টান' কথাটি তো প্রতারক যার খপ্পরে পড়ে আমরা এরকম অন্তঃসারশূন্য উক্তি প্রায়ই করে থাকি যে, 'অমুকের গদ্য বেশ ঝরঝরে।'

গদ্য আর পদ্য

'তার গদ্য চমৎকার'— বুঝে দেখা দরকার সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত কিংবা প্রেত— কে ?

'গদ্য' শব্দটির অর্থ অভিধান লিখছে— সহজ ভাষা, যে-ভাষা ছন্দোবন্ধে রচিত নয়। তাহলে শামসুর রাহমান কি গদ্য লিখেছেন ?— যখন পড়ছি—

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার অগ্নিস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের ওপর।

আমি ইচ্ছে করেই শামসুর রাহমানের অভিপ্রেত পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস উপেক্ষা করে স্তবকটি টানা তুলে দিলাম। এখানে কবিতার সাক্ষাৎ পেয়েছি, কেউ এতে দ্বিমত হবেন না; বলবেন, কবিতা, তবে ছন্দে লেখা নয়, তাই গদ্যের মতো টানা লিখে গেলেও একে আমরা কবিতাই বলবো।

শামসুর রাহমানের অন্য একটি রচনা থেকে পড়ি এবং এবারেও তাঁর অভিপ্রেত পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস উপেক্ষা করে টানা তুলে দিই না কেন ?

পুড়ছে আগরবাতি, বিবাগী লোবান। ঘরে নড়ে নানা লোক; প্রবীণ নবীন ছায়া পাঁশুটে দেয়ালে। অনুরাগী কেউ আসে, কেউ যায়, দ্যাখে তার সমস্ত শরীরে উচ্চারিত মৃত্যুর অব্যয় মাতৃভাষা। আসেন সমালোচক, পেশাদার; বন্ধু কেউ কেউ, জুটে যায় বেজায় ফেরেববাজ প্রকাশক। অনুরক্ত পাঠক নোয়ায় মাথা আর বারান্দায় ভিড়ে বলপয়েন্টে ক্ষিপ্র নিচ্ছে টুকে জীবনীর ভগ্নাংশ নিপুণ নৈর্ব্যক্তিক স্টাফ রিপোর্টার। কোন সালে জন্ম তাঁর, কী কী গ্রন্থের প্রণেতা, ক'জনইবা পুষ্যি রইলো পড়ে ঘোর অবেলায়, নাকি সে অকৃতদার ইত্যাদি সংবাদ দ্রুত প্যাডে জমা হয়, তবু উন্মোচিত জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।

ভাষা এখানে সহজ নয় এমনটা কেউ বলবেন না; তবে ছন্দে লেখা। আর সে জন্যেই, কেবল সে জন্যেই কি এই পঙ্‌ক্তিটি কবিতার অংশ ?— যে-খবরগুলো এতে পেলাম তার ভেতরেই কাব্য ? নাকি দু'একটি ক্রিয়াপদ ঠিক মুখের সংলাপে যেমন যে জায়গায় আসবার কথা তেমন আসে নি বলেই কবিতার দিকে একে ঠেলে দিচ্ছি ? যেমন— 'ক্ষিপ্র নিচ্ছে টুকে' লেখা হয়েছে 'ক্ষিপ্র টুকে নিচ্ছে'র বদলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যে-ভাষা আমরা ব্যবহার করি তাতেও তো ক্রিয়াপদে কবিতার এ চাল আমরা লাগাই; যেমন— দোকানিকে অনুরোধ করছি দাম কমাতে, 'করুন কিছু কম' 'কিছু কম করুন'-এর বদলে। অথবা, 'তবু উন্মোচিত জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়'—এই পর্যবেক্ষণটি শোকার্ত আলো ফেলেই কি আগের সব তথ্যকে কবিতার অন্তর্গত করে নিলো ?

শামসুর রাহমানের লেখা থেকে এই যে দুটি অংশ শুনলাম, কই, শুনে তো বলে উঠলাম না, 'কী চমৎকার গদ্য' অথবা 'কী চমৎকার পদ্য'! আমরা উদ্দীপ্ত হলাম, বিষণ্ন হলাম, আশান্বিত হলাম, উত্তোলিত হলাম, আন্দোলিত হলাম, পরিবর্তিত হলাম, কত কিছুই হলাম, এবং সমস্বরে স্বীকার করলাম— এই কবির মতো এভাবে আমরা আগে দেখি নি; তাঁর চোখ দিয়ে দেখলাম, দেখে আমরা অর্জন করলাম— চোখ আর বলা যাবে না— দৃষ্টি। এই যে উদ্ধৃতি দুটি, এতেও আছে শব্দের সচেতন নির্বাচন, এতেও আছে বাক্যের নিপুণ নির্মাণ, আছে বাক্যবন্ধের সংস্থাপন থেকে উদ্ভূত দোলা, আছে উপমা, সংকেত, পর্যবেক্ষণ— ঠিক যা আমরা লক্ষ করেছি যে-কোনো মহৎ উপন্যাস বা গল্পে। তবু শামসুর রাহমানের কবিতা পড়ে আমরা বলবো না 'তাঁর পদ্য চমৎকার', অথচ ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* পড়ে অন্তত একবার হলেও তাঁর গদ্যের কথা আমরা স্মরণ করব।

কেন এই বিশেষ ঝোঁকটি আমরা দিয়ে থাকি কেবল গদ্যের বেলায় ?— বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসের গদ্য ?

আমার মনে হয়, গল্পে যেহেতু অধিকাংশ সকলেই আশা করি চমকপ্রদ, স্বাস্থ্যকর, নিটোল একটি কাহিনী; গল্প নিয়ে এ শতাব্দীতে বীর্যবান বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও আমাদের প্রত্যাশা এখনো যেহেতু কথকতা; যেহেতু আমরা এও বুঝে গেছি যে মানুষ কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর ধরে রীতিবদ্ধভাবে গল্প রচনা করে আসছে, কোটি কোটি গল্প লেখা হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন গল্প নির্মাণ করা আর সম্ভব নয়, সব সম্ভাবনাই নিঃশেষিত নির্মমভাবে, তাই আমরা গল্প লেখকের কাছে অর্ধমনস্কভাবে যা আশা করি তা 'বলবার' চাতুর্য। আমরা ভুলে যাই গল্প যিনি রচনা করেন, তিনি একটা বিশেষ কালেই করেন, বিশেষ একটা পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরবার জন্যেই তিনি রচনা করেন; তাঁর গল্প একজন কবির কবিতার মতোই আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এক বিশেষ সময়ের বিশেষ এক অর্জনের মুখোমুখি। আমাদের ভুলে যাবার ও ভুলে থাকবার ক্ষমতা কী অসাধারণ যে, আমরা গল্পের বক্তব্য নয়, গল্পের গদ্য নিয়ে— কোনো কোনো লেখকের বেলায়— এত বেশি আলোচনা করি; আর এরই উল্টো পিঠে বহু লেখকের কথাও স্মরণ করি, করতে পারছি, যাঁরা পর্যবেক্ষণ ও বক্তব্যের তুলনায় গদ্যকে অধিকতর পরিচর্যা দিয়ে থাকেন।

এইসব লেখকেরা এবং নির্জলা গদ্যপ্রেমিক পাঠকেরা হয়তো নিচের এই অনুচ্ছেদটির সমুখে বিব্রতবোধ করবেন, একে গণনায় নেবার অনুপযুক্ত বিবেচনা করবেন হয়তো, যখন একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আপাতদৃষ্টে কী সহজ, কী আয়াসহীন, এই কথাগুলো লেখেন, যেন এতবড় একজন গদ্যশিল্পীর হাতের কাজ এ কিছুতেই নয়!—

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না— চলিল। আবার সকলে ডাকিল— তিরস্কার করিল— গালি দিল— দুইজনের কেহ শুনিল না— চলিল। অনেকদূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, 'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।'

শৈবলিনী বলিল, 'আর কেন— এইখানেই।'

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল— কেন মরিব ?

প্রতাপ আমার কে ? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না— ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

এই হচ্ছে গদ্য, গল্পের গদ্য, জাত-শিল্পীর গদ্য; কারদানি নেই, কিন্তু কখন এ আমাদের কাৎ করে ফেলে আমরা টেরও পাই না; আমাদের মন রণিয়ে যখন ওঠে তখনই বুঝি— গদ্য নয়, গদ্যের বাহনে এর ভেতর-বার্তাটি।

গল্প-গদ্যের চাল ও কাজ বুঝতে বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* উপন্যাস থেকে এই অংশটি নিবিড়ভাবে পড়ে দেখি—

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না— চলিল। আবার সকলে ডাকিল— তিরস্কার করিল— গালি দিল— দুইজনের কেহ শুনিল না— চলিল। অনেকদূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, 'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।'

শৈবলিনী বলিল, 'আর কেন— এইখানেই।'

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল— কেন মরিব?

প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না— ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

আবিষ্কার করি, এই অংশটিতে উপমা নেই, চিত্রকল্প নেই, এমনকি বঙ্কিমের গদ্য বলতে আমরা যে তৎসম শব্দ, তার যে-ঝংকার, সমাসের যে-দীর্ঘ শেকল ও যে-ধ্বনিতাড়না আশা করতে অভ্যস্ত, আমাদের সেই আশাও এখানে মর্মান্তিকভাবে খণ্ডিত। প্রতাপ ও শৈবলিনীর উল্লেখ না থাকলে, বঙ্কিমের নাম বলে দেয়া না হলে হয়তো আমরা অনেকেই বলে উঠতাম— এ বঙ্কিমের লেখা নয়। অথচ বঙ্কিমের তো নিশ্চয়, বঙ্কিমের মতো গদ্যশিল্পীই কেবল এই অসাধ্যসাধন করতে পারেন যা এখানে করা হয়েছে।

সেটি কী? সেটি হচ্ছে, দৃশ্যত কোনো কৌশল অবলম্বন না করবার কৌশল। অথবা এইটিই সবচেয়ে বড় কৌশল। যে-বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ঠিক এর আগেই লিখেছেন— *ফেনচক্রমধ্যে সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল*-র মতো সর্বাংশে সাজানো একটি বাক্য, তিনিই যখন— তাঁরই ভাষা ধার করে বলি— *অকস্মাৎ জলদমুক্ত পূর্ণশশীর* মতো বেরিয়ে এসে উপন্যাসের দুরূহতম মুহূর্তটি সবচেয়ে সরল কলমে লেখেন, তখন তাঁরই একটি উপমা— এ উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় আছে— ব্যবহার করে বলি, আমরা এক *অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু* প্রত্যক্ষ করবার মহাবিস্ময় অনুভব না করে পারি না।

অথচ সত্যিই কি এখানে তাঁর কলম সবচেয়ে সরল?

আমার মনে পড়ছে আমারই মেয়ে বিদিতার কথা। তখন বছর সাত বয়স তার। একদিন এসে বলল, 'বাবা, তোমার ঘরের এই দেয়াল শাদা তো? আমি এক্ষুণি এই দেয়াল সবুজ করে দিতে পারি।' আমি তো ভেবেই পাই না কী করে শাদা দেয়াল

চোখের পলকে সবুজ হয়ে যাবে। অপেক্ষা করি। বিদিতা চট করে স্বচ্ছ একটা সবুজ কাগজ আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলে, 'এইবার দ্যাখো তো সবুজ কিনা ?' অস্বীকার করবার কোনো উপায় থাকে না আমার। সে চলে যাবার পরও বিস্ময় কাটে না যে, যেখানে দেয়ালের কথাই ভাবছি সেখানে নিজের চোখদুটিতেই কাগজে পরিয়ে বিভ্রমটা কত সহজে সৃষ্টি করা গেলো।

আক্ষরিক অর্থে জাদু চোখের ব্যাপার; শিল্পের জাদু মনের ভেতরে। বঙ্কিমের লেখা অংশটির দিকে আবার তাকানো যাক।

এবার কি আমাদের চোখে পড়ছে না প্রতিদিনের বহু ব্যবহারে মলিন ও ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়া অতিপরিচিত শব্দকে তিনি কী প্রখর উজ্জ্বলতা ও সাংকেতিকতা দিয়েছেন ? আমরা কি লক্ষ করতে পারছি না শব্দগুলো কী উৎসাহের সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ-সম্ভাবনার চূড়ান্ত বলয়সীমা অতিক্রম করছে অথবা সেই বলয় সীমাকেই কীভাবে বিস্তৃত করে চলেছে ? যেমন, *তিরস্কার করিল* এবং তারপরেই *গালি দিল*— তিরস্কার ও গালি সমার্থক হলেও ব্যবহারগুণে অর্থভেদ ঘটে যাচ্ছে। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি, তীরের লোকেরা ভদ্রভাষায় প্রথমে শৈবলিনী ও প্রতাপকে ফিরতে বলছে; তাতে তারা কান দিলো না দেখে, আমরা পরিষ্কার শুনতে পাই, লোকেরা এখন মুখে যা আসছে তাই বলে তাদের ফেরাতে চাইছে; এবার আর তাদের ভদ্রতার বালাই নেই। সংলাপ যদিও অনুচ্চারিত, তাদের মনোভাবের ওই দুটি স্তরের সংকেত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন সমার্থক কিন্তু দু'জাতের দু'টি শব্দ ব্যবহার করে।

কেবল শব্দই নয়, দুই শব্দের মাঝখানে যে-ফাঁক, উচ্চারণের যে-যতি, তাও কি অক্ষরে রচিত শব্দের চেয়ে কম অর্থপূর্ণ ? যেমন, *তাহারা শুনিল না* আর *চলিল* এই দুয়ের মাঝখানে যে যতি পড়েছে, তা কি প্রতাপ ও শৈবলিনীর ক্ষণকালের থেমে পড়া এবং পরমুহূর্তে আবার এগিয়ে যাওয়ার ছবিটি এঁকে দিয়ে গেলো না ? আমরা কি স্পষ্ট দেখতে পেলাম না তাদের মুখ, মুখের অভিব্যক্তিটুকু পর্যন্ত ? অথবা, যেখানে লেখা হয়েছে *শৈবলিনী ডুবিল না,* তারপরে এই বাক্যটি *সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল*— এই দুটি বাক্যের মাঝখানে একটি মানুষের জীবন-মৃত্যু ছোঁয়া কোনো সিদ্ধান্ত— যে সিদ্ধান্ত একটি মহাযুদ্ধ শুরু করবার তুলনায় কম গুরুতর নয়, অথবা ব্যক্তিগত বলেই আরো অসহায়, আরো নিঃসঙ্গ, বলবিযুক্ত এই সিদ্ধান্ত— সেই সিদ্ধান্ত নেবার মহামুহূর্তটি কি রুদ্ধশ্বাস হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম না ?

উপন্যাসের এই সংকট-মুহূর্তটি বঙ্কিমচন্দ্র নির্মাণ করেছেন, উপমা-তুলনা-চিত্রকল্প বর্জন করে, কেবল নগ্ন শব্দের সংকেতে। এই সংকেত যেন চিত্রকরের রেখাঙ্কন— একটি মুখ সম্পূর্ণ আঁকা হয় নি, কেবল চোখ, চিবুকের একটু আভাস, চুলের একটা ঢেউ, ওতেই মুখটি পুরো প্রত্যক্ষ করে উঠলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই সংকেত প্রয়োগে যে কত সফল তা অনুভব করি যখন শেষ দুটি বাক্য পড়ি।

শৈবলিনী ডুবিল না— ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

মনে হতে পারে শেষ বাক্যটি আগের বাক্যের শেষ শব্দটিরই সম্প্রসারণমাত্র, মনে হতে পারে দ্বিরুক্তিদোষ ঘটেছে। কিন্তু না, একটু মনোযোগ করলেই দেখতে পাবো, শেষ ওই বাক্যটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে শৈবলিনীর জন্মান্তর ঘটে গেছে; আমরা জানতে পারছি, সাঁতার দিয়ে ডাঙায় এখন যে শৈবলিনী ফিরে এলো, তার পা জল ছেড়ে স্থলেই— সংসারের কঠিন মাটিতেই পড়লো। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসই হতো না যদি না শৈবলিনী নদীতে ডুবে না-মরার সিদ্ধান্ত নিতো। উপন্যাসের এই দুরূহতম দৃশ্যটি লিখতে গিয়ে বঙ্কিম অবশ্যই অনুভব করেছেন— লেখক বলেই আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি— ভাষার আছে সীমাবদ্ধতা। ভাষায় কখনোই আমরা সম্পূর্ণ করে কিছুই বলতে পারি না; ভাষায় আমরা কেবল সংকেতই দিয়ে যেতে পারি; পুরো ছবিটা তৈরি করে নেবার ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি মাত্র; এবং এভাবেই আমাদের বক্তব্যের দিকে পাঠক বা শ্রোতাকে টেনে আনতে পারি, তাকেও আমরা এক অর্থে রচয়িতা করে তুলতে পারি; যিনি তা সাবলীলভাবে পারেন তিনি লেখক; যিনি তা জীবনের অনুকূলে পারেন তিনি মহৎ লেখক; আর যিনি পুরুষের পর পুরুষ এই কীর্তিটি সাধন করতে পারেন তিনি অমর লেখক।

কল্পনা আর উদ্ভাবন

যিনি গল্প লেখেন কতটা কল্পনা আর উদ্ভাবন করেন তিনি? কল্পনা তো সেই ক্রিয়াটির নাম : দুই আপাত-দূর বা অসম্ভবকে একটি ভেতর-সম্বন্ধে যুক্ত করা। এ শুধু কল্পনা নয়, সৃজনশীল কল্পনা। বহুবার বলা আমার সেই দুটি উদাহরণ আরো একবার দিই যে, কোথায় চাঁদ আর কোথায় মুখ, দুই একত্রিত হয়ে *চাঁদমুখ,* কিংবা আপেলের পতন ও জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণ শক্তি এক করে দেখলেন নিউটন, বললেন *মধ্যাকর্ষণ;* শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস-অবলোকন, বস্তুত মানুষের সকল উদ্যমের মূলেই আছে বিশেষ এই কল্পনা-ক্রিয়াটি।

গল্প লেখক যখন একটি গল্পের বীজে এসে উষ্ণ ও উপ্ত হয়ে ওঠেন, বস্তুত করোটির ভেতরে ওই কল্পনা-ক্রিয়াতেই মেতে ওঠেন তিনি। স্মরণ করি এডগার অ্যালান পো'র বিখ্যাত সেই প্রশ্ন : গল্প লেখার উষা-মুহূর্তটি কেমন? তাঁর সমুখে একাধিক উত্তর ছিলো : একটি বলবার কথা আছে, সেই কথাটিকে রূপ দেবার জন্যেই কি আমরা সৃষ্টি করি চরিত্র ও ঘটনা?— নাকি সে এমন, আমরা অনবরত দেখছি মানুষ, অনবরত এই যে দেখে চলেছি জীবন যাপনের ঘটনাসকল, এই সবই কি একসময় কল্পনা-ক্রিয়ায় সম্বন্ধিত হয়ে গল্পের শরীর ধরে ওঠে?

যদিও অ্যালান পো ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, এই দ্বিতীয়টিই গল্প রচনার একমাত্র উপায়, আমি আমার অভিজ্ঞতায় তেমনটি কিন্তু দেখতে পাই নি; আমার কলমে দুটির যে-কোনোটিই আমাকে একটি গল্প এনে দিতে পারে। আমারই এমন অনেক গল্প আছে যার ভেতর-কথাটি এসেছে আগে এবং সেই কথাটিকে চিত্রিত করবার জন্যেই অতীতে দেখা চরিত্র আর অতীতে জানা কোনো কোনো ঘটনা ব্যবহার করে অগ্রসর হয়েছি; আমার অন্তত তিনটি উপন্যাসের কথা বলতে পারি— *নীলদংশন, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, দূরত্ব*, এদের রচনা, প্রথমে একটি বলবার কথা, পরে সেই কথাটির জন্যে চরিত্র এবং ঘটনার সন্ধান, এভাবেই হয়। আবার, *খেলারাম খেলে যা, কবি, অন্তর্গত, গাধা জ্যোৎস্নার পূর্বাপর*— এইসব উপন্যাস ও গল্প এসেছে অতীত অভিজ্ঞতার টুকরোগুলো মেলাতে মেলাতে শেষ পর্যন্ত একটি বলবার কথায় উপনীত হয়ে।

কিন্তু, উদ্ভাবন ? কল্পনা-ক্রিয়ার ধরন যেমনই হোক না কেন, গল্প লেখার জন্যে একজন লেখককে কিছু কিছু জিনিশ উদ্ভাবন করতেই হয়— এবং এর কোনো দু'রকম নেই; শরৎচন্দ্রের মতো ঘটনাপ্রধান বা কমলকুমার মজুমদারের মতো অনুভব-প্রধান রচনা, সকলক্ষেত্রেই এই উদ্ভাবনের সাক্ষাত আমরা পাবো।

এ আর কিছু নয়; আপাতদৃষ্টে সামান্য বলে যা মনে হবে— চরিত্রের নাম, ঘটনাস্থলের বর্ণনা, গ্রাম বা শহরের নাম; চরিত্রের জন্যে যে-কোনো নাম দিলেই চলে না, অনেক ভেবে, গল্পের ভেতর-সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে, নাম, বিশেষ করে প্রধান চরিত্রের নামগুলো স্থির করতে হয়; *গোরা* উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম গোরা ভিন্ন আর কিছু আমরা ভাবতেই পারি না, *পদ্মানদীর মাঝি*-র কুবের ভিন্ন আর কোনো নাম উপযুক্ত বলে মনে হয় না, *কাঁদো নদী কাঁদো*-র মুহাম্মদ মুস্তাফা ছাড়া আর কোনো নাম প্রধান চরিত্রটির জন্যে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কেন পারি না ?— এর উত্তর খোঁজা সহজ হবে শেষ উদাহরণটি থেকে : সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের নাম মুহাম্মদ মুস্তাফাই শুধু রাখেন নি, মুস্তাফার স্ত্রীর নাম রেখেছেন খাদিজা, মায়ের নাম আমিনা— ইসলামধর্ম প্রবর্তকের সঙ্গে যুক্ত এই তিনটি নাম থেকেই ধরা পড়বে যে একটি বিশেষ অভিপ্রায় ছিলো লেখকের, পরিষ্কার হয়ে যাবে যে গল্প-কল্পনার সমান শ্রম দিয়েই লেখক তাঁর চরিত্রগুলোর নাম উদ্ভাবন করেছেন; এই উদ্ভাবন কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় কল্পনা-ক্রিয়ার তুলনায়।

গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের নাম রাখা পুরো রচনা প্রক্রিয়াতেই সামান্য বা সাধারণ নয়; এবং সবসময় যে চরিত্রের ভেতরটাকে ও লেখকের বলবার কথাটিকে মনে রেখেই নাম রাখতে হবে, এমনও কোনো কথা নেই; কখনো কখনো তা কৃত্রিম হয়ে পড়তে পারে, যেমন শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*-তে যখন চরিত্রের নাম রাখা হয় *সব্যসাচী*।

আবার, নাম এমনভাবেও নির্ধারিত হতে পারে, যখন চরিত্রের এবং স্থানের একটি বিপরীত সুর— বলা যায়, সংঘর্ষ বা ধাক্কা— সজ্ঞানে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক; আমি নিজেই এমনটি করেছি আমার বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে— গ্রামের নাম

রেখেছি হাগুরার হাট, বল্লার চর, মান্দারবাড়ি, বুড়ির চর; চরিত্রের নাম ব্যাং মামুদ, ভূতিবাবু, কানাট্যাংরা।

যেটি বলতে চাই, গল্প লিখতে বসে চরিত্র এবং স্থানের নাম রাখাটাও যেন কম গুরুত্ব না পায় লেখকের কাছে; সন্তানের বা বাড়ির নাম রাখবার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ এইসব নাম রাখা; এইসব নামের ভেতর দিয়েই একটি সুর বাঁধা হয়ে যায়, বিপরীত অথবা একমুখী, যেনবা প্রাচ্য সঙ্গীতে তানপুরায় সুর ধরে রাখা, কিংবা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কাউন্টার পয়েন্ট রচনা করা।

গল্পের খোঁজে

লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মানুষের কত রকম কৌতূহল হয়, তখন কত রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় লেখককে; প্রায়ই হাস্যকর, কখনো কখনো গুরুতর সেইসব প্রশ্ন। মনে পড়ে, আমার লেখক জীবনের ছোটবেলায় একজন আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, আমি কোন ক্লাশের বই লিখি ? —তাঁর ধারণা, লেখক মানেই স্কুল পাঠ্য বইয়ের লেখক। আবার অনেকে জানতে চান, একটা বই লিখতে কত দিন লাগে ? একটা বই লিখে কত রোজগার হয় ? আমার বই কতগুলো ? কেউ জানতে চান, আমার লেখার বিষয় কি ? —তাঁরা পরমুহূর্তেই প্রাঞ্জল করে দেন যে, বই-টই পড়বার সময় তাঁদের হয় না, কারণ বোঝেনই তো আমরা খেটে খাই, সময় নেই। এঁদেরই অনেকে আবার অনুরোধ করেন, আপনার একখানা বই দেবেন তো, পড়ে দেখবো। আবার, যাঁরা আমার লেখা পড়েছেন তাঁরা প্রায়ই গলা খাটো করে জানতে চান, অমুক বইয়ের অমুক চরিত্রটি কি অমুক ব্যক্তি নন আসলে ? এঁরা হন নাছোড়বান্দা, উত্তর না নিয়ে রেহাই দিতে চান না, চুপ করে থাকলে ধরেই নেন যে তাঁর অনুমানই সত্যি। আবার এরকমও হয়, জানতে চাওয়া হয়, আমি কখন লিখি ? দিনে না রাতে ? রাতে যদি লিখি, আর বিজলি যদি চলে যায়, তাহলে আমি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকি ? না, মোমের আলোয় লিখি ? একবার, কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে এক বাসায় গিয়ে, সে বছর অনেক আগের কথা, এই রকম প্রশ্ন হচ্ছিল একের পর এক, শেষে শামসুর রাহমান থাকতে না পেরে, এতক্ষণ নীরব থাকবার পর, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, যেন প্রশ্নকর্ত্রীর হয়েই, প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কোন টুথপেস্টে দাঁত মাজেন ? প্রশ্নকর্ত্রী নির্বোধ ছিলেন না, শামসুর রাহমানের ক্রোধ এবং তীব্র পরিহাসটুকু ধরতে পেরেছিলেন ঠিকই, অতঃপর, আজ পর্যন্ত সে-বাড়িতে আর আমাদের দু'জনের নেমন্তন্ন হয় নি। আজকাল আবার আরেক প্রশ্ন প্রায়ই পেয়ে থাকি, যাঁরা জানেন আমি কম্পিউটারে লিখি, এ সৃষ্টিশীল কাজ কি যন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব ?

কিন্তু, একটি প্রশ্ন আমাকে ভাবায়, ভাবিয়েছে, যখন কেউ হঠাৎ জানতে চান যে, এই যে এতদিন লিখছি, এত গল্প আমি কোথা থেকে পাই ? আমি চমকে উঠি, কারণ, আমার অতীত মনে পড়ে যায়— আমি নিজেই তো একসময় মনে করতাম, শূন্য ঝুলি হাতে নিয়ে গল্প খুঁজে বেড়াতে হয়; বিচলিত বোধ করি, কারণ, গল্প যে খুঁজতে হয়— এইটে অনেক লেখকই বিশ্বাস করে থাকেন এবং তাঁদের শ্রমের প্রায় সর্বাংশই সেই গল্পের সন্ধানে তাঁরা ব্যয় করে থাকেন; বড় হতাশবোধ করি, যখন দেখি যে, চূড়ান্ত নাটকীয় বা যার শেষ চমকপ্রদ এরকম একটা গল্পের কাঠামো তৈরি করবার জন্যে চারদিকে লেখকেরা কী পরিমাণে ব্যস্ত। অথচ, তেমন নাটকীয়তার কি সত্যি দরকার আছে ? শেষটুকু চমকপ্রদ হলেই কি শিল্প হয়ে যায় ? মঁপাসার 'নেকলেস' গল্পটির শেষটুকু চমকপ্রদ নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমার ধারণা ঐ শেষটুকুই ও-গল্পের শত্রু, কারণ, গল্পটি কেউ যদি আমাকে মুখে মুখে বলেন তো আমার আর পড়বার পরে নতুন কোনো উপার্জন হয় না, কিংবা ধরুন, ও' হেনরির 'রাজদূতদের উপহার' গল্পটি, সেটিও তো কারো মুখে শোনবার পর পড়বার দরকার হয় না; আসলে, আমাদের অনেকেই ও দুটি গল্প কিন্তু না পড়েই জেনে গেছি।

আমার একটি বিশ্বাস আছে যে, মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে গল্প বানিয়ে আসছে, নাটকীয় যত রকম পরিস্থিতি হতে পারে তার সবই এতদিনে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, কারো পক্ষে আর সম্ভব নয় নতুন করে বা নতুন কোনো গল্প বানানো, আমরা কেবল যা করতে পারি, পুরনো গল্পকেই সমকালের পরিস্থিতিতে ফেলতে পারি, অথবা, বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি এবং বলা বাহুল্য, এ দু'য়ের জন্যেই দরকার, এবং একমাত্র দরকার, লেখার ক্ষমতার কথা বলছি না, সে তো থাকতেই হবে, দরকার— একটি বিশ্বাস, একটি দর্শন, একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিশ্বাস, এই দর্শন, এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর আছে, গল্প তাঁকে খুঁজতে হয় না; তাঁকে বরং বেশি করে ভাবতে হয়, কোন গল্প লিখবো আর কোন গল্প লিখবো না।

গল্প লেখকের মাথার ভেতরে গল্প জন্ম নেয় না, মাথার ভেতরে থাকে না; গল্প পড়ে আছে লেখকের চারপাশে, এত গল্প যে একজীবনে সব লিখে ফেলার আশা করাও মূর্খতা। গল্প খোঁজা নয়, বরং কীভাবে গল্পে আমার বিশ্বাসটি পোক্ত কাঠামো হয়ে আসতে পারবে, সেই গল্পে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হতে পারবে কিনা, আমার জীবনদর্শনকে সে-গল্প দক্ষতার সংগে বহন করতে পারবে কিনা, এটা খুঁজে দেখাই গল্প লেখকের প্রাথমিক কাজ, এই হচ্ছে তার প্রস্তুতির সম্পূর্ণ আয়োজন।

তবু যে গল্প খোঁজার একটা কথা শোনা যায়, সেটা তো অস্বীকার করা যায় না, আমার পাঠক না হয় কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, এত গল্প কোথা থেকে পাই, অনেক লেখকও তো আমাকে এই একই প্রশ্ন করে থাকেন, অবশ্য একটু ভিন্নভাবে, যেমন— আপনার ঐ গল্পটি কিন্তু বেশ জমিয়ে তুলেছেন, ঈর্ষা করবার মতো। হা, তাঁদের আমি কী করে বোঝাবো যে, আমি গল্প জমিয়ে তোলাটাকে কোনো কাজই মনে করি না,

বস্তুত আমি সেই অর্থে একটিও গল্প আজ পর্যন্ত লিখি নি, কেবল বাজি রেখে বহুদিন আগে 'কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন' নামে একটি বড় গল্প ছাড়া এবং যেমন বলেছি, ওটা লেখা বাজি রেখে যে, ইচ্ছে করলে একটা নাটকীয় গল্প আমিও লিখতে পারি। না, সেই অর্থে গল্প বা উপন্যাস একটিও লিখি নি; খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে, আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে বিশেষ একটি মানুষকে রেখে তাকে এবং পরিস্থিতিটিকে দেখবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

'গল্প খোঁজা'য় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা আসলে দৈবের ওপর নির্ভর করেন, এ কালে যখন অন্নবস্ত্রের জন্যেও দৈবের ওপর আর মানুষের বিশ্বাস নেই, তখন গল্পের জন্যে তার ওপর নির্ভর করাটা নিতান্তই হাস্যকর। এককালে, সে সুদূর অতীতের কথা, যারা গল্প রচনা করতে পারতেন, তাঁদের মনে করা হতো যাদুশক্তির অধিকারী অথবা স্বর্গীয়-পুরুষ; তাই, রামায়ণ-মহাভারত, যার বাইরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হিমালয়ের দক্ষিণের যাবত মানুষের গল্প-কল্পনা সম্ভব নয় এখন পর্যন্ত, সেই মহাকাব্য দুটিরও রচয়িতা হিসেবে কোনো মানুষকে সম্মান দেয়া হয় নি, এমন মানুষ যিনি আমাদের মতোই খান-দান এবং সংসারধর্ম পালন করেন। আমার তো মনে হয়, এখানেই লুকিয়ে আছে আজো গল্পের জন্যে দৈবশক্তি বা দৈব যোগাযোগের ওপর নির্ভর করবার শেকড়টি।

তারপরে, নানাভাবেও এই ধারণাটি প্রশ্রয় পেয়েছে, কিছুটা লেখকদের নিজের কাজ সম্পর্কে স্বল্পভাষীতার জন্যে, আবার অনেকটা আমাদেরই ভুল বোঝার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' নামে যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তার গল্প তিনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন বলে তিনি নিজেই বহুবার বলেছেন, এখন আমাদের সকলেরই জানা, যে, রেলগাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি বালিকাকে, যে মন্দিরের সিঁড়িতে রক্ত দেখে বলছে, বাবা, এত রক্ত ! আমরা আমাদের ক্ষতি করেছি, ঐ স্বপ্ন দেখাটাকেই উপন্যাসটি লেখার একমাত্র প্রেরণা বলে ধরে নিয়ে, অথচ, আমাদের এতটুকু উৎসাহ থাকলে আমরা সহজেই জেনে নিতে পারি যে, ঐ উপন্যাস রচনার কালে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক রক্তপাত চলছিলো; মানুষের হিংসা এবং কুসংস্কার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল একজন মানুষ, ক্ষুব্ধ এবং ভাবিত, ভাবিত এবং ক্রুদ্ধ ছিলেন; ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসে ব্রাহ্ম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি; সামাজিক পর্যায়ে ত্রিপুরা রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ— এ সবই মিলে মিশে তাঁর মনে যে বক্তব্যের জন্ম দিয়েছিলো, সেই বক্তব্যটিই বাহন পেয়ে যায় তাঁর ঐ স্বপ্ন-দৃশ্যের ভেতরে; আর এ কথা তো আমরা জানি, যে-কোনো স্বপ্নই মানুষের স্মৃতি ও ভাবনার, আশংকা বা আকাংখার দৃশ্যরূপ মাত্র। কাজেই, রবীন্দ্রনাথ দৈবক্রমে 'রাজর্ষি'র গল্পটি পেয়ে গেছেন, এটা কোনো কথাই নয়। আমার মনে পড়ছে, ঔপন্যাসিক হিসাবে আমি যাঁকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি, সেই লিও টলস্টয়ের কথা; তাঁর উপন্যাস 'আনা করেনিনা' লেখার ইতিহাস আমরা এটুকু জানি যে, তাঁর বাড়ির খুব কাছেই একবার এক তরুণী রেলগাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো,

বাড়ির কাছে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক যে-কোনো ঘটনার মতোই এটিও কয়েকদিন ধরে টলস্টয় পরিবারে আলোচিত হচ্ছিলো, এরই মধ্যে তিনি তাঁর বাচ্চাদের পড়তে পড়তে ফেলে রাখা পুশকিনের একটা বই তুলে নেন, বইয়ের একটা গল্প টলস্টয় তাঁর স্ত্রীকে পড়ে শোনাতে থাকেন, যার প্রথম লাইন ছিলো, 'দেশের বাড়িতে অতিথিরা একে একে হাজির হতে শুরু করলো', টলস্টয় বই বন্ধ করে বললেন, 'এভাবেই গল্প শুরু করতে হয়,' তারপর সে-রাতেই তিনি লেখার ঘরে গিয়ে কাগজ টেনে 'আনা করেনিনা' উপন্যাসের প্রথম পাতাটি তরতর করে লিখে ফেললেন, যার শুরু— 'সব সুখী পরিবারই এক রকম, তবে অসুখী পরিবার অপর থেকে আলাদা...।' আমরা ধরেই নিই যে, এইভাবে রচিত হয়ে গেল এমন একটি উপন্যাস যা অনেকেরই মতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস; অথচ, আমরা একবারও ভাবি না যে, ঐ উপন্যাসে হাত দেবার অনেক আগে থেকেই টলস্টয় ভাবছিলেন মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা, ভাবছিলেন সেকালে রুশদেশে ভূমিদাসদের কথা, ভাবছিলেন খামার এবং কৃষিব্যবস্থা নিয়ে, ভাবছিলেন তাঁর বিবাহিত জীবন এবং সংসার নিয়ে, ভাবছিলেন অস্তিত্বের পটভূমিতে নিজের অবস্থানের কথা। —এ তালিকা আরো বাড়ানো যায়, এবং গোটা ছবিটা সচেতনভাবে দেখে নিতে পারলেই আমরা জেনে যাবো যে 'আনা করেনিনা'র আবির্ভাব আকস্মিক নয়, রেলে কাটা পড়া মেয়ের কথা শুনেই তিনি হাতের কাছে 'গল্প পেয়ে গেলাম' বলে কাগজ কলম টেনে নেন নি, বা পুশকিনের লেখায় সূচনার মৃদুস্বর তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো বলেই নিজেও মৃদুস্বরে একটা কিছু লিখে ফেলবার জন্যে অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেন নি তথা দৈবের হাতে কলম এবং কল্পনা ছেড়ে দেন নি।

আসলে, লেখকের বিশ্বাস, দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গি কোনো একটি বক্তব্য তাঁর মনে আগে থেকেই এনে দিয়ে যায়; কোনো একটি স্বপ্ন, যেমন রবীন্দ্রনাথের বেলায়, কিংবা কোনো একটি সংবাদ, যেমন টলস্টয়ের বেলায়, ইংরেজি বাগভঙ্গি ধার করে বলি, ট্রিগার কাজ করে মাত্র; ট্রিগার তো নিজে কিছু নয়, পিস্তল থাকতে হবে, গুলি থাকতে হবে, সমুখে লক্ষ্যও থাকা চাই, তবে ট্রিগার টিপলে গুলিও ছুটবে, লক্ষ্যও বিদ্ধ হবে। সহজ এই কথাটি উপলব্ধি না করবার দরুনই অধিকাংশ লেখকের অধিকাংশ সময় এবং শ্রম খরচ হয়ে যায় ঐ ট্রিগারে, কেবল ঐ ট্রিগার খুঁজতে অথবা বানাতে। উপমাটিকে আরো টেনে বলি, পিস্তল যাঁর হাতে আছে, ট্রিগার সমেতই পিস্তলটি তাঁর হাতে আছে, কেবল সেই ট্রিগারের অবস্থান জেনে আঙুলের চাপ দেবার অপেক্ষা, আর, পিস্তলের ট্রিগার কোথায়, যেমন তা চোখে দেখে বা আঙুলে অনুভব করে জেনে নিতে হয়, তেমনি একজন লেখককেও তার চারপাশে তাকিয়ে দেখতে হয় এবং ট্রিগারটিকে সনাক্ত করে নিতে হয়। গল্প খোঁজার যদি কোনো অভিধেয় থেকেই থাকে তো সেটা হচ্ছে এ ট্রিগারের জন্যে নিজের মন এবং চোখ তৈরি রেখে মানুষের দিকে এবং কেবল মানুষই নয়, সমকালের দিকে তাকিয়ে থাকা, বস্তুত সমকালের পটভূমিতে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকা।

গল্পের জনপদ

আমার গল্প লেখার প্রথম বছর কুড়ি পরে— আমি তখন লন্ডন প্রবাসী, লিখছি কম, ভাবছি বেশি, নিজেরই পুরনো লেখার দিকে তাকিয়ে দেখছি— তখন একদা অকস্মাৎ আবিষ্কার করে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই যে, আমার শহরের গল্পগুলোর পটভূমি হিসেবে একটি শহরই এসেছে, ঢাকা শহর; কিন্তু গ্রামের পটভূমি যখনই নিয়েছি তখনই আমাকে প্রতিটি গল্পের জন্যে প্রতিবার নতুন একটি করে গ্রামের কথা ভাবতে হয়েছে; এবং যে সকল গ্রাম আমি একের পর এক কল্পনায় এনেছি তার একেবারেই বাইরে রয়ে গেছে আমারই জন্ম-এলাকা কুড়িগ্রাম ও তার আশেপাশের গ্রামগুলো; নাম এবং ভৌগলিক পরিবেশ সমেত তারা আমার গল্প-উপন্যাসে একেবারেই অনুপস্থিত।

ঠিক এই সময়ে, ১৯৭৪ সালে, আমি রোজ একটু একটু করে লিখছি *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* নামে উপন্যাসটি; এর পটভূমিতে আছে ছোট্ট একটি শহর, প্রায় গ্রাম; শহরটির একটি নাম আমি দিই এবং লিখতে লিখতে অনুভব করে উঠি যে, আমাকে যে একটি পুরো গ্রাম-শহর উদ্ভাবন করতে হচ্ছে তা কেবল এই বিশেষ রচনাটির জন্যেই, আমি অন্তর্গতভাবে জেনেই যাই এই রচনাটি শেষ হয়ে গেলেই আমার উদ্ভাবিত ওই এলাকা আমি চিরকালের মতো ছেড়ে যাব, আবার যখন কোনো একটি গল্পের জন্যে গ্রামের প্রয়োজন হবে তখন আমি 'নতুন' একটি গ্রাম উদ্ভাবন করে নেবো।

আমার তখন মনে হয়, গল্প লেখার জন্যে যদিও এই উদ্ভাবন-ক্রিয়াটির ভেতর দিয়ে আমাকে যেতেই হচ্ছে, বারবার এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবার বস্তুত কোনো প্রয়োজনই আর থাকে না যদি আমি উদ্ভাবিত একটি এলাকার ভেতরেই ঢাকা শহরের বাইরে আমার সকল গল্প উপন্যাসকে স্থাপিত করতে পারি। এতে শুধু শ্রমই যে বেঁচে যাবে তা নয়— এ শ্রম আমি বারবার গ্রহণ করতে প্রস্তুত— বরং আমি একটি সুবিধেও পেয়ে যাবো; নতুন একটি মাত্রা পেয়ে যাবো; গল্পের পর গল্পে ইতিহাস ও ভূগোল সমেত নিজস্ব একটি জগৎ আমি রচনা করতে পারবো; কিছু কিছু চরিত্র এক রচনা থেকে আরেক রচনায় সাবলীলভাবে চলাচল করতে পারবে; এক গল্পের প্রধান চরিত্র আরেক গল্পে অপ্রধান চরিত্র হিসেবে আসতে পারবে; এক গল্পের সার আরেক গল্পে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে; এবং গল্পের পর গল্পে, উপন্যাসের পর উপন্যাসে, নাটকের পর নাটকে, উদ্ভাবিত ওই জগতের চরিত্র এবং অভিজ্ঞতার অনবরত সঞ্চয় হয়তো শেষ পর্যন্ত একটি মহাকাব্যেরই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করবে।

ওই অভিলাষ থেকেই আমি আমার জন্ম-এলাকা কুড়িগ্রামের কাঠামোর ওপরে কল্পনা করি ছোট্ট একটি শহর— জলেশ্বরী; এবং তার চারদিকে কয়েকটি গ্রাম ও জনপদ— মান্দারবাড়ি, হস্তিবাড়ি, হাগুরার হাট, রাজার হাট, নবগ্রাম, বুড়ির চর, বল্লার চর, শকুনমারি এবং একটি নদী— ধরলাকে মনে রেখে— আধকোশা; এবং

অচিরে সেখানে আমি আমার পিতৃবংশের কিছু অতীতস্মৃতি টেনে স্থাপন করি কুতুবুদ্দিনের মাজার; এবং কুড়িগ্রামে আমার বাল্যস্মৃতি থেকে সংগৃহিত কিন্তু পরে 'সংশোধিত' কিছু চরিত্র।

এই কাজটি একদিনে এক লেখায় করা যায় নি; *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী*-তে জলেশ্বরী নামটি প্রথম আসে, আসে কিছু পথঘাট ও চরিত্র, পরে লেখার পর লেখায়, বিশেষ করে *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ এসে জলেশ্বরীতে যুক্ত হয় আঞ্চলিক পুরানকথা যা ভিন্ন কোনো জনপদই নয় জনপদ। বস্তুত এখন, জলেশ্বরীকে উদ্ভাবন করবার এত বছর পর, জলেশ্বরীর লাগোয়া একটি গ্রাম বুড়ির চরের পটভূমিতে *খাট্টা তামাশা* নামে নাটকটি লিখে ফেলবার পর, আমার মনে হচ্ছে জলেশ্বরী নিজেই যেন রক্তমাংসের একটি চরিত্র, জলেশ্বরী নিজেই যেন একটি এপিক, এবং এখনো এর অনেক কিছুই আমি লিখে উঠতে পারি নি, এই একটি জীবনে সব লিখে ওঠা সম্ভবও নয়।

এই জলেশ্বরীতেই এখন আমার প্রকৃত বাস; জলেশ্বরীর মানুষগুলোর সঙ্গেই এখন আমার প্রতিদিনের ওঠাবসা; ভূগোলের দিক থেকে নতুন কিছু যোগ করবার নেই জলেশ্বরীতে, ইতিহাসের এখনো অনেক সংযোজনই পরবর্তী প্রতিটি লেখাতেই করছে অপেক্ষা।

জলেশ্বরী নামটি উদ্ভাবন করি সচেতনভাবে নয়; ভেতরেই ছিলো একটি ছবি; ছবিটি আমার চিকিৎসক পিতার সহকারী কবিরাজ দেওয়ান খাঁর কাছে ছোটবেলায় শোনা এক পুরানকথার স্মৃতিবিভ্রম থেকে রচিত : নৌকোর ওপরে ভিজে পায়ের ছাপ, জলতল ভেদ করে স্বয়ং ঈশ্বরী একদিন নৌকোর পাটাতনে রাখেন তাঁর রাঙা পা, পাটনি তাঁকে চিনতে পারে না, যখন চিনতে পারে দেবী তখন অন্তর্হিত; জলের ঈশ্বরী থেকে জলেশ্বরী; পরে স্মরণ হয় বগুড়ায় আছে একটি এলাকা— জলেশ্বরীতলা; আবার, জলেশ্বরীতে হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবুদ্দিনের তিনশো বছর পুরনো মাজার স্থাপনের পর যে হিন্দু আর মুসলিম পুরানকথা এক হয়ে গেছে আমার উদ্ভাবিত এলাকায়— এখন তাকিয়ে দেখি এটাই হচ্ছে আমাদের বাংলারই বিশেষ এক বাস্তব, এভাবেই আমার বাংলা ও বাংলার মানুষ।

গল্প-উপন্যাসের গতিছন্দ

আমরা কত পাঠকের মুখেই না শুনেছি : অমুক বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। কিম্বা, তরতর করে পড়া যায়। অথবা, পড়তে খুব কষ্ট হয়— অর্থাৎ থেমে থেমে, যেনবা জোর করে পড়তে হয়। লক্ষ্য করি কি, গতির কথা বলা হচ্ছে? পড়বার গতি তো বটেই— ওটি বাইরের কথা; গতিটা হচ্ছে গ্রহণ করবার— গল্প বা উপন্যাসটিকে নিজের ভেতরে নেবার।

গল্প-উপন্যাসের একটা আয়তন আছে; কোনো কোনো গল্প এক বসাতেই শেষ করে ওঠা যায়, এমনকি ছোট বা মাঝারি মাপের উপন্যাসও; দীর্ঘ উপন্যাস একাধিক ও অনেক দিন ধরে পড়তে হয়— তা পড়লেও, একদিনের বা এক বৈঠকের পড়া শেষ করে উঠলেও পরের বৈঠকে আবার সেই আগের দিনের আগের বারের গতিতেই আমরা পড়ে চলি; যদি প্রথমেই ধীর ছিলো তো পরেও ধীর, প্রথমেই তরতর করে তো পরেও তরতর করে— এমনও হয়, শুরুতে তরতর করে পড়ছিলাম, পরে যতই এগোচ্ছি ততই গতিটা কমে যাচ্ছে দেখছি; এটা হতে পারে ক্রমেই উপন্যাসটি জটিল মনে হচ্ছে বলে, কিম্বা আর স্বাদু মনে হচ্ছে না বলে, অথবা উপন্যাসটি এতই ভালো লাগছে যে তারিয়ে তারিয়ে পড়ছি এবার, অর্থাৎ গতি কমিয়ে।

এই গতির ব্যাপারটা বোঝার আগে আরেকটা দিকে নজর দিই। গল্প-উপন্যাস চিত্রকরের আঁকা ছবি নয়, ক্যামেরায় তোলা ফোটো নয় যে এক দৃষ্টিপাতেই সবটা চোখে পড়লো— তারপর না হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সে ছবি বা সে ফোটো। গল্প-উপন্যাস ভাষায় লেখা; লেখার এই শারীরিক কারণেই লাইনের পর লাইনে তার ভাঁজ খোলে, একটু একটু করে খোলে, একটুএকটু করে আমাদের অধিকারে আসে। একেবারে শেষ পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত আমরা ভাষার এই শিল্পকর্মটি অধিকারেই পাই না। চিত্রকরের আঁকা ছবি বা ক্যামেরায় তোলা ফোটো একবার তাকিয়েই ভালো না লাগলে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি, অন্য ছবিতে যেতে পারি। গল্প-উপন্যাস পড়বার বেলাতেও এটি ঘটতে পারে— কয়েক লাইন বা কয়েক পাতা কি আধখানা পড়েই আমরা ছুড়ে দিতে পারি; কিন্তু এখানে একটি অবিচার করা হয়— লেখকের প্রতি তো বটেই, নিজের প্রতিও। কারণ, ওই যে ভাষায় লেখা লিপি লাইনে লাইনে ভাঁজ খোলে, সবটা না পড়ে বোঝারই উপায় নেই শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, তাই মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়াটা সুবিচারের হয় না মোটেই।

কোনো কোনো গল্প-উপন্যাস আমাদের হিড়হিড় করে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে চলে, কোনো কোনোটি বা হাত ধরে— যেনবা অন্ধকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মতো সাবধানে ও ধীরে। লেখার এই গতিটা কিন্তু নির্ধারণ করে দেন লেখকই তাঁর কলম ধরে। আর কলমটা গল্প-বুনোটের যতটা নয়, তারচেয়ে বেশি গল্পটা বলবার ধরনেরই বটে। এই ধরনটা লেখক নির্ণয় করে নেন শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠকের মনে কী ভাব কী ছাপ রেখে যেতে চান। এই ধরনের ভেতরে আছে গল্পটা বলবার কারণ— লেখক যে-কারণে লেখেন এই বিশেষ গল্প। তবে, এখানেই পরিষ্কার রাখা দরকার যে, গল্প বলতে যেন কেবল ঘটনার পর ঘটনাই আমরা না বুঝি, গল্পে ঘটনা অণুমাত্রও থাকতে পারে; আসলে, গল্প হচ্ছে মানব আচরণের গভীরে লুকিয়ে থাকা কারণ ও সৃষ্ট চরিত্র বা চরিত্রগুলোর বিবর্তনের ইতিহাস ও তাৎপর্য। এই অর্থে তবে গল্প বা উপন্যাস। আর এই গল্প-উপন্যাসটি বলবার ধরনটা যে লেখক স্থির করে নেন— যার ফলেই ওই গতির বিভিন্নতা— তা শুধু বর্ণনা উপস্থিত করার ভঙ্গিতেই

নয়, লিখিত বাক্যে— বাক্যেই বরং গড়ে ওঠে। এমনকি পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ রচনা, সংলাপ থাকা বা না-থাকাতেও এটা সম্পন্ন হতে পারে।

আমি যখন আমার *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* উপন্যাসটি লিখি, সেই ১৯৭৪ সালে, ধরনটা স্থির করে নিই এমত যে, এতে কোনো পরিচ্ছেদ বিভাগ থাকবে না, অনুচ্ছেদ বিভাগ থাকবে না, সরাসরি সংলাপ থাকবে না, এমনকি চরিত্রগুলোর মনের ভেতরকার কথাগুলোও থাকবে না; স্থির করি লিখে যাবো একটানা— প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটিই অনুচ্ছেদ মাত্র, বাক্যের গঠন হবে জটিল অন্বয় সম্বলিত। আমি সচেতন ছিলাম যে, এর ফলে উপন্যাসটি তরতর করে পড়া যাবে না, ধীরে অতি ধীরে পড়তে হবে, কিছুক্ষণ পর ক্লান্তিকর ঠেকবে, পাঠকের অবসন্নতা আসবে— আর এ সবই ছিলো আমার অভিপ্রেত। কেন? কারণ, আমি চেয়েছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের পরপরই একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদ জলেশ্বরীর ভেতরে পাঠককে স্থাপন করতে, ধ্বংস ও মৃত্যু মথিত স্তব্ধতা ও বিমূঢ়তার ভেতরে পাঠককে বসবাস করাতে।

এ কারণেই, গতির ওই ধীরতা আমার কাছে জরুরি মনে হয়েছে। আবার এমন উপন্যাসও আমি লিখেছি— *নীলদংশন* বা *দূরত্ব*— যা তরতর করে পড়ে যাবার মতো। এই দ্রুতপাঠও আমার অভিপ্রেত ছিলো। আমি চেয়েছি একটি মন্ডলের ওপর দিয়ে পাঠককে দ্রুতপাখায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে, এবং পাঠশেষে— যেনবা মাটিতে নেমে এসে— যাত্রাপথ ও মানচিত্রটির কথা পাঠককে ভাবাতে।

পাঠ গতির এই কাজটা কবি তাঁর কবিতায় পারেন একটি উপায়ে— ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত, কিম্বা গদ্যে লেখা মুক্তছন্দ— তাল মানের কারণেই গতিটা প্রায় নব্বইভাগ বেঁধে দেয়। বাকি যে দশভাগ থাকে— গতির যে ঈষৎ হেরফের, তা কবির ওই প্রচলিত ছন্দকেই নিজস্ব তারে বাঁধবার জন্যে। যে কারণে কাশীরামের *মহাভারতের কথা অমৃত সমান* আর রবীন্দ্রনাথের *পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে*— একই পয়ার পঙ্‌ক্তি একই চোদ্দ অক্ষরের হয়েও একই গতিতে পড়ে ওঠা কিছুতেই যায় না। রচনা পাঠের গতিটা একজন কবি একেক ছন্দে কী সহজেই বেঁধে দিতে পারেন, যেমন মনে এলো ছ'টি কবিতার একেকটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে দেখি :

১. *হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে*
২. *কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল*
৩. *মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে*
৪. *কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি কালো যারে বলে গাঁয়ের লোক*
৫. *মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি*
৬. *জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলে তাকে শাপ দিলেন প্রভু*

দেখতে পাবো এর একেকটি পঙ্‌ক্তি একেক গতিতে পড়ছি— কারণ ছন্দটাই একেক রকম। গল্প-উপন্যাস লেখকের নেই এই সুবিধে— ছন্দের সুবিধে। গতি তাকে

নির্ধারণ করে নিতে হয় বিষয় বুঝে, বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে, শেষ অবধি পাঠককে দিয়ে কতটা তিনি খাটিয়ে নিতে চান তাঁর গল্প-উপন্যাসের মর্মে পৌঁছুতে— তার ওপরে। সব লেখকেরই একটা মেজাজ থাকে, যেমন থাকে সব গৃহস্থেরই। কোনো গৃহস্থ অতিথিকে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢোকান, কেউবা মৃদু হেসে, কেউবা কলরব করে উঠে। নেমতন্নবাড়ির আলোকসজ্জা কোনো গৃহস্থের উজ্জ্বলই পছন্দ, কেউবা নরোম আলোতেই রচনা করেন স্বাগতম। লেখকও তাই করেন। অতিথিরাও কেউ কলকল করে ঘরে ঢোকেন, কেউ সবিনয়ে প্রবেশ করেন, কেউ ইতঃস্তত করে। পাঠকেরাও ঠিক তাই। মৃদু বা নরোম আলো দেখে অতিথি যেন ফিরে না যান। কঠিন বা জটিল রচনা দেখে পাঠকও যেন মাঝপথেই লেখা ছুড়ে না দেন। সব লেখকই চান পাঠককে তাঁর অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে— তাঁর রচনা পাঠের গতি ধীর বা তরতর করে যাই হোক; এই কথাটা যেন ভুলে না যাই।

লেখার স্থান ও সময়

লেখার জন্যে একজন লেখকের কি আছে আদর্শ কোনো সময় ? আর সকল কাজের আছে বাঁধা সময়; ন'টা পাঁচটা আপিসে কাজ করেন চাকুরে, দোকানিকে দোকান খুলে বসতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে, দোকান বন্ধ করবারও নির্দিষ্ট সময় আছে তার; কিন্তু লেখকের ? আমাদের দেশে প্রায় সব লেখকের— এবং বিদেশেও অনেকেরই— আছে জীবিকা উপার্জনের অন্য কোনো পেশা; ফলে, তার জন্যে সময় ছেড়ে দিয়েই তাঁকে লেখার সময় করে নিতে হয়; জীবিকার প্রয়োজনে পেশাটি যতই লোভনীয়, মাননীয় এবং তৃপ্তিকর হোক না কেন, সকল খাঁটি লেখকের ক্ষেত্রেই পেশাটি 'দ্বিতীয়' কাজ ভিন্ন আর কিছু নয়, লেখাটাই 'প্রথম'।

রবীন্দ্রনাথ যদিও ছিলেন দ্বিতীয় কোনো পেশাহীন, চাকুরিহীন— যদিও তাঁকে অন্য কোনো পেশার পায়ে ন'টা পাঁচটা উৎসর্গ করে দিতে হতো না, আমরা জানি খুব কম সংখ্যক লেখাই তিনি রচনা করেছেন সন্ধ্যার পরে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে; তাঁর লেখার সময় ছিলো, প্রধানত, দিবাভাগে— ভোর থেকে সন্ধে অবধি।

জীবনানন্দ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; আমরা বিভিন্নজনের স্মৃতিকথা থেকে জানি যে কলেজের মধ্যাহ্ন বিরতিকালে তিনি ছুটে আসতেন ঘরে, একসারসাইজ খাতার পাতায় পেনসিল দিয়ে লিখে রাখতেন কলেজে পড়াবার কালেই তাঁর মাথায় হানা দেয়া পঙ্‌ক্তিগুলো, এমনকি সম্পূর্ণ একটি কবিতা; এবং পেশার পীড়ন শেষে, সন্ধ্যার পর, মধ্যরাত অবধি সেইসব পঙ্‌ক্তি ও কবিতাকে চূড়ান্ত রূপ দিতেন।

আমার প্রিয় বিদেশী লেখকদের একজন নিকোস কাজান্তজাকিস, তাঁর একটি লেখার সময়সূচী স্মরণ করি; প্রাচীন গ্রীক বীর ইউলেসিসের সঙ্গে একালের অভিজ্ঞতা, মাত্রা ও প্রাসঙ্গিকতা যুক্ত করে তিনি একটি বিশাল কাব্য, বস্তুত মহাকাব্য, রচনা করেন তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশ' তিনটি পঙ্‌ক্তিতে; কাজান্তজাকিস নিজেই জানিয়েছেন, এই লেখাটির জন্যে প্রতিদিন ভোর সাতটায় তিনি কলম ধরতেন, দু'ঘণ্টা লিখতেন, এবং বেলা ঠিক ন'টায় যেখানেই থাকতো কলম সেখানেই সেদিনের মতো রচনার ইতি টেনে পরদিন আবার ঠিক সেখান থেকেই শুরু করতেন রচনা।

আমার আরেক প্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে— যাঁর কাছে অনেক আমি শিখেছি— তিনি প্রধানত লিখতেন দুপুরবেলায়, একটানা সন্ধেরাত অবধি; যৌবনে তিনি রাত জেগে লিখতেন সত্য, কিন্তু অচিরেই তিনি লক্ষ করেন, তাঁর রাতের রচনা দিবাভাগের রচনার তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে; এর কারণও তিনি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, রাত আমাদের দেবার সময় নয়, নেবার সময়, অতএব রাত হচ্ছে পড়াশোনার জন্যে প্রশস্ত; হেমিংওয়ে বিশ্বাস করতেন, একজন লেখকের পড়াটা তাঁর লেখার সমান জরুরি কাজ।

মানিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন চব্বিশ ঘণ্টার লেখক, লেখাই ছিলো তাঁর একমাত্র কাজ; তাঁর বন্ধুদের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জেনে যাই, তিনি দিন ও রাতের যে-কোনো সময়ে যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিবিষ্ট হয়ে লিখে যেতে পারতেন। বিমল মিত্রের কথা শুনেছি— আর লোকে যেমন চাকুরি করতে আপিসে বেরিয়ে যায়, তিনিও সকালবেলা স্নান ও খাওয়া দাওয়া সেরে দশটার মধ্যে হাজির হতেন লাইব্রেরিতে এবং একটানা পাঁচটা অবধি লিখতেন, তারপরে আর একটি বাক্যও লেখা নয়, ঘরে ফিরতেন লোকে যেমন আপিস থেকে ফেরে। বুদ্ধদেব বসু যতদিন অধ্যাপনা করেছেন, লিখতেন কেবল রাতের বেলায়, তাঁর লেখার অনেক রাতই ভোরের সূর্যোদয় দেখতো। টি এস এলিয়ট জানান নি তাঁর কবিতা লেখার সময় ছিলো কোনটি; তবে, তাঁর প্রবন্ধ কবিতার চেয়ে কোনো অংশে কম সৃজনগুণ সম্পন্ন বা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এইসব প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন নিয়ম করে ও ন'টা পাঁচটার সময়সীমার ভেতরে।

এমন একটা সময় ছিলো যখন লেখার কোনো বাঁধা সময় ছিলো না আমার; সকালে একটু দেরি করে উঠতাম ঘুম থেকে, উঠেই লেখা নিয়ে বসতাম। আমার তখন একটি কৌশল ছিলো, রাতের মতো যখন লেখা শেষ করতাম, কখনোই করোটির ভেতরে তৈরি সব কথা লিখে ফেলে নিঃশেষিত আমি ঘুমোতে যেতাম না, কিছুটা হাতে রেখে দিতাম, যেন পরদিন লেখা শুরু করতে কলম হাতে বসে থাকতে না হয়। তারপর সারাদিন চলতো আমার লেখা, কখনো কোনো রেস্তোরাঁয়, কখনোবা কোনো আপিসে, কোলাহল আমাকে বিচলিত করতো না, বরং চারদিকের চেনা-

অচেনা মুখ ও তীব্রশব্দই যেন আমার চারপাশে তৈরি করে রাখতো অদৃশ্য এক দেয়াল যার ভেতরে আমি লেখক হিসেবে ঘটমান। তারপর সন্ধের আড্ডা, সন্ধে গড়িয়ে অনেক রাত; তারপর টলমল পায়ে ঘরে ফিরেই আবার বসে যেতাম লিখতে; রাত দু'টো তিনটের সময় ঘুমে ভেঙে আসতো চোখ; লেখার একেকটি দিন আমার এভাবেই শেষ হতো।

তখন যে-কোনো স্থানই ছিলো আমার জন্যে লেখার আদর্শ স্থান, যে-কোনো সময়ই ছিলো লেখার অনুকূল সময়। তারপর লন্ডনে যখন জীবনের প্রথম একটি নিয়মিত চাকুরি নিয়ে বিবিসিতে আমি, দিনেরবেলায় লেখা আর সম্ভব হতো না, লিখতাম দিন শেষে ঘরে ফিরে নিজহাতে রান্না এবং ধোয়ামোছা সেরে রাত দশটা এগারোটার দিকে; লেখা চলতো ভোররাত অবধি; দিনেরবেলায় লেখা হতো না সত্যি, তবে আমার বাসা থেকে আপিসে ট্রেনে যেতে আসতে লাগতো মোট দু'ঘণ্টার মতো সময়; এই সময়টা করোটির ভেতরে কাজ চলতো, দ্রুতধাবিত ট্রেনের শব্দ আমার ভেতরে প্রবল অস্থিরতা হয়ে বাজতো অবিরাম, মনে মনে আমি রচনা করে যেতাম পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি, যদি কিছু দাঁড়িয়ে যেতো, তবে আপিসে ঢুকেই সেটা লিখে রাখতাম কাগজে; অচিরেই এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, ট্রেনের এই শব্দ, এই ভিড়, এই ধাবন— এ ভিন্ন আমি যেন আর উত্তেজিতই হতে পারছি না সৃষ্টির বীজ ঢালবার জন্যে; এভাবেই, প্রায় সবটাই ট্রেনে এবং মনে মনে, উনিশশ' পচাত্তর সালে আমি লিখে ফেলেছিলাম *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*।

লন্ডনের পাট উঠিয়ে ঢাকায় ফিরলাম; ছোট, খুবই ছোট একটি বাড়িতে এসে উঠেছি; শোবার ঘর বলতে আমার আলাদা কিছু নেই— বসবার, শোবার ও লিখবার ঘর বলতে একটাই; দিনে যে লম্বা সোফায় বসে বই পড়ছি, আড্ডা দিচ্ছি, রাতে সেখানেই লম্বমান হচ্ছি ঘুমের জন্যে, সোফার পাশে ছোট একটি টেবিল, কোনোমতে আমার টাইপরাইটার বসতে পারে এতটাই ছোট; এই ঘরে অধিষ্ঠিত হয়ে আবার আমি ফিরে পাই আমার লেখক জীবনের প্রথম-আমিকে; দিন ও রাত এক হয়ে যায়; এখন আর রেস্তোরাঁয় বসে লিখি না সত্যি, ঘরেই লিখি— ভোর থেকে মধ্যরাত অবধি। এই লেখার ফাঁকে ফাঁকেই চলছে সংসারের সকল কাজ; অবলীলায় আমি সংসার ও সৃষ্টির ভেতরে চলাচল করছি; লিখতে লিখতে সাংসারিক তত্ত্বাবধান সেরে নিচ্ছি, সাংসারিক কাজের ভেতরেই হাতের লেখাটির নতুন কোনো বিদ্যুতে স্পৃষ্ট হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যাচ্ছি টেবিলে, বা টেলিফোন ধরছি, বন্ধু এলে লেখা সরিয়ে মেতে উঠছি আড্ডায়, তারপর আবার যখনই হচ্ছি একা, আবার কী অনায়াসে শুরু করতে পারছি আগের অসমাপ্ত বাক্যটি থেকে, যেন মাঝখানে ঘটে নি কোনো ছেদ কিংবা বিঘ্ন।

হঠাৎ সব বদলে যায় একদিন; আমার হৃদযন্ত্রের অবস্থাদৃষ্টে চিকিৎসক কড়া হুকুম করেন— রাত জাগা চলবে না, ঘুমোতে যেতে হবে দশটার ভেতরে, মনের

ভেতর থেকে সকল উদ্বেগ দূর করতে হবে, এবং যেহেতু টাইপরাইটারে লিখি, তাই আঙুল ও হাতের ওপরে যে চাপ পড়ে সেটা বুকের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, অতএব ওটা বন্ধ করতে হবে; একটানা একঘণ্টার বেশি লেখা চলবে না, অন্তত পনেরো মিনিটের বিশ্রাম নিতেই হবে একঘণ্টা লিখলে।

রাত না হয় নাই জাগলাম, মন থেকে উদ্বেগ দূর করবো কীভাবে ? আর করবোই বা কেন ? আমার বিশ্বাস, আমাদের ভেতরকার উদ্বেগই আমাদের করে তোলে লেখক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, চিত্রকর। পৃথিবীর সব সৃষ্টিই অস্থিরচিত্ত এবং উদ্বিগ্ন হৃদয়ের কাজ বটে। মনকে প্রশান্ত করবার জন্যে যোগসাধনা সমেত কত পন্থার কথা আমরা শুনি; সেই যোগসাধক ও শিক্ষকদের জিগ্যেস করতে আমার সাধ হয়— আপনার প্রবর্তনা ও প্ররোচনায় মন হলো প্রশান্ত, কিন্তু তারপর ? এই প্রশান্ত মনটি নিয়ে কী করবো ? আমার মন অশান্ত বলেই জগতকে আমি ভেঙেচুরে অন্যরকম করে তুলতে চাই; যোগধৌত মনটি কেবল আমার চারদিকে যা আছে যেমন আছে সেসবই মেনে নেবার জন্যে আমাকে প্রশান্ত করে রাখবে; তারচেয়ে দিন আমাকে ভ্যান গ'র অস্থিরতা, রবীন্দ্রনাথের চঞ্চলতা, হেমিংওয়ের পরিব্রজ্যা, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

টাইপরাইটারে লিখলে হাতে ও বুকে চাপ পড়ে, তার জন্যে ভাবনা কী ?— কলমে লিখবো, কিংবা কলমের তুল্য সামান্যই শ্রম হয় এমন অন্য যন্ত্রে লিখবো, যেমন এখন আমি কম্পিউটারে লিখি। কিন্তু একঘণ্টা লেখার পর পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিতেই হবে— সেটা নিকোস কাজান্তজাকিস হয়তো পারেন— আমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি যখন লিখি তখন একটা সময়ের পর লেখাই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, লেখাই আমাকে থামতে দেয় না।

তবে, রাত না জাগবার পরামর্শটি মেনে নেয়া সহজ দেখতে পাই; অচিরেই আমি রাতে আর লিখিই না বলতে গেলে, কিন্তু তবুও একটি লেখা যখন আমাকে অধিকার করে নেয়, রাতও জাগি, যেমন এই সেদিন আমার *খাট্টা তামাশা* নাটকের শেষ পর্যায়ে এসে পরপর দু'টি রাত একেবারেই না ঘুমিয়েই একটানা লিখে গিয়েছি।

না, লেখার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। লেখা আর লেখক— এ দু'য়ের মাঝখানে আছে বিশাল পরিশ্রমের খরস্রোতা এক নদী: এই নদী পাড়ি দিতেই হয়, দিনে ও রাতে, দিন ও রাত এক করে, দিন ও রাতের সবটুকু দান করে; লেখা মানে তো অবিরাম কলম বা লিখনযন্ত্রের চালনা নয়, লেখা মানে একইসঙ্গে লেখা ও না-লেখা, না-লেখা মানে শূন্যতা নয়, না-লেখা মানে করোটির ভেতরে লিখে যাওয়া, ভাবা, ভাবা এবং ভাবা, এই ভাবাটিও লেখা।

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালে ঢাকায় এসে কলেজিয়েট ইশকুলে ভর্তি হয়ে বাংলার শিক্ষক হিসেবে পেলাম সুকুমারবাবুকে; এই ইশকুলেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর ছাত্র ছিলেন বলে বড় গৌরব করতেন তিনি; তাঁর পদবীটি এখন আর মনে নেই, ইশকুলের পুরনো খাতা থেকে হয়তো দেখে নেয়া যায়, কিন্তু জীবনের সব বিস্মৃতি খণ্ডাতে নেই বলেই সে খোঁজ আর নিই নি। তখন পদ্যের ধাঁচে পদ মেলাবার চেষ্টা করতাম ছুটির দীর্ঘ মধ্যাহ্ন আর অপরাহ্নগুলোতে, সেই সুবাদে আমার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু আমাকে কবি বলে ডাকতেন, এখনো তারা ডাকেন— ব্যাংকার শামসুল আলম, বৈমানিক মোহাম্মাদুল আমীন, স্থপতি নাজির চৌধুরী, শিক্ষক মোতাহার হোসেন; তাঁদেরই মারফৎ সুকুমারবাবু একদিন আমার 'কবিখ্যাতি'র সংবাদ পেয়ে গেলে তাঁর কাছে আমি তিরস্কৃত বা উপহসিত হবার ভয়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ি। আমাকে অবাক করে দিয়ে সুকুমারবাবু সস্নেহে আমার মাথায় হাত রাখলেন, এবং তার চেয়েও বড়— যেটি আমার এই দীর্ঘজীবনে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ গুটিকয় উপদেশের একটি বলে মনে করি— আমাকে তিনি বললেন, 'লেখার কাজ ছুতোরের মতো, কাঠ চিনতে হয়, জোড় জানতে হয়। লেখার চেষ্টা পরে, আগে রবীন্দ্রনাথের *বাংলাভাষা-পরিচয়* বইটি পড়ো, তাঁর ছন্দের বই পড়ো, তবে তো লেখা।'

বইটি জোগাড় করা খুব সহজসাধ্য হয় নি। সেকালে ঢাকায় বইয়ের দুটো বড় দোকান ছিলো সদরঘাট এলাকায়— দেবসাহিত্য কুটির আর আশুতোষ লাইব্রেরি; আশুতোষে অর্ডার দিয়ে *বাংলাভাষা-পরিচয়* সংগ্রহ করেছিলাম, ততদিনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা এসে গিয়েছে, তার মধ্যেই ঢাকায় হয়ে গেলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সেসব উজিয়ে, পরীক্ষার পর দীর্ঘ তিন মাসের ছুটিতে বইখানা পড়ে ফেললাম। স্বীকার করবো, তখন এ বইয়ের অনেক কিছুই বুঝি নি, যদিও রবীন্দ্রনাথ বইখানা লিখেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করেই; কিন্তু একটা জিনিশ বুঝেছিলাম, সাহিত্যে ভাষার কাজ জানানোর চেয়ে জাগ্রত করা, আর আবছা করে বুঝেছিলাম বাংলাভাষার গতিপ্রকৃতি চরিত্র চলন কেমন। সেই বোঝাটা সচেতনভাবে আমার লেখায় প্রতিফলিত হতে সময় যে বছর কুড়ি লেগে যায়, সেটা রবীন্দ্রনাথের দূর্বলতা নয়, আমারই অক্ষমতা।

রবীন্দ্রনাথের *বাংলাভাষা-পরিচয়* বাংলাভাষার নবীন লেখকদের জন্যে অবশ্যপাঠ্য বলে আমি মনে করি; বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্য পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, আমাদের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের হাতের কাছেও বইটি থাকলে ভাষাগত এবং প্রকাশগত অনেক লজ্জাস্থল থেকে তাঁরা নিষ্ক্রান্ত হতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি ধরন ছিলো; ভাষা বা ছন্দ বোঝাবার জন্যে তিনি এমন সব উদাহরণ রচনা করতেন যা আর নিছক উদাহরণ থাকতো না, সাহিত্য হয়ে উঠতো।

বাংলাভাষা-পরিচয় বইটির একেবারে শেষদিকে চলতি গদ্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি একটি অনুচ্ছেদ লেখেন, হয়ে দাঁড়ায় একটি অণু-গল্প; এবং যদিও এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প-সংকলনেই গৃহিত হয় নি, যদিও এর উল্লেখ আমি রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনায় কোথাও দেখি নি, আমি মনে করি এটি রবীন্দ্রনাথের এবং বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ একটি গল্প। পুরোটাই উদ্ধৃত করছি :

কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মেরজাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভরু সর্দার। টেমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেন্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুঝি দেখা গেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝমাঝম্ বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাল্কি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিখিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, 'দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।' দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকরুন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে দুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিনু বিনু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুন্দ রইল তার সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িতে, রুমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চুপ। মেলগাড়ি কখন গেল বেরিয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই।

মুকুন্দ কেন মুখ লুকোলো রুমালে ? বিনোদিনীর সঙ্গে কী হয়েছিলো তার ? কতটা গোপন সে কাহিনী ? গিন্নীঠাকরুন জানতেন না বোঝাই যাচ্ছে, কুঞ্জবাবুও কি জানতেন না ? তিনি যখন তীর্থে যাচ্ছেন তাঁর ভাই মুকুন্দ তখন সেই যাত্রাতেই মোহনবাগানের ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছে, এ কথা তিনি জানতেন না, নইলে মুকুন্দর ইস্টিশান অবধি যাবার কথা প্রথমে বলা হলো কেন ? ভিখিরির মতো স্টেশনে ঘুরছে বিনোদিনী কতকাল থেকে ? এর আগেও কি মুকুন্দ খেলা দেখতে ট্রেন ধরে নি ? ইস্টিশানে আসে নি ? বিনোদিনীর সঙ্গে তার দেখা হয় নি ? কুঞ্জবাবু স্বয়ং বিনোদিনীকে ডাকতে শুরু করলেন, এতে কি বোঝা যায় না মেয়েটির প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ এবং যা ঘটেছে তার জন্যে বেদনা ? ওই যে মুকুন্দ মুখ লুকোলো, সে কি লজ্জায় ? অপরাধবোধে ? না, বড়ভাইয়ের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্যে ?— এমনি কত প্রশ্ন আমাদের ভেতরে

শ্বসিয়ে ওঠে; এর উত্তরে আমরা নিজেরাই একটি গল্প তৈরি করে নিতে থাকি মনে মনে, যতবার পড়ি নতুন একেকটি সংকেত পাই আর নতুনতর হয়ে ওঠে গল্পটি।

গোপন অভিজ্ঞতার প্রকাশ্য দীর্ঘশ্বাসের মতো, ভাসমান হিমবাহের এক অষ্টমাংশ চূড়ার মতো, গোষ্পদে বিম্বিত মহাকাশের মতো রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি অণু-গল্পের সর্বোচ্চ একটি আদর্শ হয়ে আছে তাঁরই রচনাবলীর বিপুল পৃষ্ঠার ভিড়ে।

অনুবাদ

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এশিয়া মহাদেশের লেখকদের সম্মেলনে একটি অধিবেশনে আমাকে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়; অধিবেশনটি ছিলো সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে; আলোচনার কাঠামো ছিলো একটি প্রশ্নের আকারে : অনুবাদ কি কেবল ভাষার ব্যাপার না সংস্কৃতিরও বটে ?

মার্কিন একজন লেখক টার্কি বা বনমোরগের চমৎকার উপমা দিয়ে বললেন, 'অনুবাদ হচ্ছে সিঙ্গাপুরের টার্কি রোস্টের মতো। আমি আর আমার স্বামী একবার গেছি সিঙ্গাপুরে। সেখানে থাই আর চাইনিজ খাবার খেয়ে খেয়ে যখন হেঁদিয়ে পড়েছি, তখন একদিন রেস্তোরাঁর মেনু ঘেঁটে বের করলাম টার্কি রোস্ট, দিলাম অর্ডার। আপনারা জানেন, আমরা মার্কিনীরা টার্কি রোস্ট করি, বিশেষ করে বড়দিনে খাই, খুব মজা করে খাই। ভাবলাম, অনেকদিন পর নিজের দেশের একটা রান্না খাবো। চলে এলো টার্কি আমাদের টেবিলে। ছুরি কাঁটা দিয়ে কেটে আমরা হাঁ করে পাঠালাম মুখের গহ্বরে। কিন্তু এ-কী! হা, খৃষ্ট! এ যে পুরোপুরি চীনে স্বাদ, চীনে রান্না।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'অনুবাদে ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। মার্কিন টার্কি হয়ে যায় সিঙ্গাপুর টার্কি। মোরগটা ঠিকই থাকে, স্বাদটা ভিন্ন হয়ে যায়। আর স্বাদটা ভিন্ন হবার কারণে জিনিশটাই ভিন্ন হয়ে যায়। দুটোই যদি সমান উপভোগ্য হয়, তাহলে ভালো। কিন্তু যদি দেখা যায়, উপাদানের সঙ্গে মশলাটা ঠিক মিলছে না, স্বাভাবিক লাগছে না, তখন যিনি মার্কিন টার্কি রোস্ট মূলে জানেন তিনি বলবেন— এটা তো সেই জিনিশ নয়! আর যাঁর আদৌ পরিচয় নেই মূল টার্কি রোস্টের সঙ্গে তিনি বলবেন— হ্যাঁ, এ বেশ মন্দ নয়! বলার দরকার নেই যে, সাহিত্যে *মন্দ নয়* কথাটা মূল্যহীন, সাহিত্যে চাই— চমৎকার! চাই— এইতো!'

কোরিয়ার বক্তা, তিনি কবি, বললেন, 'অনুবাদ চাইই চাই, ভালো হোক কি মন্দ হোক। যে-ভাষা আমি জানি না, অনুবাদ ছাড়া তার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার

কোনো উপায়ই যে নেই।' তবে এই বক্তার মূল কথা ছিলো, 'প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ব্যবধান অনেক। এই ব্যবধান আমাদের কমিয়ে আনতে হবে।' কী করে কমানো যাবে? ভদ্রমহিলার প্রস্তাব, 'প্রাচ্যের লেখকেরা বেশি করে পাশ্চাত্য পুরাণ ও প্রতিমা ব্যবহার করবেন, আর পাশ্চাত্যের লেখকেরা প্রাচ্যের পুরাণ ও প্রতিমা।'

প্রস্তাবটি অভিনব সন্দেহ নেই, তবে অস্বাভাবিক বটে; সৃষ্টিশীল ব্যক্তির কল্পনার শেকড়, বিশেষ করে ভাষা মাধ্যমে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের, আপন সংস্কৃতির মাটিতে ও পুরাণ এবং প্রতিমায় বটে। অতএব, শ্রোতাদের ভেতর থেকে প্রতিবাদ উঠলো ঝড়ের বেগে। সিঙ্গাপুরের এক ক্ষ্যাপা কবি লাফিয়ে উঠে দু'হাত নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ কাজ আমরা প্রাচ্যের কবিরা বহুদিন থেকেই করছি, পাশ্চাত্যের পুরাণ ও প্রতিমা কবিতায় লাগাচ্ছি, কিন্তু পাশ্চাত্যের কবিরা এতই আত্মগর্বী ও অন্ধ যে তাঁরা আমাদের প্রাচ্যের কোনো কিছুই নিজেদের লেখায় ব্যবহার করেন নি ও করেন না।'

মার্কিন এক কবিও উঠলেন লাফিয়ে; বললেন, 'কক্ষনো নয়। এজরা পাউন্ড সাক্ষী। গ্যোয়েটে সাক্ষী। এলিয়ট সাক্ষী।' তালিকা দীর্ঘ হতে যাচ্ছিল, বাধা পড়লো তুরস্কের এক লেখকের ধমকে। ভদ্রলোক সম্প্রতি তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেছেন জেমস জয়েসের *ইউলেসিস*; চার বৎসরের একটানা অনুবাদ-পরিশ্রমে ক্লান্ত তিনি ভারী দেহটিকে টেনে তুলে হুইস্কি মথিত কণ্ঠে বললেন, 'এ সব কী হচ্ছে? আমি যদি ঈশ্বর হতাম, পৃথিবীতে একটাই ভাষা করে দিতাম, একটাই সংস্কৃতি, তাহলে এই ছেলেমানুষি ঝগড়া আমাকে শুনতে হতো না।' তারপর সুস্থির হয়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বর তো একটা ভাষা গোড়াতেই আমাদের দিয়েছিলেন। পুরাণে পড়েন নি? ব্যাবেলের মিনারে বসে আমরা ঝগড়া করে ভাগ হয়ে গেলাম, অনেকগুলো ভাষা হয়ে গেলো চোখের পলকে, কেউ আর কারো কথা বুঝতে পারলাম না। সে যাক, অনুবাদ সাহিত্য সবসময়ই বিশেষ পাঠকের সাহিত্য। বিশেষ পাঠক হতে গেলে বিশেষ জ্ঞান ধরতে হবে। মূল ভাষার বই অনুবাদে পাঠ করবার আগে সেই ভাষার সংস্কৃতি ইতিহাস ভূগোল পুরাণ সমাজ সব আমাদের কিছু কিছু তো জানতেই হবে। এই যে আমাদের সভাপতি, তিনি বাংলাদেশের, তাঁর দেশের বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না, এখন তাঁর দেশের একটা উপন্যাস পড়বো দেশটি সম্পর্কে না জেনেই, এবং দাবি করবো কেন সড়গড় বুঝতে পারছি না, তা তো হয় না!'

তখন মালয়েশিয়ার এক তরুণী চেঁচিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আরে, এটাই তো সাহিত্যের একটা বড় কাজ। সাহিত্য পড়ে একটা অজানা দেশ ও তার সংস্কৃতি যতখানি আবেগের ভেতরে নেয়া যায়, ইতিহাস বা প্রবন্ধ পড়ে তা কখনোই সম্ভব হয় না।'

লেখা শুরু করার বয়স

একটি সরল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি আমাকে প্রায়ই হতে হয়, কশ্চিৎ পত্রমাধ্যমে, প্রায়ই নেমতন্ন বাড়িতে অতিথিদের মুখে : লেখা শুরু করবার কোনো বয়স আছে কিনা ? এ প্রশ্ন করে থাকেন তাঁরাই, এখন যৌবন যাঁদের আর নয়। আসলে, আমাদের জনপ্রিয় একটি ধারণা এই যে, লেখা শুরু করবার বয়সই হচ্ছে কৈশোর, সেই কৈশোরে শুরু করলেন তো হলো, নইলে এ জীবনে আর নয়; আর এই ধারণার শেকড়ে আমাদের ভুল যে অনুমানটি আছে তা হলো, লেখা কিছু শেখার বিষয় নয়, লেখা কারো কারো ওপর ভর করে মাত্র, একজন লেখক নিতান্ত দৈবের অনুগ্রহেই লেখক হন এবং দৈব সে অনুগ্রহ কখন কাকে করবে তার কোনো ঠিক নেই।

বৎসরের পর বৎসর এ যাবত শতাবধি ব্যক্তিকে আমি আশ্বস্ত করেছি যে, বয়স আপনার যাই হোক, বলবার মতো আপনার যদি কিছু কথা থাকে এবং সেই কথাটি দশজনের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যায় বলে যদি আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, তাহলে লেখক হবার পথে আপনি তো দাঁড়িয়েই আছেন; অতঃপর আপনাকে কেবল দুটি কাজ করতে হবে : কাগজ কলম কেনা, আর কাগজের সমুখে কলম হাতে বসে পড়া।

কিন্তু আমার এ উপদেশে সত্যি সত্যি কেউ লেখক হয়ে উঠেছেন বলে আজ অবধি একটিও খবর পাই নি, তার কারণ ওই দ্বিতীয় কাজটি— কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসে পড়াটা— শুনতে যতই সহজ মনে হোক, কাজে অত্যন্ত কঠিন। মনে মনে আমরা অনেকেই একটা আস্তমস্ত বই লিখে ফেলি বটে, কিন্তু কল্পনার সেই বইটি লেখার জন্যে যে বিপুল সময়, একাগ্রতা, ধৈর্য এবং পড়াশোনা চাই, জাগতিক বহুতর মজা উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন একা একটি টেবিলে— লিখুন বা নাই লিখুন— নিয়মিত বসে থাকবার যে মন ও মেরুদণ্ডের জোর চাই, তা আমাদের নেই। আমি বরং এইটেই দেখেছি, এ এক চমৎকার পরিহাস : যাঁদের কিছু বলবার আছে, ভাবি-ভাবি-লিখি-লিখি করে টেবিল পর্যন্তই তাঁরা যেতে পারেন নি, আর যাঁদের কথাটি দশজনের সঙ্গে ভাগ করে নেবার মতো আদৌ নয়, বিস্তর লিখছেন তাঁরাই।

না, লেখা শুরু করবার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই; বার্নার্ড শ' চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম নাটকটি লেখেন। আমি আমার প্রথম নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* লিখি উনচল্লিশ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন সত্তরে এসে। কমলকুমার মজুমদার তিরিশের আগে গল্প লিখতে শুরু করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে এটা ঠিক, লেখা শুরুর গড় একটা বয়স আছে : বোধহয় পনেরোই সেটি হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই বয়স পনেরোর দিকেই লিখতে শুরু করেছেন। আপনার যদি পনেরো পেরিয়ে গিয়ে থাকে, হতাশ হবার কিছু নেই। বুড়ো গাছেও ফল ধরে, গৃহস্থমাত্রেই জানেন, এবং সে ফল বড় মিষ্টই হয়।

একজন সত্তরেও যে তাঁর প্রথম লেখাটি লিখতে পারেন সে উদাহরণ আমাদের ঘরেই আছে; কৃষ্ণদাস সাতাশি বছর বয়সে কাব্যদেবীর সাক্ষাত পান প্রথম, দীর্ঘ ছ'বছর একটানা দিবারাত্র লিখে সমাপ্ত করেন তাঁর *চৈতন্য চরিতামৃত*, এবং অমর এ কাব্যটির রচনা শেষ করে পরিপূর্ণ তেরানব্বই বছর বয়সে তিনি চোখ বোঁজেন; আরো কয়েকটি বছর পেলে তিনি যে আরো একটি কাব্য লিখতেন এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য, *চৈতন্য চরিতামৃত*-এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাবার শোকে এই কবির 'অকাল' প্রয়াণ ঘটে; বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য পাণ্ডুলিপিটি পরে পাওয়া গিয়েছিলো।

উপন্যাস আর ছোটগল্প

পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, কথাটা এখন আর আমাদের চমকে দেয় না। চমকে উঠি যখন দেখি বাংলাদেশে উপন্যাসের পৃষ্ঠাসংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু দীর্ঘ হচ্ছে না ছোটগল্প। দীর্ঘ সে হতে পারে— যেমন, রবীন্দ্রনাথের *অতিথি* বা *নষ্টনীড়*। আমাদের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একজন যিনি সচেতন কলমেই দীর্ঘ বা বড়গল্প লিখেছেন। বাংলাদেশে এখন উপন্যাস নামাঙ্কিত যে কাহিনীগুলো বইয়ের দু'মলাটে ছাপা হয়, তার অধিকাংশই— এমনকি আমার নিজের অনেক রচনা সমেত— বড়গল্পই বটে।

বড় বা ছোটগল্পের বাজারটা ভারী অদ্ভুত। ছোটগল্প না হলে পত্রিকার সাধারণ সংখ্যা বা দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্য সাময়িকীর চলে না। কিন্তু বাজারে বই আকারে একেবারেই চলে না ছোটগল্পের সংকলন। প্রকাশকেরা তাই ছোটগল্পের বই ছাপতে চান না, এমনকি বড়গল্পেরও নয়। তাঁরা চান দু'মলাটের ভেতরে একটিই গল্প। ঈদ ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যা যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের ভেতরে প্রতিযোগিতা চলে কে ক'টি উপন্যাস দিতে পারছেন। ফলে, অধিক সংখ্যায় উপন্যাস ধরাতে গিয়ে লেখকেরা বাধ্য হন ছোট মাপের লেখা লিখতে। এর প্রায় সব কটিই আসলে উপন্যাস নয়— বড়গল্প। আমারও অনেক লেখা যা উপন্যাস নামাঙ্কিত হয়ে পত্রিকায় বেরিয়েছিলো, পরে তাদের যথাবিধি বড়গল্প বলেই সংকলিত করেছি— যেমন, আমার *যৌবন ও অন্যান্য জীবন* বইয়ে।

তবে কি শুধু পৃষ্ঠা সংখ্যার ওপরেই নির্ভর করে বিচার যে কোনটি উপন্যাস আর কোনটি বড়গল্প ? তা কী করে হয় ? নিছক শরীরের মাপেই যদি মানুষের ব্যক্তিত্ব আর মূল্য বিচার করা যেতো, তাহলে আর কথা কী ছিলো ?

উপন্যাসের দিকে তাকিয়ে দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা* এখনকার কম্পিউটার কম্পোজে ছাপলে আশি-নব্বই পৃষ্ঠার ওপরে যাবে না, কিন্তু এ উপন্যাসই। আবার অন্নদাশংকর রায়ের প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত *সত্যাসত্য* বা বিমল মিত্র-র আঠারোশ' পৃষ্ঠার *কড়ি দিয়ে কিনলাম*— এ দুটিও উপন্যাস। তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস* হাজার পৃষ্ঠার হয়ে উপন্যাস, হেমিংওয়ের *ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি* আশি পৃষ্ঠার হয়েও উপন্যাস। কাফকা-র *মেটামরফসিস* বাংলায় অনুবাদ করে শ'খানেক পৃষ্ঠার উপন্যাস বলে চালানো যায়, কিন্তু ওটি ছোটগল্পই, বড়জোর বড়গল্প। রবীন্দ্রনাথের *নষ্টনীড়* দু'মলাটে ছাপলে আজকের বাজারে উপন্যাস বলেই চালাতেন প্রকাশক, সমালোচকও অনেকেই একে উপন্যাস বলতে চেয়েছেন, কিন্তু লেখক স্বয়ং একে ছোটগল্পই বলেছেন; এবং তাঁর একই মাপের লেখা *চার অধ্যায়*-কে বলেছেন উপন্যাস। কোনটি তবে উপন্যাস আর কোনটিই বা ছোটগল্প ? অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে পৃষ্ঠাসংখ্যার মাপে এর বিচার হয় না। তবে কিসে হয় ?

আমার নিজস্ব একটি বিচার আছে। ছোটগল্প সেটাই, মাপে তা বড়গল্প হয়ে উঠলেও গল্প বলি তাকেই, যা এক বা একাধিক ঘটনার ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যায়, কিন্তু পাঠককে বা গল্পের চরিত্রগুলোকে গভীরে মৌলিক কোনো পরিবর্তনের সংকেত দেয় না, একটা অনুভব রেখে যায় মাত্র। ছোটগল্প শেষ হয়ে যাবার পর চরিত্র বা চরিত্রগুলোর আবার নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাবার কোনো বাধা দেখি না। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন এ নয়; এ বরং এক বিন্দু সিন্ধুই বটে।

অন্যদিকে, উপন্যাসে দেখি প্রধান চরিত্র বা চরিত্রগুলোর এমন সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাত্রা, যার ফলে তারা মৌলিকভাবে বদলে যাচ্ছে। এবং সেই বদলে যাওয়াটাই আমাদের কাছে চিরকালের হয়ে থাকছে। উপন্যাস শেষ হয়ে যাবার পর চরিত্রগুলোর আর কোনো নতুন সম্ভাবনা আমরা দেখি না। যা হলো, তাই। যা হয়েছে, সেটাই। উপন্যাসে আমরা একটি জগত ভ্রমণ করে আসি; এরপর আর কোনো জগতের প্রয়োজন হয় না।

উপন্যাসের একটি সামাজিক ও কালিক মাত্রা আছে; ছোটগল্পে সেটি ব্যক্তিক। উপন্যাসে আমরা চরিত্র এবং তার পটভূমির পরিচয় পাই, ছোটগল্পে কেবলই চরিত্রটিকে। উপন্যাস তাই অধিক পরিসর দাবি করে ছোটগল্পের তুলনায়। উপন্যাস আমাদের সিন্ধু দর্শন করায়। অনেকে উপমা দিয়ে বলেন, ছোটগল্প আঙটির হীরেটির মতো, উপন্যাস অলংকারের সমগ্র একটি সেট্।

উপন্যাসের বর্ণনা পরিসর নির্দিষ্ট নয় মোটেই, যেমনটা নাটকে; কারণ নাটক অভিনয়ের একটি সর্বোচ্চ সময়সীমা আছে বাস্তব কারণেই— এক থেকে তিন ঘণ্টা। উপন্যাসের লেখক বা পাঠক, কারো কাছেই বাস্তবের সেই সময়সীমা মোটেই জরুরি নয়। উপন্যাস আমরা এক বসা থেকে এক মাস কি তারও বেশি সময় ধরে পড়তে পারি। ছোটগল্প ফেলে রাখলে চলে না, এক বসায় না হোক, অন্তত দুটি বসায় তার পাঠ শেষ করাই চাই।

গল্প বলার ক্ষেত্রে মানুষ প্রথমে ছোটগল্পই রচনা করেছে। স্মরণ করতে পারি ঈশপের গল্প, জাতকের গল্প। মানুষ পরে অগ্রসর হয়েছে উপন্যাসে। আদিতে যে মহাকাব্যগুলো আমরা পেয়েছি— রামায়ন, মহাভারত, ইলিয়ড, অডিসি, গিলগামেশ— এক অর্থে এ সকল উপন্যাসই বটে। এ কেবল এ সকলের দৈর্ঘের জন্যে নয়, সমগ্র ও অখণ্ড একটি জীবনবোধ আমাদের দেয় বলেই এরা উপন্যাস।

লেখকের ক্ষমতা ও বিবেক

ক্ষমতা, বিবেক : এই দুটি শব্দ আজ কয়েক দিন থেকে আমার করোটিতে ফিরে ফিরে আসছে; এমত যখন আসে তখন ভেবে দেখতে হয়, ভেতরে কি কিছু কথা তৈরি হচ্ছে যা এখনো কোনো আকার ধরে উঠতে পারছে না ? অনেক রাত অবধি জাগছি, না কবিতা, না নাটক, না গল্পের কোনো চরিত্র এসে শব্দ দুটিকে অবলম্বন করছে। আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো, এতটা ভোরে যে তখনো শাদা সুতো থেকে কালো সুতোকে আলাদা করা যাচ্ছে না; তখন আমার মনে হলো, এই যে চেনা দুটি শব্দ— ক্ষমতা আর বিবেক— এই শব্দ দুটিকেই অভিধায় ভেবে দেখি না কেন ?

আমাদের এমন হয়, বানান করবার আগেই শুধু অক্ষরচিত্র দেখেই একেকটি শব্দ পড়ে ফেলি দীর্ঘদিনের অভ্যেসে; ঠিক একই অভ্যেসে আমরা শব্দ ব্যবহার করতে করতে হারিয়ে ফেলি শব্দের গভীরে শব্দটির অর্থ; এমন কত শব্দ আছে যার অর্থ আমরা ভালো করে না জেনেই ব্যবহার করি, এমন কত বিশেষণ আছে তলিয়ে না দেখেই প্রয়োগ করি— এমনকি কোনো অর্থ হয় না জেনেও।

যখন কোনো লেখাকে প্রশংসা অর্থে বলি 'ঝরঝরে লেখা' কিম্বা কারো লেখার হাতকে বলি 'ভারী মিষ্টি লেখা' তখন কি একবারও থেমে ভেবে দেখি কী অর্থ ওই মিষ্টি আর ঝরঝরের ? কিম্বা যখন বলি, দেশপ্রেম; আমরা সকলেই কি বুঝি দেশপ্রেমটা কী ? দেশ কি শুধুই মাটি ? নাকি মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষই প্রকৃত প্রস্তাবে ? এবং শুধুই কি মানুষ ? তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত তো আছে, তার মানে সেই মানুষটির ইতিহাসও তো বটে; এবং তার যে একটা সংস্কৃতি আছে তা নিয়েও তো মানুষ। তবে আছে দেশেপ্রেমের ভেতরে এতগুলো কথা।

বারান্দায় বসে আছি দীর্ঘক্ষণ, ক্ষমতা আর বিবেক এই শব্দ দুটি কোলে নিয়ে। রাত ভাঙছে, ভোর হচ্ছে, দু'একটি পাখি ডেকে উঠছে।

ক্ষমতা, এই শব্দটি কি কেবলি শক্তি বা বল অর্থে দাঁড়িয়ে আছে ? লক্ষ করি, ক্ষমতার ভেতরে ক্ষম্ আছে লুকিয়ে, আর এই ক্ষম্ আমাদের বলে দেয় সহনশীলতার

কথা, ক্ষম্ সহিষ্ণুতাকে নিয়ে; এবার তবে শব্দটি আমাদের সমুখে তার গভীরের অর্থটি মেলে ধরে— যে, শক্তি তো বটেই, সেই সঙ্গে সহিষ্ণুতা; সহিষ্ণু যে শক্তি, তারই শব্দরূপ 'ক্ষমতা'।

যখন আমরা রাজনৈতিক অর্থে ক্ষমতা শব্দটি ব্যবহার করি, যখন বলি ক্ষমতায় যাওয়া, যখন বলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, তখন আমরা কেবলি এক বিশেষ শক্তির কথা ভাবি, কিন্তু ভুলে থাকি ওই সহিষ্ণুতার সংকেতটুকু; আর সহিষ্ণুতা হচ্ছে এমনই এক গুণ যার জন্ম বিচার-বিবেচনা বোধ থেকে; যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা আমরা ভাববো, তখন এই বিচার-বিবেচনা বোধ মানবের সামগ্রিক এবং বিশেষভাবে আমাদের মাটির ইতিহাস ও সংস্কৃতি বাদ দিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

বিবেক : এই শব্দটি কত না হেলায় আমরা ব্যবহার করি অথবা ভুলে থাকি! হেলার ক্ষেত্র তো এই, অহরহ আমরা কাউকে না কাউকে বাংলার বিবেক বলে সম্বোধন করি। ভুলে থাকার ক্ষেত্র তো চোখের সমুখেই— রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক যে দিকেই তাকাই, দেখি ও আজও আমরা দেখেই চলেছি, কোনোখানে বিবেকবোধ নেই।

বিবেক শব্দটির ভেতরে আছে বিচার-বিবেচনার সংকেত। কিসের বিচার-বিবেচনা ? ভালো-মন্দর, ন্যায়-অন্যায়ের, আলো-অন্ধকারের। আরো একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা না হলে বিবেক দাঁড়াতেই পারে না; তা হচ্ছে, বিচার-বিবেচনা করবার ও তা অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলবার চেতনা ও সাহস।

বলেছি চেতনার কথা; এই চেতনা কেবল ব্যক্তিক নয়, মোটেই দৈশিকও নয়, বলা যায় বৈশ্বিক, বলা যায় সমগ্র মানব এবং মানবের অর্জন ধরে ঐতিহাসিক। তবে কথাটা শেষ পর্যন্ত এই যে, ব্যক্তিক এবং মানব-ঐতিহাসিক চেতনাই এনে দেয় আমাদের ভেতরে বিবেক।

মানুষের চিন্তার ভেতরে কিছু কিছু স্থাপন আছেই আছে যা আমরা আলো বাতাসের মতো পেয়ে যাই সার্বজনীন উত্তরাধিকার হিসেবে; আর এমনই এ উত্তরাধিকার যা চাই বা না-চাই আমাদেরই হয়ে যায়, থেকে যায়। তাই আমরা লক্ষ করবো, বিবেকের কথা যখন বলি, তখন এ যেন এমন একটা কিছুর কথা বলছি যা আমাদের থেকে স্বাধীন, যা আমাদের সমূহ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিপরীতেও অস্তিত্বশীল। অনেকটা যেন জাতিস্মর হয়ে উঠি আমরা যখন ভেতর থেকে বিবেকের কণ্ঠ শুনি। এ যেন চুরি করছি, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ বলছে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এই কণ্ঠস্বর মানুষেরই কণ্ঠস্বর। কোন মানুষ ? যে-মানুষ মানব-পরিবারের, যে-মানুষ ইতিহাসে বর্ধিত, যে-মানুষ সংস্কৃতির সন্তান।

এখন দিনের আলো তার বিভা আর তেজ নিয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ পথে নেমেছে। তাদের নিত্যদিনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। হকার ভোরের পত্রিকা দিয়ে গেছে। আমি পড়ছি। আমার চোখের সমুখে দেশ এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। ক্ষমতা আর

বিবেক এই যে শব্দ দুটি নিয়ে ভাবছিলাম, পত্রিকা পড়তে পড়তে এখন আমি একটি সূত্রে তাদের দেখে নিতে পারছি— বিবেক বর্জিত ক্ষমতা, আর ক্ষমতা বর্জিত বিবেক।

বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনছি নির্যাতিত লাঞ্ছিত ইতিহাস দেশ আর মানুষের ভেতর থেকে; কিন্তু এই কণ্ঠ শক্তিহীন বটে যতক্ষণ না তার উচ্চারিত স্বরকে কাজে পরিণত করবার ক্ষমতা— রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা— তার হাতে আসছে।

কিন্তু একজন লেখকের বেলায় ? তাঁর ক্ষমতা তাঁর কলমের। তাঁর বিবেক তাঁরই সংস্কৃতির মূল্যবোধ। এ দুই যে লেখকের ভেতরে ক্রিয়াশীল, এ দুই নিয়ে যিনি আপোষে যেতে প্রস্তুত নন তাঁকেই আমরা জানবো সৎ লেখক হিসেবে।

গল্পের বিষয় হিসেবে একাত্তর

বইয়ের চেয়ে ভালো কোনো পথসঙ্গী নেই— ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এ আমার উপলব্ধ কথা; এই পড়তে পড়তেই একদিন আমি একটা ছবি পেয়ে যাই, বই পড়া হচ্ছে বৃক্ষের মতো একটু একটু করে আকাশের কাছে যাওয়া। এখনকার দূরভ্রমণ মানেই যখন আকাশ-পথে, তখন যে-বই আমি সঙ্গে নিয়ে বেরোই, তা হাতের কাছে উঠে আসা যে-কোনো বই নয়, নয় ইংরেজিতে যাকে বলে পাল্প ফিকশন, বাংলায় বলতে পারি দু'পয়সার গোলআলু-গল্প (আমাদের দেশে এ ধরনের বইকে মানা হয় সাহিত্যসৃষ্টি বলে!)— নয় ইনস্ট্যান্ট হিস্ট্রি, যার বাংলা করা যেতে পারে এক নিঃশ্বাসের ইতি-বিবরণ (যেমন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথাগুলো)। তাই ভ্রমণে বেরুবার আগে জামাকাপড় গোছাতে যতটা না তার চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগে বই বাছতে। যাত্রায় বেরুবার দু'তিনদিন আগে থেকেই অস্থির হয়ে ওঠে হাত; ক্রমাগত বই তুলি, বই রেখে দিই, আবার তুলি, আবার রেখে দিই; বইয়ের দোকানে যাই, তাকে সাজানো থরে থরে বইয়ের সব পিঠ দেখি, কোন বইটি যেন পড়া হয় নি, কোন লেখককে যেন পড়াই হলো না, শেষ পর্যন্ত একটা পাঠ্যসূচি আসন্ন ভ্রমণের জন্যে এইভাবে তৈরি হয়ে যায়।

সেবারে লন্ডন থেকে ডালাস যাবো, সাড়ে দশ ঘন্টার আকাশ-পাড়ি, নিচে অতলান্তিক মহাসাগর; কী বই সঙ্গে নেবো ভাবতে ভাবতে লন্ডনে পাড়ার পাঠাগারে হাতের কাছে হঠাৎ ঠেকলো আমার অনেকদিনের সন্ধানলক্ষ্য একটি বই; এর লেখক এখন প্রয়াত, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর ইয়োরোপের চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে যে শুরু হয়েছিলো নব-বাস্তবতা তারই অন্যতম প্রবর্তক তিনি; কথাশিল্পে যাদুবাস্তবতা নামে যে-ধারার ইদানিং খ্যাতি, তারই ইয়োরোপীয় আদি এক মহাত্মা তিনি; নাম তাঁর

ইতালো কলভিনো। নামেই সংকেত পাওয়া যাবে, ইতালির মানুষ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে তিনি লড়াই করেন, মুসোলিনির পরাজয়ের পর প্রতিরোধের ওই অভিজ্ঞতা ঢেলে একটি উপন্যাস লিখে ওঠেন, শুরু করেন তাঁর সাহিত্য জীবন। সেই উপন্যাসটির নাম *মাকড়শার বাসার দিকে সড়ক*। আমার কিছুটা পরিচয় ছিলো কলভিনোর লেখার সঙ্গে, কিন্তু এ বইটির কথা জানা ছিলো না, জানলাম সালমান রুশদির এক প্রবন্ধে যেখানে তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি-ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লেখা যাবত উপন্যাসের ভেতরে অন্তত শিরোনামের দিক থেকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এ বই; কৌতূহল হয়েছিলো বইটি পড়ে দেখবার জন্যে, বিশেষ করে রুশদির ওই অদ্ভুত ব্যাজস্তুতির পর।

এতদিন পরে বইটি হাতে এসে পড়বে এবং দীর্ঘ এক ভ্রমণের আগে, আশ্চর্য যোগাযোগই বলবো! উড়োজাহাজে একটানা পড়তে পড়তে পায়ের নিচে মহাসাগর পার করে অন্য ডালাসে এসে নামলাম সাড়ে দশ ঘণ্টা পর।

মাকড়শার বাসার দিকে সড়ক গণতন্ত্র-চেতনা বিকাশ ও প্রতিরোধ সূচনার এক সৃষ্টিশীল বিবরণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে— ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি শাসিত ইতালিতে, হিটলারের নাৎসি বাহিনী অধ্যুষিত রোমে, অবরুদ্ধ পরিবেশে। মুচির সাগরেদ এক কিশোর, বোন তার বেশ্যা; বন্ধুরা একদিন তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, পারবি ওই জার্মান সৈনিকের কাছ থেকে পিস্তল চুরি করে আনতে ? সেই থেকে কাহিনীর শুরু এবং রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠা জুড়ে কীভাবে সেই কিশোর একদিন হয়ে উঠলো মুক্তিযোদ্ধা।

বলবো, খুব বড় মাপের উপন্যাস নয় এটি— কিন্তু তীব্র তাপ ও নিষ্করুণ বাস্তবতার; এমন লেখা বাংলাদেশেই আমাদের কারো কারো হাতে হয়েছে; কিন্তু বাংলা তো তৃতীয় বিশ্বের ভাষা, রাজনৈতিকভাবে সে শাসিতের ভাষা, দরিদ্রের ভাষা, ক্ষমতাহীনের ভাষা, তাই আন্তর্জাতিক পরিচিতি নেই এ ভাষায় লেখা সাহিত্যের, অর্থনীতির পরিভাষায়— নেই চাহিদা, তাই সরবরাহও নেই। তাই বলে বাংলাভাষায় কেউ লেখার কলম ধরতে উৎসাহ পাচ্ছেন না, এমন তো দেখি না; ইতিহাসে এমনটি হয়ও নি; বিখ্যাত সেই ঘটনা, মাইকেল ইংরেজি ছেড়ে বাংলাতেই ফিরে এসেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেও ও-পথে আর যান নি। প্রসঙ্গত এখনকার একজন বাঙালি ঔপন্যাসিকের কথা ধরা যাক— অমিতাভ ঘোষ, তিনি ইংরেজিতে লেখেন; লেখক হিসেবে তাঁকে আমি উঁচু দরের বলেই জানি, কিন্তু তাঁর অন্যভাষী-কলম বাঙালি নবীন কোনো লেখক হাতে নিক, এ আমি কখনোই চাইবো না। চাইবো না, তার কারণ, মানুষকে সৃষ্টির চাপে নিজের ঘরেই থাকতে হয় বলে আমি বিশ্বাস করি; অপরের ঘরে সে অপরই বটে। দান যেমন শুরু করতে হয় নিজের বাড়ি থেকেই, সাহিত্যের কাজও নিজের বাড়িতেই শুরু করতে হয়। আমার মা দরিদ্র বলে রাজার ছেলের মা আমার মায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম, এটা কোনো সন্তান কখনোই ভাবে নি।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, ইতালো কলভিনোর ওই *মাকড়শার বাসার দিকে সড়ক* উপন্যাসটি আমাকে মনে করিয়ে দিলো আমাদের একাত্তরের কথা, গণহত্যার কথা, রাজাকারদের কথা, এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কথা; মনে করিয়ে দিলো আমাদের গল্প-উপন্যাসগুলোর কথা যেখানে আমরা অনেকেই বলে গেছি মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা। এবং আবিষ্কার করে উঠলাম, আমূল চমকে উঠলাম : সত্তর ও আশির দশকে আমাদের কথাসাহিত্যের প্রধান যে-বিষয় ছিলো একাত্তরের দিনগুলো, (মুক্তিযুদ্ধের ওপর অন্তত একটি গল্প বা উপন্যাসও লেখেন নি এমন লেখক তখন ছিলেন না), সেই একাত্তর কীভাবে ও কতটাই আজ আমাদের কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত। এর কারণ কি এই, একাত্তরকে আমরা ভুলে যেতে বসেছি ?— কিম্বা ইতোমধ্যেই ভুলে গেছি ?

অথবা, বাংলাদেশ ও হাজার বছরের বাঙালি চেতনার প্রতিপক্ষ যে পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার শিবির, যারা বাহ্যত সেদিন পরাজিত হয়েছিলো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিলো সক্রিয়, স্বাধীন বাংলার মাটিতেই হত্যা করেছিলো আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, আমাদের দেশটিকে বন্দি করেছিলো সামরিক শাসনের শৃংখলে, বিকৃত করে চলেছিলো আমাদের শ্রমে প্রেমে প্রতিভায় ও রক্তে লেখা ইতিহাস, তারা কি শেষ পর্যন্ত তাদের অপকৌশলে এতটাই জয়ী হয়ে গেলো যে, লেখকদেরও তারা ভুলিয়ে ছাড়লো একাত্তরের কথা ?

মাকড়শার বাসার দিকে সড়ক-এর ইংরেজি অনুবাদের পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোয় লেখকের শেষ বয়সে; এই সংস্করণটির জন্যে বিশেষভাবে তিনি একটি ভূমিকা লেখেন। ইতালো কলভিনোর সেই ভূমিকা থেকে একটা খোঁজ পাওয়া যাবে যে, সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করা না করার ব্যাপারটা কি আদৌ ভুলে যাবার, না অন্য কিছু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি ও তার বাহিনীর পরাজয়ের পর ইতালির নব-বাস্তব ধারার কথাসাহিত্যের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে কলভিনো কী বলছেন পড়া যাক; এবং মিলিয়ে দেখা যাক আমাদের একাত্তর ও আমাদের সত্তর-আশি দশকের কথাসাহিত্যের সঙ্গে।

কলভিনো বলছেন : *তখন, সেই যুদ্ধের পরপর, আমাদের কথাসাহিত্য রচনা যতটা না ছিলো শৈল্পিক, তার চেয়ে বেশি ছিলো রক্তস্নাত মানুষের সম্মিলিত স্বরের প্রকাশ। তখন আমরা অনেক উপাদান ব্যবহার করেছি কাঁচাভাবে, তখন আমরা-যে সদ্য বেরিয়ে এসেছি এক যুদ্ধ থেকে। তখন আমরা তরুণেরা ছিলাম সেই বয়সে, যে-বয়সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা যায়। যুদ্ধে ইতালি একটি দেশ হিসেবে পরাজিত হলেও চেতনা ও মানবিকতার কোনো অর্থেই আমরা ছিলাম না পরাজিত এবং পিষ্ট। আমরা জয় অনুভব করেছি আমাদের রক্তের ভেতরে। এ ছিলো না উল্লাসের মুহূর্ত। বরং তার উলটো। আমরা দেখেছি, জীবনকে অগ্রসর হতে হবে এখান থেকেই, এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আবার সব গড়ে তুলতে হবে। তখন আমাদের লেখকদের ভেতরে*

বার্তা ছিলো এই যে, মানুষের মৃত্যু ও গণহত্যার কথা, এবং মানুষের চিৎকৃত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা লেখায় আমাদের বলতেই হবে।

লক্ষ্যনীয়, ইতালো কলভিনো বলছেন, এবং কী আশ্চর্য রকমে এ সবই মিলে যায় একাত্তর পরবর্তী আমাদের লেখক ও লেখার সঙ্গে :

এই যে যুদ্ধ, যার হাত থেকে কেউ রেহাই পায় নি, এই যে মুক্তিযুদ্ধ যার ভেতরে ছিলো সাধারণ মানুষ সবাই, এই যুদ্ধটা লেখক এবং পাঠকের ভেতরে একটা তাৎক্ষণিক সেতু রচনা করে দিয়েছিলো। যুদ্ধ পরবর্তীকালে পাঠক ও লেখক আমরা হঠাৎ পরস্পরের ঘনিষ্ট মুখোমুখি হয়ে পড়ি। আমরা দেখি, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শোনা ও দেখা অজস্র গল্প আমাদের ভেতরে টগবগ করছে। অন্যদিকে পাঠকেরাও অজস্র অসংখ্য ঘটনার ভেতর দিয়ে গেছে, এবং তারা নিজেরাই সেখানে চরিত্র। আমরা যে গল্প বলেছি, আমরা তাদেরই গল্প বলেছি। আর তারাও যে আমাদের গল্প পড়েছে যেনবা তারা নিজেদেরই গল্প পড়ছে। আমরা তখন যেন পরস্পরের কণ্ঠ।

সেই অবরুদ্ধ দিনগুলোর পর যখন মুক্ত হলো আমাদের কণ্ঠ, তার প্রথম প্রকাশই ঘটলো আমাদের গল্প বলার মাধ্যমে। সেই যে ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো, লোকেরা আবার দোকানপাট খুলতে শুরু করলো, চাষী মন দিলো চাষে, শ্রমিক তাদের কারখানায়, তারা-যে আবার যে যার কাজে ফিরে গেলো, প্রতিদিন যে চেনা অচেনা আবার তাদের দেখা হতে লাগলো, সবার মুখে মুখেই তখন উচ্চারিত হতে লাগলো যুদ্ধদিনের শত গল্প, সহস্র অযুত সত্য গল্প। গতকাল যে আমাদের জগৎ ছিলো ধূসর, আজ তার বদলে নানা রঙের আলো, আর সেই নানা রঙ কিন্তু আর কিছুই না— সে আমাদেরই, লেখক ও পাঠক উভয়েরই গল্প।

আর এইসব গল্প আমাদের কাছে, আকাশে বাতাসে এমন একটা বিভা নিয়ে তখন উপস্থিত ছিলো, যেন তা কোনো লেখক লেখে নি, যেন তা এর ভেতর দিয়ে যারা গেছে তারা বলছে না, এ যেন মাটি কথা বলছে, সময় কথা বলছে। যেন এর নির্মাণ, এর ভাষা, এর ভঙ্গি আমরা পেয়ে গেছি ইতিহাস থেকে। চরিত্র, নিসর্গ, হত্যা, যুদ্ধ, কাব্যিক বর্ণনা, অত্যাচার, যৌনতা, এ সবই যেন শিল্পীর প্যালেটে নানা রঙের মতো আমাদের হাতে এসে গেলো, যেন সুরকারের যন্ত্রে সপ্তস্বর। আমরা শুধু এঁকে গেছি, আমরা শুধু সঙ্গীত রচনা করে গেছি।

এই যে তখন বাস্তববাদী সাহিত্য আমরা রচনা করেছিলাম, যদি বলা হয়, আমরা তাড়িত হয়েছিলাম অ-সাহিত্যিক প্রেরণায়, তাহলে ভুল হবে; আমরা বরং যা করতে চেয়েছি, তা হচ্ছে, এই ঘোর নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে শিল্প করে তুলতে চেয়েছি, মানব ইতিহাসের এমন এক দলিল করে তুলতে চেয়েছি যা স্থান কাল ছাড়িয়ে সর্বত্র এবং বহুদূর যাবে।

এখানেই উত্তর পেয়ে যাই, যাই না কি সেই প্রশ্নের ?— আমরা বাংলাদেশের লেখকেরা কি একাত্তর ভুলে গেছি ?

ইতালো কলভিনোর লেখা থেকে শেষ কথাটি আবার পড়ি : যুদ্ধ পরবর্তী লেখকেরা চেয়েছিলেন এক ঘোর নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে শিল্প করে তুলতে, মানব ইতিহাসের এমন এক দলিল করে তুলতে যা স্থান কাল ছাড়িয়ে বহুদূর যাবে। একাত্তর শুধু কেন, মানুষের যে-কোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকেই শিল্প করে তোলার জন্যে এবং স্থানকাল ছাড়িয়ে দূরগামী করে দেবার জন্যে চাই গভীরতর স্থিরতা ও সদ্‌অর্থে কালক্ষেপণ। যুদ্ধের পরপর গল্প বলবার যে দরকারটি ছিলো, সে শুধু লেখকের নয়, লেখক-পাঠক উভয়েরই ছিলো; এখন সেইসব গল্প তাৎক্ষণিকভাবে বলা হয়ে যাবার পর, যেন একটি রেচকের কাজ সমাপিত হয়ে যাবার পর, লেখক পাঠক দুপক্ষই অনুভব করে উঠেছে— এবার চাই শিল্পদৃষ্টি, আর তারই জন্যে, আমার মনে হয়, বিষয় হিসেবে একাত্তরকে ব্যবহার করতে লেখকদের আজ খুবই হিসেবি হওয়া দরকার। একাত্তরের কথা লিখতেই হবে, নইলে আমার মান থাকবে না লেখক হিসেবে— এরচেয়ে আত্মঘাতী কথা আর কিছু হতে পারে না একজন সৃষ্টিশীল লেখকের পক্ষে।

সমালোচনার দৌড়

ইংরেজি ভাষায় যে 'ক্লিশে' শব্দটি পাওয়া যায়, আমরাও যে শব্দটি মাঝেমধ্যেই ব্যবহার করে থাকি 'বস্তাপচা কোনো উক্তি' বা 'ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ কোনো প্রকাশ' বোঝাতে, এর বাংলা এক কথায় কী হতে পারে? 'ক্লিশে'র বাংলা অনেকেই 'বস্তাপচা' করে থাকেন; কিন্তু ভেবে দেখেছি কি, এর অর্থ হয় বস্তা থেকে খোলাই হয় নি, অব্যবহৃত অবস্থায় বস্তাবন্দি থেকেই যা পচে গেছে। তাই যদি হয়, তাহলে ক্লিশের বাংলা বস্তাপচা আদৌ হতে পারে না; যা ব্যবহৃতই হয় নি সে তো ব্যবহৃত হবার অপেক্ষাতেই আছে; নিন্দার্থে তা প্রযুক্ত হবে কোন্ যুক্তিতে? পরীক্ষা করে দেখা যাক 'ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ'— এটাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, কোনো ভাষার কোনো শব্দ কখনোই 'জীর্ণ' হয়ে যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। 'ক্লিশে' বলতে এমন শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য বোঝানো হয়, ব্যবহারে ব্যবহারে যা প্রকাশ-মৌলিকত্ব হারিয়েছে, এবং আরো মারাত্মক, ব্যবহারে ব্যবহারে যা এখন একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে তার সমুদয় অর্থ এবং অর্থ-বিবেচনা।

'ক্লিশে'র বাংলা, আমার মতে, করা যায় 'নষ্টকথা'।

আমাদের সাহিত্যিক সমাজে দীর্ঘদিন থেকে অনেক 'নষ্টকথা' চলে আসছে, এর কিছু উদাহরণ দেখি। কোনো কোনো সমালোচককে আমরা বলি, 'বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত'; কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত বা শাণিত না হলে তাঁকে আমরা আদৌ একজন সমালোচক বলবো

কেন ? কোনো কোনো কবিকে বলি, 'নাগরিক কবি', 'পল্লী কবি'— হয় কবি অথবা কবি নয়, পল্লী বা নগর ভাগ হয় কী মতো ? কোনো কোনো লেখককে বলি, 'বরেণ্য লেখক', 'তাঁর গদ্য মিষ্টি', 'তাঁর ভাষা ঝরঝরে', 'তাঁর বই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ওঠা যায়'— তবে অবরেণ্য লেখকও আছেন ?— গদ্য মিষ্টি হয় কী প্রকারে ?— ভাষা ঝরঝরে কথাটা কী বস্তুত ?— এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার সঙ্গে শিল্পগুণের সংস্রব আছে কি ?

একটু ভেবে দেখলেই অনুভব করবো, এ সকল আমরা বলে চলেছি আমাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার না করেই; বলে চলেছি কিছু বোঝাতে নয়, কিছু না-বোঝাতেই। আরো আছে; 'দ্রোহ', 'সংস্কৃতিসেবী', 'নাগরিক চেতনা', 'নারীবাদ', 'ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার', 'দায়বদ্ধ লেখক', 'সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা'— এর কোনো কোনোটি কেবল 'নষ্টকথা'ই নয়, শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগও বটে; যেমন ওই দ্রোহ বা সংস্কৃতিসেবী!— দ্রোহ বলে যা বোঝাতে চাওয়া হয়, শব্দের অর্থটি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং সংস্কৃতি কিছু 'সেবন' করবার নয় যে 'সেবী' হওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে 'ক্লিশে'র তালিকায়, আমি আশংকা করছি, অনেক দিন থেকেই যুক্ত হয়ে গেছে 'যাদুবাস্তবতা' আর 'উত্তর-আধুনিকতা'; এই দুটির ক্ষেত্রে আমার ধারণা, আমরা যতটা না-বুঝে প্রয়োগ করছি, তার চেয়ে বেশি ফ্যাশনদুরস্ত হবার জন্যেই।

ধরা যাক, সেদিন একজন 'বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত' সমালোচকের সঙ্গে আমার দেখা হলো নেমতন্নে; আমাকে হাতের কাছে পেয়ে নিজের শিঙটি তিনি ধার দিয়ে নেবার জন্যে পাশে বসলেন, এবং বসেই হাতের গেলাশটি দোলাতে দোলাতে বললেন, কী হচ্ছে সব, বলুন তো ? কী সব উপন্যাসে দেশ ছেয়ে গেছে! নাবালকের কলমে লেখা! অপাঠ্য! আমাদের পাঠকেরা তা-ই গোগ্রাসে গিলছে। ওদিকে সারা পৃথিবীতে উপন্যাস পৌঁছে গেছে কোথায়! এ দেশে একদিন উপন্যাসের যে মান আপনাদের হাতে পেয়েছিলো, এই আপনারই অনেক উপন্যাসে যে অসাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ করেছি—।

কথাটা তিনি এর আগেও অনেক দেখায় আমাকে বলেছেন; কিন্তু আজ আর আমি নিজেকে তাঁর শিঙ ধার দেবার বৃক্ষবাকল হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবো না; তাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমার উপন্যাসের কথা ছেড়ে দিন। বিদেশের অখ্যাত বিখ্যাত যাবত লেখক নিয়ে আপনি আলোচনা করেন, প্রবন্ধ লেখেন। কই, আপনাকে তো দেখিনি বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক বা উপন্যাস নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা করতে!

তিনি বললেন, করি নি এটা সত্যি নয়। তবে, হ্যাঁ, কম। আলোচনা করার মতো ক'জনইবা ঔপন্যাসিকই আছেন বাংলাদেশে ?

বললাম, আমার যে প্রশংসা করলেন, আমাকে নিয়েও তো আপনি লেখেন নি ?

লিখবো, লিখবো। খুব শিগগিরই লিখবো।

কিন্তু আমার সে লেখার দরকার নেই। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমিই আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক। বিদেশের লেখকদের নিয়েই লিখে যান, ওতে আপনার কাজ হবে, আপনি যে কত পড়াশোনা করেন তা সকলে জানবে, কিন্তু দেশের তাতে কোনো কাজ হবে না।

কিন্তু দেশের কাজ হবে বলেই তো বিদেশের ঔপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের পাঠকেরা জানতে পারবেন, উপন্যাসের বিশ্বমান কেমন।

ভেতরের ক্রোধ ঠেলে বেরিয়ে আসে আমার। বললাম, তাতে কচু হবে। আপনারা এভাবেই সর্বনাশ করছেন আমাদের সাহিত্যের। পাঠকের সাহিত্যরুচি গড়ে তোলার বদলে নিচের দিকেই টেনে নামাচ্ছেন। দেশের পাঠকের কাজে যদি লাগতে হয়, তবে বিদেশের পাশাপাশি দেশের লেখা নিয়েও আপনাকে আলোচনা করতে হবে, তুলনায় বরং বেশিই করতে হবে। তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে। নইলে আপনার ও সব আলোচনায় পাঠক তৈরি হবে না। আপনার লেখা পাঠকের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে, মাথার ভেতরে প্রবেশ করবে না। পাঠক ধরে নেবে, আমরা যেমন উড়োজাহাজ বানাতে পারি না, কম্পিউটার বানাতে পারি না, তেমনি বিশ্বমানের উপন্যাসও লিখতে পারি না। আমরা গরুর গাড়ি বানাতে পারি, আমরা দুর্বল উপন্যাস লিখতে পারি, এতেই আমাদের চলে যাবে ও যাচ্ছে।

সমালোচক মহাশয়টি চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর হঠাৎ সহাস্য হয়ে বললেন, আজ আপনি একটু বেশি পান করে ফেলেছেন। নইলে দেখতে পেতেন, সাহিত্য রচনা আর কম্পিউটার বানানো এক নয়।

আমিও হেসে উঠে বললাম, আমি সম্বিতেই আছি। আর এটাও আমি ভালো করেই জানি যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে শিল্প রচনার অগ্রগতি সমান্তরাল নয়। তা যদি হতো, তাহলে রথের যুগে কালিদাস জন্মাতেন না, তলোয়ারের যুগে শেক্সপীয়র আসতেন না। আমি পাঠকের কথা বলছিলাম। আর এখানেই আমার কথা— এখানেই আপনার দায়িত্ব দেখিয়ে দেয়া যে, আমরা এই বাংলাদেশের এখনকারই বেশ কিছু লেখা নিয়ে ইংরেজি ফরাসি জাপানি বা স্প্যানিশ ভাষার বর্তমান শ্রেষ্ঠ লেখা ও লেখকদের পাশে চমৎকার দাঁড়াতে পারি— এ আমি বাংলার একজন সচেতন লেখক ও পাঠক হিসেবে বলছি। বিশ্বের সব ভাষাতেই অপাঠ্য এবং নাবালকের লেখা আছে ও হচ্ছে, বাংলা ভাষাতেও হচ্ছে। দুটোই আপনার নজরে থাকা চাই। আপনাদের প্রবন্ধ লেখার পেছনে এমন ভাবনা যেন না থাকে, কাজ যা হচ্ছে কেবল ওইসব ভাষাতেই হচ্ছে। সমালোচক তৈরি করে পাঠক, কখনোই লেখক তৈরি করতে পারে না। এ দেশে পাঠক যদি তৈরি না হয়ে থাকে তো সমালোচকেরাই তার জন্যে দায়ী। সমালোচনা যে স্তরে থাকবে তার চেয়ে উন্নত স্তরে সাধারণ পাঠক, বিশেষ করে উপন্যাসের পাঠক যেতে পারে না; কারণ, ভাষা মাধ্যমে সকল সৃষ্টির ভেতরে উপন্যাসই পাঠকের চাহিদার ওপর অত্যন্ত প্রবলভাবে নির্ভরশীল।

লেখার গভীরে বিস্ফোরক

কোনো কোনো সৃষ্টিশীল লেখার গভীর ভেতরে থাকে এক ধরনের বিস্ফোরক, যেন সে মাইন, শিল্পের ছদ্মে প্রশ্ন, মাইনের মতোই সে চলার পথে ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকে, তারপর একদিন সে-পথে পা রাখলেই বিস্ফোরণ ঘটে— শিল্পের আপাত সুকুমার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে আসে তার আঘাতের হাত; সে আঘাত সদ্‌অর্থে, আমাদের নির্বিকল্পতার বুকে সে আঘাত হানে, জাগিয়ে দেয়, দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদেরই কীর্তিনাশা সমুহের সমুখে।

এমন একটি লেখা, আমাদেরই সাহিত্য থেকে সনাক্ত করা যেতে পারে— সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র উপন্যাস *লালসালু*। কী আছে এই উপন্যাসে যাকে বলছি বিস্ফোরক ? আছে এই : যে-কোনো মহৎ রচনার মতোই শরীরে তার জটিল আবর্ত নেই, আছে গৌরবার্থেই সরলতম একটি উপলব্ধি, সরলতম বলেই হয়তো সহজে তা চোখে পড়ে না, কিম্বা চিরকালের সদ্‌বাণীর মতোই সে হয়ে থাকে উপেক্ষিত, অব্যবহৃত;— অনেক অনেকের ভেতর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, 'ন্যায়-যুদ্ধ বলে কিছু নেই'— তলস্তয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি* উপন্যাসে, যেমন 'জীবন-মরণ চাপে সামান্য মানুষের ভেতরেও জেগে ওঠে একজন বলবান'— হেমিংওয়ের *বৃদ্ধ ও সমুদ্র* উপন্যাসে; যেমন রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন* যার গভীরে আছে 'মানুষের প্রতি অন্ধত্বই দুঃশাসনের জন্ম দেয়'; ওয়ালিউল্লাহ্‌র উপন্যাস *লালসালু*-ও ধারণ করছে এই সরল কথাটি, 'ধর্মব্যবসা নয় ধার্মিকতা'।

হ্যাঁ, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা যারা করে, অধিকন্তু বর্তমান বাংলাদেশে ওয়ালিউল্লাহ্‌র ওই বক্তব্যের সম্প্রসারণে— ধর্মকে যারা রাজনৈতিক দুষ্ট মতলবে ব্যবহার করে, প্রকৃতই ধর্মহীন তারা; আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখি ধর্মের নামে একেকটি জাতিগোষ্ঠিকে ভূতের মতো উল্‌টো পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে ও হয়েছে কীভাবে। কেবল কি আফগানিস্তানে ? ইরানে ? দেখি নি বা দেখছি নাকি অন্য মোড়কে ইসরায়েলে ? তালেবানি বা হিন্দুত্ব বা জিয়োনবাদ, একই দুষ্ট মুদ্রা বটে, কেবল পিঠচিত্রটি ভিন্ন তাদের।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ আমাদের সমাজে এই দুষ্টব্রণের বীজটি তাঁর দ্রষ্টা চোখ দিয়ে বহু আগেই দেখে উঠেছিলেন; এতটাই আগে যে, তখন পর্যন্ত এই উৎকট ব্যাধিটির এত পরিব্যপ্ত ও হন্তারক রূপটি প্রকাশিতই হয় নি, কেবল এ দেশে নয়, বিশ্বের কোথাও। এবং আমরা তখন এ উপন্যাসকে দেখেছি সীমিত করে, দেখেছি সর্বাত্মক নয় কিন্তু বিশেষ এক ঘটনার বিবরণ হিসেবে; যেনবা অন্য কোথাও নয়, উপন্যাসের গ্রামটিতেই কেবল এবং আর সকল জনপদ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে আমরা আছি এ থেকে মুক্ত।

শিল্পের এই হচ্ছে রূপ : ছদ্ম সে এমত যেন ঘাসের বুকে নিসর্গের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে থাকা লতাপাতার চিত্র আঁকা মাইন; যতক্ষণ পা না পড়বে ততক্ষণ বিস্ফোরণ নয়। কিন্তু ব্যক্তি তার সমূহ অভিজ্ঞতায় এবং সমষ্টি তার ইতিহাস অবলোকনে যখন দেখে ওঠে নিজেকে ও দেখে ওঠে বর্তমান বাস্তবতা, তখনই সে চমকে ওঠে, তখনই সে অনুভব করে ওঠে— এই সত্য তো আগেই আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিলো। একাত্তরে যখন সাধারণ মানুষও প্রতিরোধে হয়ে ওঠে বীর, তখন হেমিংওয়ের বৃদ্ধকে মনে পড়ে; ভিয়েতনামে মনে পড়ে যান *যুদ্ধ ও শান্তি*-র তলস্তয়, প্রতিটি স্বৈরশাসনের কালে রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন* আমরা দেখে উঠি মঞ্চের আলোকসম্পাতে নয় নিষ্করুণ দিনের আলোয়।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ যদি হতেন উনমানের লেখক, *লালসালু*-র বদলে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আসতো প্রচারপত্রসুলভ কোনো আখ্যান; তাঁর বলবার কথাটি তিনি এতই নিপুণভাবে শিল্পে চারিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা *লালসালু*-কে গ্রহণ করেছি নিশ্চিন্ত হাতেই, ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা মাইনের মতোই *লালসালু*-কে আমরা দেখেছি যেন নিরীহ ঘাসেরই একটি চাপড়া। তাই, ধর্মের দোহাই পেড়ে পাকিস্তান যে-কালে আমাদের বোঝাতে চাইছে— যেহেতু আমরা ধর্মে মুসলমান, পাঠান-পাঞ্জাবিরাও তাই, অতএব ভৌগলিক হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা সবাই এক জাতি এক রাষ্ট্র— এবং গোপন করছে এই সংবাদ, তবে কেন পিঠে পিঠ ঠেকানো ইরান ও পশ্চিমের পাকিস্তান নয় এক জাতি এক দেশ ?— এবং ওই এক জাতি এক দেশের মিথ্যেটিকে গেলাবার জন্যে, ধর্মেরই দোহাই পেড়ে শোষণ ও শাসনের ব্যবস্থা পাকা করবার জন্যে পাকিস্তান যখন সামরিক শাসনও চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর, সেই কালেও দেখতে পাচ্ছি ওয়ালিউল্লাহ্র *লালসালু* নয় নিষিদ্ধ; সেই তখনও *লালসালু* কলেজে ছাত্রপাঠ্য তো বটেই, সাধারণ আমাদের জন্যেও এর সংগ্রহ রয়েছে অব্যাহত, সংস্করণের পর সংস্করণ হয়ে চলেছে *লালসালু*-র এবং পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সম্মতিসহই ওয়ালিউল্লাহ্কৃত এর ইংরেজি পাঠও *শেকড়হীন বৃক্ষ* নামে ইওনেস্কোর ধাত্রীত্বে প্রকাশিত হয়েছে। এ সকলই সেই কথাটিই বলে : শিল্প এমনই যে, তেতো বড়িও ঢাকা থাকে শর্করায়, খঞ্জরও রঙিন আলোয়ানে, ঘাসের বুকে যে মাইনের, সে-কথা তো আগেই বলেছি।

কিন্তু যত দিন গেছে, একটু একটু করে আমরা ঢাকনাটি খুলতে পেরেছি— কিম্বা আমরাই কি খুলেছি ?— ইতিহাসই খুলে দিয়েছে *লালসালু*-র সে শিল্পছদ্ম আবরণ। আমরা দেখেছি বিশ্বের বহু দেশে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার, সে প্রয়োজনে যুদ্ধ পর্যন্ত, সে প্রয়োজনে লক্ষ মানুষকে বাস্তুহারা করা পর্যন্ত, সে প্রয়োজনে একটি রাষ্ট্রের একটি জাতির পায়ের গোড়ালি বাঁকিয়ে দিয়ে পেছন-হাঁটানো পর্যন্ত, এবং একটু একটু করে আমরা ওয়ালিউল্লাহ্র *লালসালু*-র দিকে ফিরে তাকিয়েছি; তখন আমরা পড়ে উঠতে শুরু করেছি *লালসালু*-র আসল সংবাদটি।

এবার দেখতে পাচ্ছি *লালসালু*-র সংস্করণ এখন দ্রুত ফুরোচ্ছে, অর্থাৎ পাঠক আরো বেশি করে পড়ছেন এ উপন্যাস; এ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই বটে।

এবং এবার আমরা *লালসালু*-কে ব্যবহার করতেও শুরু করেছি আমাদের বর্তমানকে বুঝবার ও বোঝাবার উপায় হিসেবে; দেখতে পাচ্ছি, আমরা এর উপন্যাস-শরীরটিকে শিল্পের অন্য পোশাকেও উপস্থিত করছি। এই ভিন্ন উপস্থাপনার পেছনে একটি বিশেষ ভাবনা কাজ করেছে— অবিকল যে-ভাবনায় একদিন আমি কবিতা ও আখ্যানের কলম ব্যবহারের পঁচিশ বছর পর নাটকের নতুন কলম হাতে নিই, শুরু করি *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। ভাবনাটা এই— নাটকের মাধ্যমে আমরা পৌঁছুতে পারি সাক্ষর নিরক্ষর, পাঠক ও পাঠে অনাসক্ত, এমনকি আলবেয়ার ক্যামু-র বিখ্যাত উক্তি 'নাটকের টিকিট যে-কেউ কিনতে পারে, আর নাটকের অভিনয়স্থলে পাশাপাশি আসনেই হয়তো বসে থাকে নির্বোধ ও সুবোধ'— সেই তাদের কাছে, সকলের কাছে। তাই দেখি, আমাদের একাধিক নাট্যজন *লালসালু*-কে দেন নাটকের শরীর, অভিনীত হয় সে নাট্যরূপ। নাটক যেহেতু একদল জীবন্ত মানুষের ক্রিয়া একদল জীবন্ত মানুষের সমুখে, তাই অভিনয় কালে ঘটন ও দর্শনের ভেতরে অবিরাম বহে যায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিদ্যুত। নাটক *লালসালু*-র বিদ্যুতে আমরা প্রহত হই, সটান উঠে বসি, অভিনয় শেষে 'পরিবর্তিত' হয়ে যাই আমরা, যে-কোনো উত্তম নাটকই যা আমাদের করে। কিন্তু *লালসালু*-র কোনো নাট্যরূপ এবং প্রযোজনাই, আমি বলবো, উপন্যাসটির তুল্য সমর্থ হয় নি; ফলে, এর মর্ম ঠিক ততটা আমাদের কাছে পৌঁছোয় নি, যতটা পৌঁছেছে উপন্যাসটির পাঠে।

নাটকের মতো চলচ্চিত্রও দৃশ্য একটি মাধ্যম, কিন্তু ভিন্ন সে দুটি কারণে; প্রথমত, ক্যামেরার কারণেই এর দৃষ্টিপথ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত, আর এইটিই এ মাধ্যমের বিশেষ শক্তি যে, ক্যামেরার পেছনে যিনি— তিনি আমাদের তাঁর বিশেষ দেখার ভেতর দিয়ে আমাদের দেখাকে না-অর্থে নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত নয়, হ্যাঁ-অর্থে নিবদ্ধ ও বিশিষ্ট করে তোলেন; দ্বিতীয়ত, পূর্ব ধারণকৃত বলেই এর প্রদর্শন নাট্যাভিনয়ের তুলনায় সুলভ, এর গম্যতাও অনেক বেশি ব্যাপক।

তাই খুবই স্বাভাবিক ছিলো *লালসালু*-কে চলচ্চিত্রের শরীরে কেউ না কেউ উপস্থিত করবেন; ততদিনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলবাদীদের প্রবেশ ও ধর্মব্যবসা-ধর্মান্ধতার উত্থান দেখে আমরাও দরকার বুঝে গেছি *লালসালু*-র অন্তর-বক্তব্য আমাদেরই কাছে তুলে ধরবার; কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যমে কোনো কাজ উপস্থিত করবার জন্যে প্রথমেই যেটি দরকার— বড় বহরের আর্থিক মূলধন; ধারণা করি, এ কারণেই বহুদিন আমরা চলচ্চিত্রে *লালসালু* রচনা করতে পারি নি।

কিন্তু আছে ব্যতিক্রম, আছেন ব্যতিক্রমী মানুষ; চলচ্চিত্রে একজন আছেন তানভির মোকাম্মেল, তিনি তাঁর সকল সামান্য যা ছিলো বন্ধক রেখে, এগিয়ে এলেন

চলচ্চিত্র লালসালু রচনায়। তিনি, তানভির, এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এই বিষয়হীন চলচ্চিত্রের দেশে, এই মুক্তিযুদ্ধ জাতকের কান ঠেসে ধরা দালাল রাজনীতিকের দেশে চলচ্চিত্রে এনেছেন। তাঁকে অভিবাদন; তাঁর চলচ্চিত্র আমাদের দেখিয়ে দিলো, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র হাতে কী ভীষণ শক্তিধর বিস্ফোরকটি রোপিত হয়েছিলো এ উপন্যাসে। প্রমাণ, সিলেটে চলচ্চিত্র *লালসালু* প্রদর্শিত হচ্ছিল, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো মৌলবাদীদল, ক্ষেপিয়ে তুললো ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে, বন্ধ করে দিলো চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন এবং বন্ধ করলেন কারা ?— পুলিশ ও প্রশাসন!

লালসালু তো উপন্যাসে নয়, নাটকে নয়, চলচ্চিত্রে নয়, কোথাও তা আঘাত করে নি ধর্মকে, বরং আঘাত করেছে ধর্ম ব্যবসায়কে, ব্যক্তিস্বার্থে ধনস্বার্থে ক্ষমতাস্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করবার বিরুদ্ধেই এর বক্তব্য; এই বক্তব্য বাংলাদেশের জন্যে বড় প্রাসঙ্গিক, বিশেষ যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ কলংক যখন লিখিত হয়ে গেছে যে ইসলামের বুলি আওড়ানো মুক্তিযুদ্ধ-বিপক্ষ ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরাই আজ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত মাড়িয়ে, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে লাথি মেরে রাষ্ট্রক্ষমতার আসন দখল করেছে। মানুষের নয় নিজস্বার্থেই তো তারা ধর্মব্যবসায়ের সমালোচনাকে ধর্মের প্রতি অবমাননা দেখিয়ে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে।

কিন্তু গদ্যশৈলীর আলোচনাকালে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন কেন ? এ কথা আগেও বলেছি, আঙ্গিক লেখকের একটি উপায় মাত্র, এই উপায় অবলম্বন তাঁর বলার কথাটি বলবার জন্যে, এবং এটাই তাঁর কাজ। লেখা আমরা শিখবো, আর, লেখার ভেতর দিয়ে মানুষ, সময়, দেশ ও ইতিহাসের দিকে তাকাবো। প্রতিটি শিল্পসৃষ্টির ভেতরেই যে বিস্ফোরক পোরা থাকে, সেটি আমরা অনুভব করবো যখন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করবার পথে আমরা পা বাড়াবো, আমাদেরই অভিজ্ঞতাকে একটি স্পর্শগ্রাহ্য আকারে পেতে চাইবো। লেখকের কাজই হচ্ছে সমষ্টির অভিজ্ঞতাকে আকার দান করা— আমাদেরই কাছে আমাদের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। সামাজিক ও রাজনৈতিক লেখা এ কাজটি তো করেই, ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে যা কিছু লেখা তাও ঠিক একই কাজ করে। একজন জীবননান্দ যখন লেখেন বাংলার মুখ তিনি দেখেছেন বলে পৃথিবীর রূপ আর দেখবার সাধ তাঁর নেই, মাতৃভূমি নিয়ে এটি এক উচ্ছ্বাস বলে যতই এককালে মনে হোক, বহুকাল পরে সেটাই হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধে যাবত বাঙালির ভেতর-অগ্নি, ভেতর-প্রেরণা। ওই পঙ্‌ক্তির ভেতরেই আমরা আবিষ্কার করি এক চেতনা-বিস্ফোরক।

কালের ধুলায় লেখা

আর কয়েকটা দিন পরেই আমার জন্মদিন; আরো একটি বছর খসে যাচ্ছে আমার আয়ু থেকে; *মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে*— সেই ভুবন থেকে বিদায় নেবার বেদনাই যেন এখন আমাকে দুলিয়ে দিচ্ছে; *এমন মানব-জনম আর কি হবে*— এই বোধের ভেতরে আমার দীর্ঘশ্বাসটি এখন শ্বসিত হচ্ছে।

যেমন আমার অনেককালের অভ্যেস, প্রতি বছরই জন্মদিনের আগে-পরে আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজের একটা হিসেব নেবার চেষ্টা করি; কলম হাতে একজন লেখকেরই যাপিত জীবনের হিসেব; এবং প্রতি বছরই আমি এক দীর্ঘ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হই আমার জন্মদিনে; বলার কথা কিছুই তো বলা হলো না, তারও অধিক— ভাষা নিয়ে যে কাজ করছি এই এতকাল, সেই উপাদানটিকেও ঠিকমতো চেনা হলো না। সন্তানের মৃত্যুশোক ঠেলে একসময় জননীও যেমন আবার প্রবেশ করেন পাকশালে, ধরান উনোন, নিবিষ্ট হন সকলের জন্যে রন্ধনে, বলদায়ক সব্জি-রস উথলে পড়তে থাকে পাত্র থেকে, একসময় তেমনি আমিও আবার আমার কাজের ভেতরে নিজেকে স্থাপিত করি অতীতের সমস্ত ব্যর্থতা, অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা ভুলে গিয়ে— যেনবা আবার আমি নতুন এক লেখক, প্রথম এক যুবক, যার হাতে কলম ও সমুখে কাগজ।

আজ, এবার, হাজার বারোশ' বছর আগের একটি চীনা গল্পের কথা আমার মনে পড়ছে; এক পথিক ও শেয়ালের গল্প; কিন্তু এ গল্প নয় রূপকথা কিংবা ঈশপের গল্পের মতো উপদেশমূলক, আবার আজকের দিনে ছোটগল্প বলে যাকে জানি ঠিক তেমনটিও নয়। আজ বারবার সেই গল্পের যেটুকু মনে পড়ছে :

চীনে তখন গৃহযুদ্ধ চলছে; লোকেরা ভয়ে গ্রাম শহর বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে; স্বজনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে; এক লোক শহর ছেড়ে সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে; যেতে যেতে এক জঙ্গলের ভেতরে সে দেখতে পেলো অদ্ভুত দৃশ্য : দুটি শেয়াল খুব মজা করে একটি বই পড়ছে, পড়তে পড়তে তারা একে অপরের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আবার পড়ছে, বইটি নিয়ে তারা কাড়াকাড়ি ছুটোছুটি করছে।

লোকটির বড় কৌতূহল হয় শেয়ালেরা কী পড়ছে জানবার জন্যে; লোকটি তখন দূর থেকে গুলতি ছোঁড়ে— এক শেয়ালের চোখে লাগে, সে পালিয়ে যায়, আরেক শেয়ালের কাঁধে লাগে ঢিল, সেও পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া বইটি হাতে নিয়ে লোকটি দেখতে পায় পাতায় পাতায় বিচিত্র সব ছবি আঁকা, মনে হয় চিত্রলিপিতে কিছু লেখা, লোকটি তার মর্ম উদ্ধার করতে পারে না; বইটি নিয়ে সে আবার রওনা হয়, মনে মনে ভাবে কোনো জ্ঞানী মানুষের সন্ধান পেলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবে এই অদ্ভুত বইটিতে এমন কী লেখা আছে শেয়ালেরা এত মজা করে পড়ছিলো।

লোকটি এক শহরে এসে সরাইখানায় রাতের মতো আশ্রয় নেয়; কিছু পরে সেখানে আরেক লোক আসে রাত কাটাবার জন্যে— এ লোকটি এক চোখে কানা। অচিরেই কানা লোকটি আমাদের পথিকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, সে ওই বইটির বিষয়ে উৎসাহ দেখায়; আমাদের পথিক কানা লোকটিকে বইখানা দেখাতে যাবে এমন সময় সরাইখানা মালিকের ছোট্ট মেয়ে এসে বলে, 'তোমরা একটা শেয়ালের সঙ্গে বসে কি করছো ?'

শেয়াল ? মেয়েটা বলে কী ? অবিলম্বে পথিক টের পেয়ে যায়, এই কানা লোকটি আর কেউ নয় আসলে সেই শেয়াল, বইখানা উদ্ধার করতে এসেছে; মানুষের ছদ্মবেশ ধরলেও পথিকের গুলতির ঢিলে যে তার চোখটি কানা হয়ে গিয়েছিলো সেটা সে লুকোতে পারে নি। শিশুর চোখে আসল চেহারা তার ঠিকই ধরা পড়েছে। শেয়ালটি সঙ্গে সঙ্গে নিজ মূর্তি ধরে দৌড়ে পালিয়ে যায়; পথিক বইখানা তোরঙ্গে ভালো করে বন্ধ করে ঘুমোতে যায়; তারপর সরাইখানার বাইরে সারারাত সেই শেয়াল কড়া নাড়ে, হৌ হৌ করে ডাকে, কেউ দরোজা খুলে দেয় না; ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পথিক আবার পথে নামে।

গল্পটি এরপর এগোয় শেয়ালের বই উদ্ধার করবার বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে। বারবার সেই শেয়াল নানা ছদ্মবেশ ধরে পথিকের কাছ থেকে বইখানা কব্জা করবার চেষ্টা করে, সফল হয় না। অবশেষে পথিক দেখা পায় এক জ্ঞানী ব্যক্তির; বইখানা তাঁকে সে দেখায়; জ্ঞানী ব্যক্তিটি বইয়ের পাতা খুলেই বিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'এ-কী ? এ যে সব শাদা পাতা! কিছুই তো এখানে লেখা নেই।' ততোধিক বিস্মিত পথিকও তখন দেখতে পায় : জঙ্গলের ভেতরে সে যে দেখেছিলো চিত্রলিপিতে লেখা ছিলো অনেক কিছু— সব মিলিয়ে গেছে, পড়ে আছে শূন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।

এবারের এই আসন্ন জন্মদিনে কেন আমার বারবার মনে পড়ছে চীনের এই প্রাচীন গল্পটি ? পড়বার এতগুলো বছর পরে আজই অকস্মাৎ ? কেন ওই প্রশ্ন আমাকে তাড়না করছে এমন করে— সেই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো কেন শাদা ? একদা তো স্পষ্টই দেখা গিয়েছিলো চিত্রলিপিআঁকা, কি তবে সে সকলের ওই মুছে যাবার অর্থ ? শেয়ালই কিসের প্রতীক ? কেনই বা তারা এত কৌতুক বোধ করছিলো বইখানা পড়তে পড়তে ? কিসের জন্যে কৌতুক ? কৌতুকের লক্ষ্যই বা কে ?

সব প্রতীকই আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাঙময় হয়ে ওঠে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওইযে শাদা, আমার মনে হয়, ওটি আর কিছুই নয়— আমাদেরই স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, আমাদের লেখা অবিনশ্বর নয়। আমি এইমাত্র যা লিখেছি তা অমর একটি রচনা, এই আত্মতৃপ্তি যে-লেখকের, ওই কৌতুকের লক্ষ্য তিনিই। শেয়াল সেই চশমামণ্ডিত বাস্তববুদ্ধি যে আমাদের অলীক উচ্চাশা অবলোকন করে কৌতুক করে ওঠে। ভাষা পরাস্ত হয়, ভাষায় পাওয়া ভাবের কিছু চিত্র থেকে যায়; বস্তুত সাহিত্যপাঠের পর আমাদের অন্তর-উপলব্ধি— একেই বলি চিত্র— একেই বলি ছাপ— ওই ছাপ একের

পর এক আমাদের মনের ওপরে পড়ে। আমরা বিশেষ কোনো লেখা অভিনিবেশ নিয়ে পড়েও এককালে না এককালে তা ভুলেই যাই— রবীন্দ্রনাথের কবিতার, তলস্তয়ের উপন্যাসের, শেকসপীয়রের নাটকের অনুপুঙ্খ শব্দাবলী বিস্মৃত হই আমরা, কিন্তু থেকে যায় ছাপ; আর এইটিই বড় কথা— ছাপ ফেলে যাওয়া। ব্যক্তি আমি লেখক একদিন বিস্মৃত হবোই, আমার সাজানো শব্দাবলীও আর জ্বলজ্বল করবে না মানসপটে, কিন্তু একটি আলোকিত— যদি আমি সময়, মানুষ ও শিল্পে প্রকৃতই হয়ে থাকি অবতীর্ণ— তবে হ্যাঁ, একটি আলোকিত ভুবনই আমি রেখে যাবো; আর এখানেই একজন লেখকের জিৎ।

আমি মনে করি প্রতিদিনের পাঠকের কাছে চিরন্তন সাহিত্য বলে কিছু নেই; যা আছে তা সমকালেরই সাহিত্য; আর এই সমকালও কী দ্রুতই না অতীত হয়ে যায়; রবীন্দ্রনাথও প্রতিদিনের পাঠতালিকা থেকে শেলফে উঠে যান, মানিক বন্দোপাধ্যায় কে ?— আমরা সাধারণ পাঠক তার উত্তর দিতে পারি না! কালের ধুলায় আমরা লিখে যাই, নিরন্তর সমকালের প্রবল হাওয়া এসে সে লেখা মুছে দিয়ে যায়, সে ধুলায় আবার নতুন করে কেউ লেখে।

মানুষ মরণশীল তো বটেই, ভাষাও মরণশীল; এমনকি বাংলা ভাষা বেঁচে থাকলেও যে ভাষায় আমরা এখনই কথা বলছি, লিখছি, সেটাও মরণশীল— এক ভাষাতেই নতুন ভাষার জন্ম হয় প্রতি যুগে; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা মৃত হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যও আমাদের ব্যবহারের বাইরে চলে যায়, শেকসপীয়রের নাটক তখনকার রাস্তার লোকে বুঝতে পারলেও এখন অভিধান আর টিকার সাহায্য ছাড়া দুর্বোধ্য ঠেকে; সরল কথায়, প্রজন্মের পর প্রজন্মে লেখকদেরই হাতে জন্ম নেয় এক ভাষার ভেতরেই নতুন ভাষা। এ বিষয়ে গুরু একজনের বরাত দিই। টি এস এলিয়ট তাঁর *ফোর কোয়ারটেট্স* কাব্যের *লিট্‌ল গিডিং* পর্বে বলছেন :

গত মৌসুমের ফল খাওয়া শেষে
শূন্য ঝুড়ি লাথি মেরে ফেলে দেয় পরিতৃপ্ত প্রাণী।
গত বছরেরও শব্দবাক্য বস্তুতই গত বছরেরই,
পরবর্তী বছরের শব্দবাক্য অপেক্ষায় থাকে কোনো আলাদা স্বরের।

এলিয়টের প্রায় সমসময়ে রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন ওই ফলের উপমা ধরেই। তাঁর *শেষের কবিতা* উপন্যাসে এ সংবাদ পাওয়া যাবে। উপন্যাসের নায়ক অমিত সাহিত্য সভায় এই প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছে; সভায় একজন 'সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ বক্তা' আলোচনা করে বোঝালেন যে রবি ঠাকুরের কবিতা কবিতাই। তখন সভাপতি অমিত— সে মনে করে রবি ঠাকুর বড্ড বেশিদিন ধরে লিখছেন— উঠে বললো, *কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত।* রবীন্দ্রনাথের এটি নিজের প্রতিই নির্মল পরিহাস! কিন্তু এরই টানে যে-কথাটি অমিতের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়ে নিয়েছেন সেটি পরিহাস নয়,

খুবই জরুরি— আমাদের জন্যে, ভাষার জন্যে, সাহিত্যের জন্যে। অমিত বলছে, *এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।'*

সাহিত্যের— সাহিত্য লেখকের কলমের— ভাষার— এই মরণশীলতা— এই মৌসুমিকতা— এই নিত্যতা আমাদের বোঝা চাই, মেনে নেয়া চাই। নিত্য বা মৌসুমি বলেই তা মূল্যহীন নয়; মূল্য আছে: মূল্য কথাটার ভেতরেই আছে— অর্থনীতির পরিভাষায়— প্রয়োজন ও সরবরাহের ব্যাপার, ওতেই দর ওঠানামা করে; প্রতিটি লেখকের কাজ তাঁর নিজের ও তাঁর সময়ের প্রয়োজনটিকে অনুভব করে লেখা 'সরবরাহ' করা; সরবরাহের ভেতরেই আছে— আবারও অর্থনীতির পরিভাষায়— যোগ্য পণ্যের ব্যাপার; লেখককে সেই যোগ্যতা অর্জন করতেই হয়— কল্পনা-প্রতিভার যোগ্যতা এবং মিস্তিরির যোগ্যতা।

ভাষার পরম্পরা

এ এক সুদূর অতীত থেকে প্রবাহিত রহস্য— এই বর্তমান পর্যন্ত। যখন আমরা আমাদের জিহ্বায় উচ্চারণ করি শব্দ, উচ্চারণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যখন আমরা প্রথম যুঝে উঠে ধ্বনিতে আনি একটি শব্দ, তখন সেই শব্দ তো একই শব্দ যা আমাদের পূর্বপুরুষদের জিহ্বাতেও ফুটে উঠেছিলো— সেই আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের রক্ত ধারণ করে আমরা অগ্রসরমান, যাদের রক্ত এখনো আমাদের দেহে প্রবহমান। বস্তুত ভাষা সেই রক্তই বটে। এ হচ্ছে অতীতের সেই সূর্যটির ব্যবহার যা আমাদের বর্তমানেও দিচ্ছে উত্তাপ ও আলো; এতেই প্রতিটি বস্তু হয়ে ওঠে বস্তু, হয় উত্তপ্ত ও দৃশ্যমান।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো লন্ডনে; বহু বৎসরের ভেতরে এ সময়ে এমন বৃষ্টি আর হয় নি; আমার ছেলে দ্বিতীয় সৈয়দ হক আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দিলেন না, তিনি তাঁর গাড়িতে আমাকে ফয়েলসের বইয়ের দোকানে নামিয়ে দিয়ে বলে গেলেন, দ্যাখো, আমার কাজ আছে, বেশি বই ঘাঁটতে সময় পাবে না, আধ ঘন্টা পরে আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো।

প্রতিবাদ করে বলি, সে-কী! মাত্র তিরিশ মিনিটে কী বই দেখবো?

দ্বিতীয় আমার সময়-ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দিতে বলেন, ডেভিড মালুফ, অস্ট্রেলিয়ার লেখক, তাঁর বই খোঁজ করে দেখো। ইউ মে ফাইন্ড হিম ইন্টারেস্টিং।

দ্বিতীয় হচ্ছেন পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সঙ্গীত তাঁর নেশা, আর ভাব প্রকাশে চূড়ান্ত বৃটিশ; ওই যে একটিমাত্র শব্দ তিনি বললেন— 'ইন্টারেস্টিং', ওটা একেবারে বৃটিশ বাগ্‌ভঙ্গি— ভালোমন্দ কিছুই বলা হলো না, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো মাত্র, তুমি যদি ভালো না পাও তবে বলতে পারবে না যে আমি তোমাকে ভুল সন্ধান দিয়েছি, আমি একটা কৌতূহলের কথা বলেছি মাত্র, যদি মন্দ পাও তবে সেটাও একটা অভিজ্ঞতা যে মন্দ হলেও কত মন্দ হতে পারে!

সময় নষ্ট না করে, বইয়ের দোকানে ঢুকে সরাসরি ডেভিড মালুফের বই খোঁজ করি; তিনটি বই কিনি তাঁর— দুটি উপন্যাস ও একটি গল্পের সংকলন; যে দুটি সপ্তাহ সেবার লন্ডনে ছিলাম, বই তিনটির লেখক ডেভিড মালুফ আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকেন। আমাকে এখন বলতেই হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার এই লেখক— যিনি কবি, ছোটগল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক— এশিয়ার রক্ত যাঁর ধমনীতে, তাঁর লেখা গভীরে আমাকে স্পর্শ করেছে; তাঁর গল্প ভূগোল আমার জন্যে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়ে আছে; ভাষা-লেখকের গদ্য অর্থে নয়, মানব যে ভাষা-উপকরণ ব্যবহার করে ভাব প্রকাশ করে, সেই ভাষা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ আমাকে নতুন পথে ভাবিয়েছে; এবং তিনি আমাকে নতুন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দান করেছেন।

ডেভিড মালুফ বলছেন, *যা আমরা বলতে চাই তার আকার আসলে দান করে ভাষার পরম্পরা।* তিনি বলতে চান, ভাষা আমাদের কল্পনাকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করে যে, অনেক সময় আমরা আমাদেরই উচ্চারিত বাক্যে বিস্মিত হয়ে যাই; বিস্ময়, কেননা, বলবার বা লিখবার পর আমরা দেখতে পাই, ঠিক এই রকমটি তো আমি বলতে চাই নি বা ভাবিই নি; তবে কোথায় ছিলো এই বাক্য ?— ছিলো এই অনুভব ?— আরো গুরুতর, এই বাক্য ও অনুভব কি আসলেই আমার ?

তবে কি ডেভিড মালুফ মনে করেন, আমাদের ভেতরে বাস করে আরেকজন যে আমাদের দিয়ে বলিয়ে নেয় এবং তার ওপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ খাটে না ?— তবে কি তিনি সচেতন ভাষাশিল্পী হয়েও শেষ পর্যন্ত এটাই বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য লেখা আসলে দৈবেরই ব্যাপার ?

না, তা নয়; ডেভিড মালুফের লেখা আরো একটু খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে তিনি বলতে চান, আমরা অনবরত সংকেত গ্রহণ করি আমাদের চারপাশ থেকে; এইসব সংকেত কেবল অভিজ্ঞতার নয়, ভাষা ও ভাষা ব্যবহারেরও বটে; বস্তুত কোনো অভিজ্ঞতাই ভাষা বর্জিত বিমূর্ত কিছু নয়। এই ভাষা সংকেতগুলো আমাদের মানস-ভেতরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ও সংরক্ষিত; আমরা যখন কোনো কথা বলতে চাই, তখন এই ভাষা সংকেতগুলো আমাদের কথার ওপর ভর করে, এরই পরিণামে আমাদের মনের কথা উচ্চারণের রূপ পায়। আমরা একটু সময় নিয়ে প্রতিদিনের যে-কোনো উচ্চারণ লক্ষ করলেই এটা বুঝতে পারবো; দেখতে পাবো, সাধারণ মানুষের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবনা বর্ণনাতেও সনাক্ত করা যাচ্ছে দৈনিক পত্রিকা, রেডিও,

সিনেমা, টেলিভিশন, জনপ্রিয় উপন্যাস ও বিদ্যালয়পাঠ্য পদ্যে পাওয়া বাগ্‌ধারা, তুলনা, উপমা— এমনকি ওইসব থেকে চুরি করা অভিজ্ঞতাও! ডেভিড মালুফ আমাদের সতর্ক রাখতে চান যে, যখন আমরা সৃষ্টিশীল রচনা করবো ভাষায়, চাইকি লেখক না হয়েও সমাজের শুধুই একজনরূপে হয়ে কথা বলতে চাইবো, তখন আমাদের প্রথম কর্তব্যই হবে ওইসকল সংকেত তথা ভাষা পরম্পরা সচেতনভাবে বর্জন করা।

ডেভিড মালুফের এই পর্যবেক্ষণ আমাকে ভাবায়; অচিরে আমি দেখে উঠি, এই ভাষা-পরম্পরার সবচেয়ে করুণ শিকার হচ্ছে প্রেমিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কেরা; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্লিশে'— আমি যাকে বলি নষ্টকথা— সেই ক্লিশেরই ছড়াছড়ি এদের উচ্চারণে— কান পাতলেই শোনা যাবে উদ্যানে, পার্কে, সংসদে ও ময়দানে।

দ্য কনভারসেশন্‌স অ্যাট কার্‌লো ক্রিক উপন্যাসে ডেভিড মালুফ একটি গৌণ ঘটনার ভেতর দিয়ে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি ছেলে ভালোবাসতো একটি মেয়েকে; মেয়েটি ছেলেটিকে প্রেমের পাঠ দিতে গিয়ে তার হাতে তুলে দেয় জনপ্রিয় প্রেমের উপন্যাস; অন্ধের মতো পা হড়কে ছেলেটি উপন্যাসের জগতে হাঁটতে থাকে; সেইসকল উপন্যাস থেকে সে প্রেমের কলাপ ও ভাষা শিক্ষা করে। তারপর ছেলেটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে যে তার অনুভব ও ক্রিয়াগুলো তো তার নিজের নয়— উপন্যাসের, অপেরার, মেলোড্রামার; সে চমকে ওঠে। ডেভিড মালুফ অবশ্য এ নিয়ে অধিক অগ্রসর হন নি উপন্যাসে; তাঁর উপন্যাসের বিষয়ও এটি নয়; তিনি কেবল দেখিয়েছেন, ছেলেটি অতঃপর কীভাবে তার নিজস্ব জীবনের স্বপ্ন আর পঠিত-শ্রুত অন্যের রচিত স্বপ্নের ভেতরে মিল খোঁজায় পেতো গভীর আনন্দ; আমরা জানি এ হেন মিল খোঁজা যে-কোনো তরুণ দম্পতির কাছে সুখের একটি পরিমাপক, এবং এটাও জীবনের আরো একটি ক্লিশে।

এদিকে ভাষা সম্পর্কে ডেভিড মালুফ আমাকে যে দুঃস্বপ্নটি দান করেছেন : তার উৎস, তাঁরই ছোটগল্প *দ্য অন্‌লি স্পিকার অব হিজ টাঙ*— তাঁর ভাষার একমাত্র বক্তা।

একটি লোক; একটিই ভাষা সে জানে— তার মাতৃভাষা; সে অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী, ক্রমেই দ্রুত তার জাতি ও ভাষার মানুষ সংখ্যায় কমে আসছে; গল্পের মুহূর্তটি এই : সে ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কেউ জীবিত নেই যে তার ভাষা জানে; সে এখন তার করোটির ভেতরে বন্দি; নিশ্ছিদ্র এই বন্দিশালার দেয়াল; সে তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সকল অভিজ্ঞতা, সকল অতীত ও পুরাণ এবং সকল কথা ও উপকথা নিয়ে চুপ করে বসে আছে আমাদের সমুখে; না সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে, না আমরা পারছি তার সঙ্গে।

গল্পটি দ্রুত একবার পড়ে নিয়েই স্তম্ভিত হয়ে যাই, দ্বিতীয়বার পড়বার মতো সাহস আর আমার হয় না; রাতের অন্ধকারে আমি চমকে চমকে উঠি; বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গিয়ে থমকে থমকে যাই, ভাষা আমার মুখে

ফোটে না সহজে। লেখার টেবিলে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি; কী বোর্ডে বাংলা অক্ষর, দৈনিক পত্রিকায় বাংলা বাক্যমালা, আমার পাণ্ডুলিপি, আমারই বই, মাঝে মাঝেই আমার কাছে দুর্বোধ্য ও পাঠ-অসম্ভব বলে মনে হতে থাকে। আমি প্রশ্ন করে চলি মানুষে মানুষে সংযোগ সম্পর্কে; আমি প্রশ্ন করি, এই যে ভাষায় আমি লিখে চলেছি এ ভাষা আরো কোটি কোটি মানুষের হওয়া সত্ত্বেও আমি কি ডেভিড মালুফের গল্পের সেই ব্যক্তিই ?— কথা বলছি, কিন্তু বোঝাতে পারছি না একটিও বর্ণ ?

গল্পের কলকব্জা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প *পোস্টমাস্টার*

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন— 'রতন।' রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না; বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ।'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দু'টি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই

দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্ত-সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়া নিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন।' রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল— 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হাতের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।'

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয়

অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পর একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিত হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল— 'সে কী করে হবে।'

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে, কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন গত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া

আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।'

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না'— বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার

মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

পোস্টমাস্টার গল্পের কলকব্জা

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'পোস্টমাস্টার' হাতে নেবো এবং এর ভেতরের কলকব্জা দেখবো। সব কিছুর মতো গল্প লেখাও শিখতে হয় এবং আর অনেক কিছুর মতোই এ শেখার জন্যেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভালো শিক্ষক বাংলা ভাষায় আর নেই।

এখন আমরা 'পোস্টমাস্টার' পড়ছি। গল্পটি শুরু হলো এভাবে— *'প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়।'* এর পর একটি ছোট এবং একটি দীর্ঘ বাক্য রচনা করে গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তার আগে প্রথম এই বাক্যটির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক ভালো করে। এই বাক্যে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছি গল্পের নামচরিত্র সম্পর্কে যে, এই তার প্রথম চাকরি, অর্থাৎ এতকাল তার জীবনের যে ছন্দ, লয় ও পটভূমি ছিল তা থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসে অপরীক্ষিত, অনাবিষ্কৃত একটি ক্ষেত্রে সে পা রেখেছে। ভালো। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলেশহীন বড় সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন— *'গ্রামটি অতি সামান্য।'* আমাদের মনে, এবং পোস্টমাস্টারের মনেও যদিবা কোনো সুখ বিলাস প্রত্যাশা জেগে উঠে থাকে এই উলাপুর গ্রাম এবং এই গ্রামে তার আসা নিয়ে, এই একটি বাক্যে তা খণ্ডিত, দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। মনেই হতে পারে, আমাদের কৌতূহলকে খুঁচিয়ে চাঙ্গা করবার জন্যে, একটি কোলাহল সৃষ্টি করবার লক্ষ্যেই বুঝিবা, রবীন্দ্রনাথ এর পরের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, *'নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নতুন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।'*—এই জন্যে মনে হতে পারে, যে, এখানে কুঠি, সাহেব, পোস্ট-আপিস স্থাপন, এই জাতীয় বীর্যবান যাবতীয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু না। আমরা গল্পের ভেতরে আর কিছুদূর প্রবেশ করলেই, মাত্র এক অনুচ্ছেদ পরে দেখতে পাবো, এই বাক্যের আঘাতে যে কর্মচঞ্চল গুঞ্জন রচিত হয়েছে তা পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গতাকে অধিকতর আশাহীন বন্ধুহীন করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শুরুতেই

এভাবে, মাত্র তিনটি বাক্যে, সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদে, গল্পের বীজই নিপুণভাবে রোপন করে দিলেন। তিনটি বাক্য আলাদাভাবে আমাদের কিছু বলে না, কিন্তু একের পরে আর যখন উচ্চারিত হয়, তখন আমাদের উৎকণ্ঠিত ও কৌতূহলী করে তোলে; উৎকণ্ঠিত, কারণ আমরা শুনেছি *'গ্রামটি অতি সামান্য।'*

আমি বলেছি, একটু আগে, 'রবীন্দ্রনাথ পরের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন।'— 'উচ্চারণ' শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছি। এবার পরের অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যটি লক্ষ করুন— *'আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে।'* আমাদের ? আমাদের পোস্টমাস্টার ? রবীন্দ্রনাথ তো শুধু লিখতে পারতেন 'পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে', *'আমাদের'* কেন জুড়ে দিলেন ? কেন স্থাপন করলেন এই আত্মীয়তা ? এবং যদি এই আত্মীয়তাই তিনি স্থাপন করলেন, তবে সারা গল্পের আর কোথাও কেন, এমনকি পোস্ট-মাস্টারের ঘোর অসুখের সময়েও, তার প্রকাশ আর দেখা গেল না ? আমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করি এবং বাক্যটি আরেকবার উচ্চারণ করি, *'আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে';* আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই, 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করবার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিবেশ ও ভঙ্গি রচনা করলেন। তিনি এমন একটি আবহ তৈরি করলেন, যেন, এই গল্প এখন ঘটছে না, অতীতে ঘটে গেছে এবং এই ঘটনা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এমন একজন কেউ কোনো এক বৈঠকে শ্রোতাদের শোনাচ্ছেন। সম্ভবত মানুষের বারবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে আবার একই ভুল করবার বিষয়ে সেখানে আলাপ উঠেছিল, তখন এরই একটি উদাহরণ হিসেবে, একজন যিনি উলাপুর গ্রামে এক পোস্টমাস্টার ও তার পরিচারিকা বালিকাকে দেখেছিলেন, তার কথা বলেন এবং তার কথাটিই যেন কলমের মুখে লিখে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা গল্পপাঠ শেষ করে আবিষ্কার করতে পারবো যে, সেই কথক ভদ্রলোকটি উলাপুর গ্রামেরই; কিম্বা তিনি বাইরের যদি হন, পোস্টমাস্টার উলাপুর ছেড়ে চলে যাবার পরও সেখানে তিনি ছিলেন, তাই তিনি 'আমাদের' পোস্টমাস্টার চলে যাবার পর পরিচারিকা বালিকাটিকে লক্ষ করতে পেরেছেন, তিনি হয়তো লক্ষ করেছন নতুন পোস্টমাস্টারের প্রতি একদিন কীভাবে এই বালিকা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কীভাবে আবার নতুন পোস্টামাস্টারের জন্যে জল তোলে, বাসন মাজে, রান্নার আয়োজন করে দেয় এবং তার বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে নতুন পোস্টমাস্টারের আত্মীয়স্বজনকে সে আবার নিজের আত্মীয়জ্ঞানে সম্বোধন করতে থাকে। এর সবটাই যে আমাদের কথক ভদ্রলোকটি দেখেছেন, দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিটি কথোপকথন শুনেছেন, তা নয়; তবে তিনি সংসার-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সবটুকু তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হয় না, স্বকর্ণে শুনতে হয় না, বাকিটুকু তিনি অভিজ্ঞতা ও জীবন-জ্ঞান দিয়ে অনুমান করে নিতে পারেন। তিনি জানেন, জীবন থেমে থাকে না; জীবন পেছন ফিরে চায় না। এটা রবীন্দ্রনাথও জানেন, এ গল্পে এটাই তাঁর জানাবার কথা আমাদের, তাই

লেখক-রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে গল্পের শেষে নিজে লিখতে পারতেন— প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিলেন 'রতন', রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্যে অপেক্ষা করিয়াছিল— কিন্তু এ সত্য হলেও বড় নিষ্ঠুর সত্য এবং সেই নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করা হতো নিষ্করুণভাবে এবং শিল্প তাতে কতটা থাকতো, সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী শিল্প-সৃষ্টির একটি অটুট ভঙ্গি এই যে, তিনি নিষ্করুণভাবে কিছুই কখনো উচ্চারণ করেন নি, তিনি কঠিন সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মায়ের মতো মমতায় এবং বিস্ময়কর রকমে শিল্প সচেতনভাবে। তাই 'পোস্টমাস্টার' গল্পে জীবনের একটি বিশেষ সত্য প্রকাশের জন্যে তিনি রচনা করেছেন এই ভঙ্গি— যেন তিনি নন, অন্য কেউ ঘটনাটি দেখেছে; শিল্পের কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন স্বচ্ছ একটি মুখোশ, যেন তিনি নন, অন্য কেউ গল্পটি আমাদের বলছে।

অতএব, 'পোষ্টমাস্টার' গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম একটি কোণে এবং বিশেষ একটি দূরত্বে নিজেকে স্থাপিত করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই যে স্বচ্ছ মুখোশ পরা নতুন এক ভদ্রলোক তিনি সাজলেন, এই শিল্প-বিভ্রমটি নিশ্ছিদ্র করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অতঃপর যে বাক্যগুলো রচনা করতে লাগলেন, ক্রিয়াপদের যে-রূপ তিনি ব্যবহার করতে শুরু করলেন, তাতে পরতে পরতে এই ছবিটিই স্পষ্ট হতে থাকলো যে, আমরা এক ভদ্রলোকের কথা শুনছি তাঁর মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ সমেত। এই মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণের শ্রেষ্ঠ ফসল তিনি তুলবেন গল্পটি যখন শেষ করবেন, তিনি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করবেন যা অন্য কোনো উপায় কৌশল বা ভঙ্গিতে কখনোই নিখুঁত একটি গল্পের উপসংহার হতে পারতো না, যা নিত্যন্তই সম্পাদকীয় বক্তব্যের মতো শোনাতো, ছেঁদো দার্শনিকের হতাশার মতো বোধ হতো, গল্পের সঙ্গে কিছুতেই মিশ খেতো না, ছেঁটে ফেললেই বরং গল্পের শিল্প রক্ষিত হতো। কিন্তু না! ইনি রবীন্দ্রনাথ, মমতার সঙ্গে এঁকে উচ্চারণ করতে হবে কঠিন সত্য, এবং শিল্পের শর্তে; অতএব তিনি গল্পের ভেতরেই তৈরি করে নিয়েছেন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এমন একটি চরিত্র, যিনি এই গল্পটি বলছেন, যিনি *'আমাদের'* বলে পোস্টমাস্টারকে সম্বোধন করছেন; এর মুখ দিয়েই তো রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করাতে পারবেন, যা সরাসরি তাঁর পক্ষে উচ্চারণ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যে, *'হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।'* এই শেষাংশই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বীজকথা; কথাটি এভাবেই স্পষ্ট বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই গল্প লিখতে গিয়ে এই বিশেষ কৌশলটি তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছে— এমন একটি কথক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে— যিনি পোস্টমাস্টারকে 'আমাদের' বলে দাবি করছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঐ 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করবার পরের বাক্য থেকেই বৈঠকী ঢংটি পুরো মাত্রায় প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। লক্ষ করুন পরের বাক্য— '*জলের মাছটিকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয় এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যেসকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।*' এখানেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ। 'জলের মাছটি' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বৈঠকের মেজাজ শুধু নয় কথকের মুখোমুখী পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে উঠি; সে-মুখে বেদনা-মেশানো একখণ্ড হাসি, কারণ তিনি তো পরিণতি জানেন এই কাহিনীর এবং 'দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশ'-এর সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই তিনি কেবল এই ঘটনায় নয়, এমন আরো কিছু ঘটনার পরই কেবল করতে পেরেছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ আরেক দফা খোঁচা দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে আমরা গল্পটি শুনছি বৈঠকে অথবা এক ব্যক্তির জবানীতে। তিনি লিখলেন, '*বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। সে কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।*' আমরা লক্ষ্য করি, এই বাক্যটিতে মোটা দাগে কথাগুলো বলা হয়েছে, এবং 'কলিকাতা'র ছেলেদের প্রতি বেশ অবিচারই করা হয়েছে। 'কলিকাতা'র সব ছেলেই নিশ্চয় এরকম নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কলিকাতা'র ছেলে এবং থেকেছেন এক দীর্ঘকাল উলাপুরের মতো সামান্য না হলেও 'কলিকাতা'র তুলনায় সামান্য, অতি সামান্য শিলাইদহে। তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ মফস্বলে গিয়ে কখনো উদ্ধত বা অপ্রতিভ বোধ যে করেন নি, এ আমরা ঠাকুরবাড়ির বিষয়ে আমাদের সমস্ত খোঁজ-খবর থেকে বলতে পারি; এবং এ কথাও বলতে পারি যে, মফস্বলে গিয়ে স্বচ্ছন্দ কেবল 'কলিকাতা'র ঠাকুরবাড়ির ছেলেরাই নয়, অনেকেই বোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তবে এরকম ঢালাও একটি মন্তব্য করলেন কেন? গল্পের জন্যেই তিনি করেছেন; পোস্টমাস্টারকে তৈরি করবার জন্যেই এরকম কথা তাকে বলতে হয়েছে; এবং তিনি এ উক্তির ছিদ্র সম্পর্কেও ঘোর সচেতন; তাই গোড়া থেকেই তাঁকে ঘাট বাঁধতে হয়েছে। 'কলিকাতা'র ছেলেদের সম্পর্কে মন্তব্যটি বেমালুম মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না যদি আমরা ধরে নিই যে, গল্পটি বৈঠকে কোনো এক ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন। এই কথক ভদ্রলোক সম্পর্কে আমাদের সজাগ ভাবটা ধরে রাখবার জন্যে অতঃপর ক্রিয়াপদের রূপটিও দেখুন কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'*অথচ হাতে অধিক কাজ নাই। কখনো কখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন।*' এখান থেকে চতুর্থ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ক্রিয়াপদের রূপ এমন রাখা হয়েছে, যেন একজন কথক গল্পের ভিত কাটছেন। এবং এই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ টেনে

গেছেন সেই পর্যন্ত, যেখানে একটি বালিকা আসছে, এই প্রথম, তাঁর নাম রতন, পোস্টামাস্টারের পরিচারিকা, আসলে এ গল্পের প্রধান চরিত্র; পোস্টমাস্টারের নামাঙ্কিত হলেও এ গল্পের গাছ ফুঁড়ে বেরিয়েছে রতনের বুক চিরে। *'পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।'* গল্পের এই ভিত কাটবার কাজ শেষ হলো রতনের উল্লেখে; সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেলো ক্রিয়াপদের রূপ, এতক্ষণ ছিলো 'হয়ে-যায়-পায়-পারে'— এবার 'হইত-যাইত-পাইত-পারিত', কারণ রবীন্দ্রনাথ এখন গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করবেন, রতন ও পোস্টমাস্টারের সম্পর্ক গড়ে তুলবেন; খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ননায় তিনি যাবেন না, কারণ সেটা গল্পের প্রথম পর্যায়ের সংহত সংক্ষিপ্ত রূপাভাসের সঙ্গে বেমানান হবে, তবে একেবারে মোটা দাগেও কাজ করা হবে না, কারণ এতে আবার পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিক ফুটে উঠবে না। আসলে রতন ও পোস্টমাস্টারের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই সামান্য বস্তু ও বিষয়ের ওপর নির্ভর যে মোটা দাগের কাজে তা হাস্যকর বা দুর্বোধ্য বলেই মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই এবার স্কেচ ধরনে কিছু ছবি আঁকবেন, এবং দু'একটি ঘটনা বলবেন যা কোনো ঘটনাই নয় অথচ খুব গভীরভাবে জরুরি ঘটনা; এবং এ সবই বর্ণিত হবে ক্রিয়াপদের এমন একটি চেহারায় যা আমাদের মনে ভাব সৃষ্টি করবে যে, এ একদিনের নয়, প্রতিদিনের কথা, ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে এমন একটি আলোছায়ার খেলা। *'সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি হৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্পন উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালাইয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না— বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ।'*

এইভাবে, ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি অবলম্বন করে, ছোট ছোট ছবি এঁকে, সাধারণ বর্ণনাও সেই কথক ভদ্রলোকটির কণ্ঠে ঈষৎ বেদনায় রঞ্জিত করে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে যান গল্পের তৃতীয় পর্যায়ে— এবং এই উত্তরণটি সঙ্গে সঙ্গে আমরা সনাক্ত করতে পারি ক্রিয়াপদের নতুনতর একটি রূপের সাক্ষাতে— 'হইল-পারিল-বলিল'। এই রূপটি এই প্রথমবারের মতো এ গল্পে প্রয়োগ করলেন আমাদের গল্পকার। *'পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারা তলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ ?'* ক্রিয়াপদের এই নতুন রূপটি হঠাৎ আমাদের দুলিয়ে দিয়ে গেল; নীরব চিত্র সবাক

হয়ে উঠল; সময়ের অতীত-বর্তমান যে মিলেমিশে গিয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে, এখন আমরা নেমে পড়লাম চলমান সময়ে। উলাপুর গ্রামে এলো বর্ষা, খাল-বিল-নালা জলে ভরে উঠলো, কলকল খলখল জলের এই আগমন খুব অল্পদিনের ভেতরেই অশ্রুসাগর হয়ে দেখা দেবে, কিন্তু এখনো তার সে ভূমিকা নয়, এখন তার কাজ আমাদের গল্পে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। *'একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল, 'রতন।' তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু ঘুমোচ্ছিলে ?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'*

ক্রিয়াপদের এই রূপ ধরেই আমরা এগিয়ে যাই পোস্টমাস্টারের অসুস্থ হয়ে পড়া, রোগমুক্তি ও উলাপুর ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। গল্পের এই তৃতীয় স্তরের অন্তিমে, গল্পের শেষ বাক্যটিতে এসেই কেবল, ক্রিয়াপদের রূপটি আবার ফিরে যায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত ছোঁয়া সময়ে, যে বাক্যটি আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু এই অবিস্মরণীয় শেষ বাক্য, যা এই গল্পটি লেখার কারণ, তার আগে রয়েছে দীর্ঘশ্বাসজড়িত এই উচ্চারণ, *'হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়।'* এই উচ্চারণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন কথকের সমুখে এতক্ষণ আমরা বসে ছিলাম, তিনি এখন তাঁর কথা শেষ করে আনছেন। কিন্তু আমরা কি চমকে উঠি না এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো শুনে ? রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই রতনকে উল্লেখ করে এসেছেন 'বালিকা'; বয়স বলেছেন 'বারো-তেরো'; যদিও যে-কালের গল্প সেকালে এই বয়সে বালিকারা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে বসে আছে, তবু তিনি রতনকে এমনভাবে আঁকেন নি যাতে আমাদের মনে হতে পারে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। আমরা এতক্ষণ এমন একটি কাহিনী শুনছিলাম যাকে আমরা স্নেহ, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব— এইসব রসের অন্তর্গত বলেই বিশ্বাস করছিলাম; দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত এই একটি খেদবাক্যে আমাদের চমক ভাঙ্গলো, আমরা অস্বস্তি বোধ করে উঠলাম; গল্পটির দিকে ফিরে তাকালাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, নির্ভেজাল বাৎসল্য রসের কাহিনী নির্মাণ করতে রবীন্দ্রনাথ কলমই ধরেন নি; প্রথম থেকেই তিনি একটি প্রেম রচনা করে আসছিলেন এই গল্পে।

গল্পটি তবে আবার পড়া যাক। এবার আমরা গল্পের শুরুতেই আবিষ্কার করতে পারব— উল্লেখিত হয়েছে রতন সম্পর্কে, যে, তার *'বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।'* অর্থাৎ সে বিয়ের যোগ্য মেয়ে কিন্তু এখনো বিয়ে হয় নি। এবং এই বাক্যের কিছু পরেই পোস্টমাস্টার প্রথম যে 'রতন' বলে ডাক দেয়, সেই বাক্যটিও নতুন করে

আমাদের চোখে পড়বে। *'যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, 'রতন'।'* লক্ষ করবো কয়েকটি শব্দ— কবিহৃদয়, হৃৎকম্প, প্রদীপ; রবীন্দ্রনাথ কি যথেষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন না একটি অনুভবের যা প্রেমের দিকে অগ্রসরমান ? প্রদীপ জ্বালানো নিতান্ত একটি সাংসারিক কাজ হতে পারে, লেখক সে ঘটনা কল্পনা করেন, একটি কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কিন্তু কল্পনা করেন। আরো কিছু পরে আরো কিছু আবিষ্কার করবো আমরা। পোস্টমাস্টার তার বাড়ির গল্প করছে রতনের কাছে, *'অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি তাহার ক্ষুদ্রহৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।'* এখন আমরা না ভেবে পারবো না, রতন কি কখনো পোস্টমাস্টারের পরিবারের ভেতরে নিজেকে দেখতে পেতো ? দেখলে কী ভূমিকায় সে নিজেকে দেখত ? কেনই বা সে একদিন পোস্টমাস্টরকে বলে, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?' তখন তার উত্তরে পোস্টমাস্টার বলেছিল, 'সে কী করে হবে ?' রবীন্দ্রনাথ অচিরেই যে লিখছেন, *'সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে।'*— এ কি প্রেমের সংকেত নয় ? যার কানে একটি অসম্ভব আবদারের সঙ্গত উত্তর স্বপ্নে জাগরণে বাজে, সে প্রেমের অধিকারে রয়েছে। তবু যদি আমাদের সন্দেহ থাকে, রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই লিখেছেন কয়েকটি বাক্য পরেই, আমরা এর আগে এতটা হয়তো লক্ষ করি নি, এখন করবো এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলবো, এই তো এখানে! পোস্টামাস্টার রতনকে বলছে, *'রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে ?'* নারীহৃদয় ? বালিকা নয় ? নারী ? এ গল্পে এর আগে তো কখনো রতন নারী বলে উল্লেখিত হয় নি। পোস্টমাস্টরের বিদায় আসন্ন, এখন আর প্রচ্ছন্ন রাখা কেন ? রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, *'রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে।' পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।'*

অবাক হবার কথাই তার। কারণ, প্রেমে পোস্টমাস্টার পড়ে নি, পড়েছে রতন। একবার শুধু পোস্টমাস্টারের একটুখানি তৃষ্ণা হয়েছিল, যখন *'এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘন বর্ষায় রোগকাতর শরীর একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।'* কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কারণ, আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, গল্পের শুরুতেই আমরা জেনে

গেছি, পোস্টমাস্টার 'কলিকাতা'র ছেলে, উলাপুরে সে ডাঙায় তোলা মাছ, এবং অপরিচিত স্থানে সে উদ্ধত হলে বরং একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতো, কিন্তু দেখাই গেছে, সে দ্বিতীয় দলের মানুষ— 'অপ্রতিভ'। এবং হৃদয়হীন, অন্তত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রচনা ও রক্ষার ব্যাপারে। তাই সে নিজের প্রয়োজনে রতনকে কাছে ডাকে, কিন্তু উলাপুর ছেড়ে যাবার কথা রতনকে জানাবার প্রয়োজনটিও বোধ করে না। রতনকে যখন সে জানায়, স্মরণ করুন, *'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'*— বহু বাড়ির ভৃত্যও তার দু'চারদিন আগে খবরটা মনিবের কাছে পায়। রতনের প্রেম তার আপনার গড়া; রতনের প্রেম তার আপনার ভেতরেই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত; আমরা করুণ আর কাকে বলবো যদি একে না বলি, যখন রতন একবার, মাত্র একবার *'উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া ওঠে'*? আমরা জীবনের কঠিন সত্য আর কাকে বলবো যদি একে না বলি যখন আমাদের *'দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে'*?

পোস্টমাস্টার, মাত্র দু'হাজার শব্দে, মাত্রই দুটি চরিত্র নিয়ে রচিত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি প্রেমের গল্পই শুধু নয়, আমি মনে করি জটিলতম একটি গল্প— অনুভবের দিক থেকে এবং নির্মাণের দিক থেকে। এ গল্পের কলকব্জা কিছুটা খুলেই আমরা দেখতে পেয়েছি কত সূক্ষ্ম এর কারিগরি এবং অতঃপর আমাদের কেউ কেউ সারল্যের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কি এর কারিগরি দিক বিস্তারিত ভেবে নিয়েই গল্পটি লিখেছেন, অথবা তাঁর হাতে *'এসে গেছে'*? আবারো বলতে হয়, সবকিছুর মতো গল্প লেখাও শিখতে হয়, কোনো কিছুই 'এসে যায়' না। তবে, এক অর্থে 'এসে যায়', যখন দুটি বিষয়ে গল্প-লেখক অধিকারী থাকেন। এক, এই যে আমি দেখছি, আমার আগেও অনেকে দেখেছে, আমার পরেও অনেকে দেখবে, কিন্তু যেমন আমি দেখেছি তেমন করে আর কেউ কখনো দেখে নি, অতএব আমাকে লিখতেই হচ্ছে। দুই, মহৎ বক্তব্য মহৎ শিল্প তৈরি করে না, মহৎ বক্তব্যই বরং এ জগতে বড় সুলভে বিনা যাঞ্চায় পাওয়া যায়; মহৎ বক্তব্য মহৎ শিল্পে অনূদিত হয় শুধু কারিগরি দক্ষতা ও উদ্ভাবন বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প *নিশীথে*

'ডাক্তার! ডাক্তার!'

জ্বালাতন করিল! এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, 'আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।'

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, 'আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।'

দক্ষিণাচরণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।'

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাকবাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণ বাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু, যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবলথাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'আঃ, করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।'

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, 'পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত ল্যাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের

অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, 'ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার সেই বাগানে গিয়া বসিব।'

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে গাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।'

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, 'কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।'

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পরিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাতেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, 'একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।' আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, 'যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।'

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা— ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, 'যতদিন এই দেহে জীবন আছে—'

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, 'নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!'

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, 'এ জীবনে আর-কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।'

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম, তিনি এমন সুগভীর স্নেহ

অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম— মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারান বাবুকে বলিতেছেন, 'ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ঔষধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।'

ডাক্তার বলিলেন, 'ছি, এমন কথা বলিবেন না।'

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, 'এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।'

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চয়ের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণ বাবু অনেক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, 'আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।' জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি, এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে!'— তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'ও কে! ও কে গো!'

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, 'আমি চিনি না।' বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, 'ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!'

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, 'আপনি আসুন।' আমাকে বলিলেন, 'আলোটা ধরো।'

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, 'এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।'

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দু'টি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিয়া বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, 'বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে?'

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।'

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, 'উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।'

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, ইনি এই বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?'

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, 'আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।'

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।'

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না।' বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?'

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।'

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, 'উঃ বড়ো গরম!' বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটা ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, 'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।'

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া— গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?'

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'শুনিতে পাও নাই, সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?'

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, 'সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?'

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেক দিন পর ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খাড়ি ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের

কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রাহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাত ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছ।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মুর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, 'ও কে ? ও কে ? ও কে ?'

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র

দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ও কে ? ও কে ? ও কে গো ?'

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল— যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো।' আমার বুকের রক্তে ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে গো।' ও কে, সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গে।'

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, 'একটু জল খান!'

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে দিতে জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, 'ডাক্তার! ডাক্তার!'

নিশীথে গল্পের কলকব্জা

'নিশীথে'— রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্প, বাংলা ১৩০১ সনের মাঘ মাসে রচিত; এর নির্মাণ আমাদের নিয়ে যায় কিছু বিস্ময় এবং আবিষ্কারের ভেতরে।

অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে বাংলা ভাষায় গল্প, যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি ভূতের গল্প, ভয়ের গল্প, বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল লোকমুখে; বস্তুতপক্ষে, অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা মানুষের সাধারণ একটি সামাজিক প্রতিভা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের আর কোনো লেখক সাহিত্যের জন্যে এই বিশেষ উপাদানটি হাতে নিয়েছেন বলে জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ যদিও 'নিশীথে'র বছর দুয়েক আগে লিখে ফেলেছেন 'কঙ্কাল', যেখানে অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে তাঁর প্রথম নাড়াচাড়া, কিন্তু ভয়ের চেয়ে স্মিত কৌতূহলই সেখানে বরং বেশি কাজ করেছে, এবং 'কঙ্কাল'-এর পরের বছর 'জীবিত ও মৃত', যেখানে তাঁর অসামান্য পরীক্ষাটি, যে, বাস্তবতার ষোলো আনা ভেতরে থেকেও অতিপ্রাকৃত এক আবহ রচনা করা যায় কীভাবে;— বলা যায়, 'নিথীথে'ই তিনি লিখলেন আমাদের সাহিত্যের প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্পটি সত্যিকার অর্থে। এখনই আমরা জেনে রাখি না কেন, যে, এর মাত্র ছ'মাসের মাথায়, ১৩০২ সনের শ্রাবণ মাসে, ভাবতে ভালো লাগে বৃষ্টিমথিত কোনো রাতে, রবীন্দ্রনাথ লিখবেন, আগামী একশো বছরের জন্যে তো বটেই, তারও বেশি কিনা কে জানে, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্পটি— 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

কিন্তু 'নিশীথে'র সূত্রে যে আবিষ্কারের কথা বলেছি তা এ সবে নয়, এ নিতান্তই তথ্য; তথ্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য স্তরে এ আবিষ্কারটিতে আমরা পা রাখব। তবে তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, তার আগে 'নিশীথে'র বিস্ময় ও প্রশ্নগুলোর দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

বিস্ময় তো নামেই; রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে যে নব্বইটি ছোটগল্প লিখেছেন তার কোনোটির সঙ্গে আমাদের হাতের এই গল্পটির নাম মেলে না— 'নিশীথে'। যেমন মনে আসে, তাঁর কিছু গল্পের নাম উচ্চারণ করা যাক— ঘাটের কথা, মুক্তির উপায়, দান-প্রতিদান, ইচ্ছাপূরণ, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, অতিথি, আপদ, মণিহারা, মানভঞ্জন, কাবুলিওয়ালা। না, 'নিশীথে'র সঙ্গে এরা মেলে না; রবীন্দ্রনাথের সব গল্পের নাম একদিকে, এ গল্পের নাম আরেক দিকে, একা; তাঁর নব্বইটি গল্পের নামের তালিকার দিকে তাকিয়ে আমরা এবার আরো একটি সংবাদ পাই— একমাত্র তাঁর 'নিশীথে' ছাড়া আর কোনো গল্পের নাম এ-কার দিয়ে শেষ হয় নি। তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গল্প বা উপন্যাসের নাম এ-কারান্ত নয়; আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, 'নিশীথে'র পূর্ব পর্যন্ত গোটা বাংলা সাহিত্যেই এরকম এ-কারান্ত একটি শব্দ নিয়ে কোনো গল্প বা উপন্যাসের নাম নেই; আমাদের আরো বিস্ময়, 'নিশীথে'র পরেও বহুদিন পর্যন্ত এটিও তাঁর কলমে একটিই মাত্র উদাহরণ। আমাদের কারো

কারো হয়তো মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ নিজে আর একবার মাত্র তাঁর একটি কথার নাম এ-কারান্ত দিয়ে রেখেছিলেন— 'ঘরে বাইরে'; এই নামে আভিধানিক অর্থের চেয়ে কোনো পরিস্থিতিযুগলকেই বেশি প্রকাশ করছে; খুব মনোযোগ না করলে এ-কার দুটি ভালো করে শোনাও যায় না; কিন্তু 'নিশীথে'র বেলায় ঐ একই এ-কার ধাতব ধ্বনির মতো বেজে ওঠে, যেনবা ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি, এই ধ্বনি আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে বহে যায়, গল্পের জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠি।

গল্পটি সামান্যকথায় এই যে, এক ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে জ্যোৎস্নার ভেতরে বলেছিলেন, 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।' কথাটি শুনে তাঁর স্ত্রী হেসে উঠেছিলেন। সেই স্ত্রী যখন মৃত্যুর দিন গুনছেন, এক সন্ধ্যায়, স্বামী তাঁর শয্যাপাশে, এক যুবতী এসে দরোজায় দাঁড়ায়। এই যুবতী সম্পর্কে স্বামীটির দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল, স্ত্রী যখন অপরিচিতাকে দেখে চমকে প্রশ্ন করলেন, 'ও কে?' স্বামী অপরাধ গোপনের তাৎক্ষণিক চেষ্টায় বলে ফেললেন, 'আমি চিনি না।' পর মুহূর্তেই অবশ্য তিনি সত্যি কথাটা বলেছেন, 'ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা।' কিন্তু এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই এ গল্পের যাবত প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়ে গেল, এখন বাকি রইল শুধু শস্যছেদন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীটি ওই ডাক্তার বাবুর কন্যাকে বিয়ে করেন, কিন্তু একটি হাসি তাকে তাড়া করে ফেরে, একটি প্রশ্ন 'ও কে? ও কে? ও কে গো?' তাঁর হৃদযন্ত্রের ধ্বনির চেয়েও বিকট হয়ে বাজে; তাঁর জীবন থেকে সুখ, স্বস্তি, সাহস আশাহীনভাবে বিদায় নেয়।

গল্পের নাম দেবার যে অভ্যেস আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথে, আমাদের আপত্তি করবার কিছুই থাকতো না যদি তিনি এ গল্পের নাম দিতেন, তাঁরই অন্য কিছু গল্পের নাম ধার করছি, 'জীবিত ও মৃত'—বটেই তো, 'নিশীথে' গল্পে জীবিত ও মৃতের টানাপোড়েন; কিংবা 'প্রতিহিংসা'— আমরা এরও যৌক্তিকতা খুঁজে পেতাম; 'নষ্টনীড়'—এছাড়া আর কী তবে? 'কর্মফল'— তাও নিতান্ত মন্দ হতো না, কাজ চলে যেতো; অথবা 'নিশীথে'র একেবারে কাছাকাছি 'একরাত্রি'; কিংবা শুধুই 'নিশীথ'।

কিন্তু 'নিশীথে'? আমরা চমকে উঠি। যেন ১৩০১ সনের নয়, আরো পরের, যাকে আমরা তিরিশের দশক বলি যেন সেই দশকের কোনো গল্প; যেন রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর পরের কোনো লেখকের লেখা গল্পের এটি নাম। বাংলা ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি, সেই প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই কোনো গল্পের নাম হতে পারতো 'নিশীথে'; লেখার চল্লিশ বছর পরেও এ নাম রবীন্দ্রনাথের অনুজ এক লেখকের কলমে এতটুকু বেমানান হতো না। তবে কি আমরা বলবো, কাল ডিঙিয়ে গল্পের এহেন নামকরণ নিতান্ত আকস্মিক? যিনি আমাদের ভাষায় লেখার এতবড় একজন কারিগর, তাঁর লেখায় কোনো কিছু দৈববশে, খেয়ালবশে, বিনা অভিপ্রায়ে আসবে, এ হতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথেরই অন্য কোনো গল্পের সঙ্গে যখন এই গল্পটির নামের কোনো আত্মীয়তা নেই, তখন নিশ্চয়ই আমরা জানবো এর কারণ আছে; আমরা সেই অভাবিত অপূর্বতার কারণ খুঁজবো আর কোথাও নয়, এই গল্পেরই ভেতরে।

এই গল্পের দ্বিতীয় বিস্ময় এর প্রথম তিনটি বাক্য। আড়াইটে বলা সঙ্গত; কারণ তৃতীয় বাক্যটি অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে। পড়া যাক।

'ডাক্তার। ডাক্তার।'

'জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—'

গল্প শুরু হয়েছে সংলাপ দিয়ে; আমরা লক্ষ করবো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের নব্বইটি ছোট গল্পের ভেতরে এই 'নিশীথে'র দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে লেখা আর মাত্র একটি গল্প 'শেষের রাত্রি' শুরু করেছেন সংলাপ দিয়ে। আর একটু এগিয়ে লক্ষ করব, 'শেষের রাত্রি'র উদাহরণ সত্ত্বেও, 'নিশীথে' সংলাপ দিয়ে শুরু হবার ক্ষেত্রে অনন্য, কারণ, এখানে বক্তার কোনো ইঙ্গিত অবিলম্বে দেয়া হয় নি, দেহহীন একটি উচ্চারণ হিসেবে সংলাপটি এসেছে। তৃতীয় যে বাক্যটি অসমাপ্ত রাখা হয়েছে— *'এই অর্ধেক রাত্রে—'* যা কিনা ডাক্তার ভদ্রলোকটিরই স্বগতোক্তি, আমাদের কৌতূহলী করে তোলে যে, কে ডাকছে। এবং আমরা সংবাদ পেয়ে যাই— *'চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।'* আমরা জানতে চাই রবীন্দ্রনাথ কোন ফললাভের আশায় সংলাপ দিয়ে গল্প শুরু করবার মতো তাঁর অভ্যেসের বাইরে প্রায় নজিরহীন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যার নজিরও গোটা রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে হাতে গোনা দু'চারটের বেশি পাওয়া যায় না।

আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন এই গল্পের বীজ হাতে নিয়েছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন এর চরিত্রগুলো বাস্তব, ঘটনা বাস্তব, সমস্যা বাস্তব, কিন্তু গল্পটির আসল ক্ষেত্র কল্পনা— দক্ষিণাচরণবাবুর, এবং একমাত্র তাঁরই করোটির অভ্যন্তরে সে কল্পনা। স্মরণ করা যাক গল্পের একেবারে শেষ দিকে এ গল্পের দীর্ঘতম বাক্যটি; দক্ষিণাচরণবাবু পদ্মার বুকে রাতের পাখির ঝাঁক উড়ে যাবার শব্দ শুনেছেন, আগেও একবার এরকম শব্দ তিনি শুনেছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল ওটা তাঁর মৃত পত্নীর *'মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার'*; এবার সেই *'হাহা করিয়া একটা হাসি'* তাঁর বর্ণনায়, *'পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুষুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল— যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্ম মৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল*

তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না'। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করবো এই কথাটি, '*আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে*'— এবং তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবো রবীন্দ্রনাথকে এ গল্পের জন্যে কোন সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো।

সমস্যাটি এই ছিলো, সংক্ষেপে— মাথার ভেতরে অনন্ত যে আকাশ, তার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার দূরত্ব বিনাশ করা। যে-গল্প করোটির ভেতরে ঘটছে, যে-গল্প আসলেই হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যাচ্ছে না, সেই গল্পটিকে পেশী দেয়া যায় কী উপায়ে— এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের নির্ণয় করে নেবার সমস্যা। যে-কোনো সৃষ্টিশীল লেখককেই লেখার আগে এই একটি কাজ করে নিতে হয়— কারিগরি দিকটি ভেবে নিতে হয়; এবং যে সিদ্ধান্তই তিনি নিন না কেন তা ব্যাকরণ দিয়ে বোঝা যাবে না, নিয়মের গজকাঠি ফেলে মাপা যাবে না, সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল কিনা জানতে হলে পুরো লেখাটাই লিখে ফেলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, আমরা জানি না, 'নিশীথে'র কারিগরি দিক ভাবতে কতটা সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু গল্পটি পড়ে এবং পরীক্ষা করে এখন আমরা জানি তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, এ গল্প তিনি লিখবেন তাঁর অন্যান্য গল্পের চেয়ে অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য করে— যেনবা, একালে হলে বলা যেতো, সবাক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো করে। বস্তুতপক্ষে আমরা 'নিশীথে'র বাক্যের পর বাক্যে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে দেখি, রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সমস্ত কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ, আকারসম্পন্ন করে তুলতে চাইছেন। যেমন চোখে পড়ে তেমন কিছু বাক্য আমরা দেখি না কেন? '*তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া ছিলেন।*'.এবং '*তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্ত গগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।*' এবং '*এমন সময় অন্ধকার ঝাউ গাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল।*' এবং '*তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে।*' এবং '*গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে।*'আমরা লক্ষ করবো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য গল্পের তুলনায় আরো কিছু অধিক এগিয়ে কীভাবে আমাদের সমুখে চিত্রের পর চিত্র রচনা করে চলেছেন, বিমূর্তকে মূর্তরূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

করোটির ভেতরের গল্পকে এরকম দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার শরীরে প্রকাশ করা— হঠাৎ মনে হতে পারে এর ভেতরে পরস্পর বিরোধিতা আছে; কিন্তু ইনি রবীন্দ্রনাথ, এবং আকাশ ও ভূমির একই সমতলে অবস্থান তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সবাক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কথা বলেছি, কতটা দৃষ্টিগ্রাহ্য করে এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করতে চেয়েছেন বোঝাতে। দেখা যাক চিত্রনাট্যের চোখ দিয়েই এ গল্পের প্রথম কয়েকটি বাক্য। অবিকল চিত্রনাট্যের ভঙ্গিতেই শুরু করা হয়েছে গল্পটি,

প্রথম শট— ঘুমিয়ে আছে ডাক্তার, তার ওপরে নেপথ্য ডাক, 'ডাক্তার। ডাক্তার।' সে বড় বিরক্তি নিয়ে চোখ মেলে, যার ভাষারূপ 'জ্বালাতন করিল,' একই শটে সে পাশ ফেরে, পিছিয়ে আসে ক্যামেরা, বিছানার পাশে টেবিল ঘড়ি একটুখানি দেখা যায়, ডাক্তার চোখ মেলে তাকায়। দ্বিতীয় শট— ডাক্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে— জমিদারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তৃতীয় শট— ডাক্তার ধড়ফড় করে উঠে বসে, জমিদারকে বসতে দেয়, ডাক্তার আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। চতুর্থ শট— ঘড়িতে আড়াইটে বাজে।

'নিশীথে' গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবে চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে, কান দিয়ে শোনা হয়েছে; যেনবা সবাক চলচ্চিত্রের আগেই রবীন্দ্রনাথের হাতে চিত্রনাট্যের পূর্বাভাষ এই রচনায়; আমরা লক্ষ করি, কীভাবে কখনো চিত্র, কখনো ধ্বনি, কখনো আবার চিত্র ও ধ্বনি একই সঙ্গে, এবং শেষ পর্যন্ত শুধু ধ্বনি এই গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধ্বনির শেষ প্রধান কাজটি— *'সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, 'ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।'* আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, আমরা ঘড়ির শব্দের সঙ্গে, প্রথমা স্ত্রীর ব্যাকুল প্রশ্নটির এবং দক্ষিণাচরণবাবুর হৃদস্পন্দনের এক শব্দ-মিশ্রণ শ্রবণ করে উঠি, বস্তুতপক্ষে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের কাছে এই ধ্বনিস্পন্দন জগতের একমাত্র স্পন্দন হয়ে ওঠে। এবং এরপর যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের ফিরিয়ে আনেন আমাদের ভেতরে, দক্ষিণাচরণবাবুকে ডাক্তারের সমুখে, দেখুন কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি সম্পাদন করেন তিনি। *'আমি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, 'একটু জল খান।' এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল।'* ধাপগুলো হিসেব করি— কেরোসিনের বাতি নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে জোরালো আলো, দিনের প্রথম আলোয় ঘর জেগে উঠল। তখন জানালার বাইরে লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন উর্ধ্ব আকাশে, যেখানে দিনের উৎস, তারপর একটু নিচে, কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে, আরো নিচে চোখ রাখছি এবার— দোয়েল, এবং আরো নিচে, এখন মাটিতে পৌঁছে গেছি আমরা— মহিষের গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চলেছে। এই যে চিত্র এবং ধ্বনির ব্যবহার, এ ছিলো রবীন্দ্রনাথের কারিগরি সিদ্ধান্ত এই গল্পটির জন্যে।

তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিলো, বাস্তবতার শরীরে এ গল্প ধরাবেন। তাই লক্ষ করি, মাথার মধ্যে সেই অনন্ত আকাশ, একটি ধ্বনির কিছুতেই 'মস্তিষ্কের সীমা' ছাড়াতে না পারা এবং জগতের অন্তঃস্থল পর্যন্ত 'ও কে, ও কে গো'-র অভিঘাত শোনা, এই উন্মত্ততার ভেতরে ঠেলে দেবার পূর্ব পর্যন্ত খোঁচা দিয়ে আমাদের জাগিয়ে রাখবার

জন্যে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পটিকে মাঝপথে তিন তিনবার থামিয়ে দিয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারব, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে বক্তা সেই যে একবার গল্প শুরু করলেন, যখন থামলেন তখন রবীন্দ্রনাথেরও গল্প শেষ; একইভাবে টানা শেষ হয়েছে 'মণিহারা'; কিন্তু 'নিশীথে' এর ব্যতিক্রম, গল্পের বক্তা দক্ষিণাচরণবাবু তিনবার থেমেছেন গল্প বলতে গিয়ে। এবং এই তিনবারই যে কারণ দেখিয়ে গল্প থামানো হয়েছে, আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে— দরকার ছিল কি ? প্রথমবার যেখানে গল্প থামানো হয়েছে, থামিয়ে যে-অনুচ্ছেদটি রচনা করা হয়েছে তা কার্যত আমাদের কিছুই বলে না। *'এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভনভন শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—'* এই অংশটি বাদ দিয়ে আমরা যদি পড়ি তাহলে গল্পের এই জায়গাটা দাঁড়ায় এরকম— *'ডাক্তার বলিল, 'একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।' আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম। সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।'* আমরা কি ধরতে পারি যে 'এলাহাবাদে গেলাম' আর 'সেখানে হারান ডাক্তার'— এর মাঝখানে ছিল ছেদ এবং ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি ?

দ্বিতীয়বার যেখানে গল্পে বাধা দেয়া হয়েছে, সেখানেও যে ছোট্ট অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তা না থাকলে এবং গল্প একটানে এগিয়ে গেলে ক্ষতি ছিলো না বলেই আবারো আমাদের মনে হবে। তৃতীয়বার যেখানে গল্পে বাধা দেয়া হয়েছে, সেখানে ছোট্ট একটা কথা উঠতে পারে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর দক্ষিণাবাবুর দ্বিতীয় বিয়ে করার মাঝখানে একটু সময় দেয়া দরকার, তাই গল্পে ছেদ আনবার কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি টেঁকে না, কারণ, আগের দু'বার যদি টানা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো গল্প, তাহলে এখানেও রবীন্দ্রনাথ একটি কোনো বাক্য দক্ষিণাবাবুর মুখে বসিয়ে দিয়ে তরতর করে এগিয়ে যেতে পারতেন; হয়তো একটি সম্পূর্ণ বাক্যেরও দরকার হতো না, বাক্যাংশই যথেষ্ট হতো, যেমন— 'কিছু দিন পর', তিনি লিখতে পারতেন 'কিছুদিন পর মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিলো, শেষ অভিঘাতের জন্য আমাদের প্রস্তুত করা, বারবার বাস্তবে ফিরিয়ে এনে আমাদের শেষ ধাক্কাটি দেওয়া।

গল্পে তৃতীয়বার বাধা দেবার জায়গাটি হচ্ছে— *'ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।'* এরপর দক্ষিণাচরণবাবু জল খেলেন; এবং এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে দিলেন, আমরা দক্ষিণাচরণবাবুর মুখে গল্প শুনছিলাম; রবীন্দ্রনাথ যেন গল্প থামিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, এ গল্পের শোক তাপ পাপ কৌতূহল যদি আমাদের মনে কিছুমাত্র

সঞ্চারিত হয়েও থাকে, আমরা তবু নিরাপদেই অদগ্ধ অবস্থায় আমাদের বাস্তবে ফিরে আসতে পারব। এরপর যখন রবীন্দ্রনাথ আবার গল্প শুরু করবেন, একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর থামবেন না এবং এতক্ষণ ধরে তিনি যে পুঙ্খানপুঙ্খ বর্ণনা, চিত্রের পর চিত্র, রচনা করে আসছিলেন এবার তার সঙ্গে যোগ করবেন নতুন এক মাত্রা— ধ্বনি এবং ভয়াবহভাবে মথিত মিশ্রিত ওই এক ধ্বনি দিয়েই তিনি শেষ করবেন গল্প। 'নিশীথে'র এই শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই গোটা চারেক বাক্যে কয়েকটি দরকারী তথ্য দিয়ে শিল্পের ইন্দ্রজাল দ্রুত সৃষ্টি করতে থাকবেন এভাবে— *'একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছমছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।'* লক্ষ করবো, রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের প্রস্তুত করছেন পরিণতির জন্যে, ক্ষেত্র তৈরি করছেন, লিখছেন এ গল্পে এই প্রথম— 'ছমছমে অন্ধকার', আমাদের কান তৈরি করছেন 'পাখিদের ডানা ঝাড়ার শব্দ' বলে, কারণ, আজ, এই সন্ধ্যাবেলাতেই 'ঝাউগাছের শিখরদেশে' আগুন ধরিয়ে চাঁদ ওঠাবেন তিনি, দক্ষিণাচরণবাবুকে দিয়ে বলাবেন— *'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।'* অতঃপর দক্ষিণাচরণবাবুকে দিয়ে ডাক্তারের মারফত আমাদের বলাবেন— *'কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।'* আমাদের আর সন্দেহ থাকে না, রবীন্দ্রনাথ যে 'পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ' বা তার অনুপস্থিতি একটু আগে উল্লেখ করেছিলেন তা ছিলো গভীরভাবে পরিকল্পিত, কারণ, পাখিদের দিয়েই তো তিনি এবার এক বিপর্যস্ত মনের সঙ্কেত আমাদের দিতে থাকবেন। দেখতে পাবো, এরপর আবার, পদ্মার চরে জ্যোৎস্নার ভেতরে মনোরমার মুখ চুম্বন করবার সঙ্গে সঙ্গে— *'গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ও কে? ও কে? ও কে?' আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক।'* আমাদের মনে পড়বে, গল্প শেষ হয়ে যাবার পর, রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের জাগিয়ে তোলেন, আমাদেরই ভেতর আবার ফিরিয়ে আনেন আমাদের, তখন যে চারটি চিত্র ও ধ্বনি তিনি প্রয়োগ করে, বাক্যটি আমি কিছু আগেই উদ্ধৃত করেছি, তার দুটিই পাখিদের।

আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছি, গল্পের কারিগর হিসেবে কী ছিলো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়; তিনি চেয়েছেন, করোটির ভেতরে গল্পটিকে বলবেন

আপাতদৃষ্টে উল্টো এক ভঙ্গি ও আঙ্গিকে এবং এভাবে বাস্তবের গায়ে কল্পনার ও কল্পনার গায়ে বাস্তবের চাপড় মারতে মারতে, পাঠককে ডানে বাঁয়ে অবিরাম ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই তিনি চিত্রনাট্যের পূর্বাভাষ সম্বলিত চোখ ও কান ব্যবহার করেছেন, অপ্রত্যাশিত ও নজিরবিহীনভাবে সংলাপ দিয়ে গল্প শুরু করেছেন, গল্প ঘন করে তুলেও মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন তিন তিন বার, গল্পের চারটি অংশের প্রথম তিনটি পর্যন্ত আমাদের তিনি রেখেছেন ভূমির স্তরে, তৃতীয় অংশ পর্যন্ত আমাদের তিনি এমন বিভ্রান্ত রেখেছেন যেন আমরা যে-গল্প শুনছি তার উপাদানগুলো যেমন বাস্তব, পরিণতিও হবে তেমনই বাস্তব— দ্বিতীয় বিয়ে মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এতক্ষণে আমরা প্রস্তুত হয়েছি একটি আবিষ্কারের জন্যে; সেই যে আমরা শুরুতে বলেছিলাম গল্পের নাম নিয়ে কিছু কথা; 'নিশীথে' নামের এই অভাবিত অপূর্বতার কারণটি এখন আমরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করবো।

গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণ, তিনি জমিদার; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কল্পনা করেছেন সংবেদনশীল একজন মানুষ হিসেবেই কেবল নয়, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হিসেবেও। দক্ষিণাচরণের নিজের কথাতেই, *'কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।'* আমরা দেখি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থাতেও তিনি কালিদাসের শ্লোক স্মৃতি থেকে নির্ভুল উদ্ধৃত করতে পারেন। আমরা প্রমাণ পাই, জীবনের কঠিন সত্য এই ব্যক্তিটির কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো না; বরং তাঁর প্রথমা স্ত্রী তুলনায় অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন; স্মরণ হয় আমাদের, দক্ষিণাচরণ যখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে এ গল্পের শুরুর দিকে বলেছিলেন, *'তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালেই ভুলিব না'* তখন এর শূন্যগর্ভতা চোখে পড়েছিলো তাঁর স্ত্রীর এবং কথাটি শুনে তিনি হেসে উঠেছিলেন। আমরা আরো লক্ষ করবো, দক্ষিণাচরণ লম্পট নন; স্ত্রী বর্তমানেও তিনি যে অন্য যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, সে কখন? যখন *'এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম।'*— সেই তখন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং কারো কারো ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে জানি, মৃত্যুর সমুখে দিনের পর দিন বসে থাকা যায় না, চোখের ওপর উদ্যত স্তম্ভিত মৃত্যু রাতের পর রাত অবলোকন করা যায় না— এই হচ্ছে সর্বকালের সর্বদেশের জীবনের কঠিন সত্য। আমরা আরো স্মরণ করবো, দক্ষিণাচরণ যে-কালের মানুষ তখনকার মূল্যবোধ, জীবন যাপন ও সামাজিক আচরণের কথা। আমরা দেখতে পাবো, 'নিশীথে'র কালে এবং সমাজে, পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ে তো গ্লানিকর নয়ই, স্ত্রীবর্তমানে রক্ষিতাপোষণ ও বারবনিতাগমন পর্যন্ত চিত্তের ও সমাজের সুস্থতা নষ্ট করতো না।

এবার আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি, দক্ষিণাচরণ এমন কিছু করেন নি যার জন্যে সমাজ তাঁকে তিরস্কার করবে, নিজে তিনি নিজের কাছে খাটো হবেন, তাঁর রাতের ঘুম হরে যাবে। আমরা স্বীকার করে নিতে পারি, দক্ষিণাচরণ তাঁর স্ত্রী-বর্তমানে মনোরমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনোরমাকে বিয়ে করে, তাঁর

কালের বিচারে খুব সাধারণ একটি ঘটনার ভেতর দিয়েই গেছেন। কিন্তু গল্পের দক্ষিণাচরণকে আমরা দেখেছি, তিনি পাপবোধে জর্জরিত, গ্লানিতে নিমজ্জিত, অনুতাপে দগ্ধ এবং শোবার ঘরে মনোরমাকে নিদ্রিত রেখে, জমিদার হিসেবে নিজের অবস্থান ও মর্যাদা ভুলে, তাঁরই বেতন-ভোগী পল্লীর এক চিকিৎসকের কাছে রাত আড়াইটেয় ছুটে গেছেন— না, কোনো ওষুধের জন্যে নয়, অন্তরের গোপনতম পাপটি স্বীকার করে চিকিৎসিত তথা অনুশোচনা থেকে কিছু পরিমাণে হলেও মুক্ত হতে। গল্পের শেষ ব্যাক্যটিতে আমরা যে পড়ি, *'সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, 'ডাক্তার। ডাক্তার।'*— আমরা জানি, আজো তিনি ওষুধের জন্যে নয়, স্বীকারোক্তির জন্যেই এসেছেন; কিন্তু আমাদের শঙ্কা এই, চিরদিনের মতো নিজের কাছে নিজে তিনি ধিক্কৃত হয়ে থাকবেন, পাপবোধ এ জীবনে তাঁকে আর ত্যাগ করবে না। হোন না তিনি সংবেদনশীল ও কালিদাসের কাব্যরসিক, এই পরিস্থিতি ও পরিণতি তাঁর কালের একজন বড় মানুষের পক্ষে অচিন্তিত এবং অপ্রত্যাশিত।

আমরা এখন সনাক্ত করতে পারছি, দক্ষিণাচরণের মানসিক এই প্রতিক্রিয়া আদৌ তাঁর স্বকালের নয়, এটা আরো অন্তত দুটি প্রজন্মের পরের মানুষের প্রতিক্রিয়া। তাই 'নিশীথে'র সামাজিক পটভূমি এবং রচিত গল্পটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে এখন আমরা বলতে পারি, কালের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা একটি গল্প লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পটির আঙ্গিকেই দূর ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দিয়েছেন— সবাক চলচ্চিত্রের বহু আগেই এ গল্পে তিনি ব্যবহার করেছেন চিত্রন্যাট্যের চোখ এবং এর নামকরণে তিরিশ দশকের কলম। বলতে পারি, বিষয় এবং আঙ্গিকের এমন চমকপ্রদ সমাহার রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গল্পে আমি দেখি নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র-র গল্প *তেলেনাপোতা আবিষ্কার*

শনি ও মঙ্গলের— মঙ্গলই হবে বোধ হয়— যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়— আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে— পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চ'লে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু'ধারে বাঁশঝাড় আর বড়ো-বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু'জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎসলুব্ধ নয়, তবু এ-অভিযানে তারা এসেছে— কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা-জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি— মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হ'য়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু-একটু ক'রে উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধ'রে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ একসময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্জনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে— 'এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।'

ব্যাপারটা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হ'য়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে স'রে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে ব'সে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন ব'লে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সবকিছু নিমগ্ন হ'য়ে আছে;— জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু'তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ ক'রে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু'তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনোরকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত ক'রে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হ'য়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন— ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খ'সে প'ড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য ক'রে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু-সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ ব'লে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল ক'রে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া স'রে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন একসময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা ক'রে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হ'য়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভ'রে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে ব'সে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আপনাকে বিদ্রুপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতারে পার হ'য়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাৎলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হ'য়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হ'য়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'ব'সে আছেন কেন ? টান দিন।'

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হ'য়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চ'লে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিস্ফল চেষ্টা ত্যাগ ক'রে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

একসময়ে হতাশ হ'য়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা ক'রে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন— 'কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হ'য়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে!

যে-ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ স'রে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হ'য়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করেছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গম্ভীর্য আরো বেশি ক'রে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সবকিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হ'য়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু'চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হ'য়ে বাইরে চ'লে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠেছে মনে হবে— সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ ক'রে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে সে যেন শেষে মরিয়া হ'য়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে-আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন কি বলব।'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, কেবলই বলছেন— 'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হ'য়ে যাবার পর থেকে আজকাল অত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে ওঠে!'

'হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও নাহয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।'— মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ ক'রে ব'সে আছে কিছুতেই মরবে না।'

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন ব'লে ওঁর দূরসম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে ব'লে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর ব'সে সেই আশায় দিন গুনছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?'

'আরে সে বিদেশে গেছল কবে, যে ফিরবে। নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা ব'লে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়নির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা' ক'রে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু মা-র কাছে বলবার উপায় তো নেই! যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!'— বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো ব'লে ফেলবেন, 'চলো, আমিও যাব।'

'তুমি যাবে!' মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে ?'

'না, আপত্তি কিসের!'— ব'লে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছুবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্নকন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে। 'কে, নিরঞ্জন এলি ? মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি ব'লে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন ক'রে পালাবি না ?'

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হ'য়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্তে ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির-বিন্দুর মতো ঝ'রে পড়েছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।'

বৃদ্ধা এতগুলি কথা ব'লে হাঁফাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গ'লে যাচ্ছে— ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হ'য়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হ'য়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট ক'রে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই— তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ— দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি ম'রেও শান্তি পাব না।'

ধরা-গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ খুলে যামিনী শুধু বলবে— 'আপনার ছিপটিপ যে প'ড়ে রইল!'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক না। এবারে পারিনি ব'লে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে।'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে এক শো না দেড় শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কে এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল— আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো ক'রে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন— 'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছুবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কি না আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোশকমুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারদ জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে,

'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন ?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা ব'লে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হ'য়ে যাবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পের কলকব্জা

এই যে আমরা এতকাল এত গল্প পড়েছি, একবার দেখি না কেন, লেখক তাঁর গল্পটিকে সময়ের কোন থাকে দেখছেন। তিনি কি এমন দেখছেন যে গল্পটি এইমাত্র ঘটে গেছে, এই কিছুক্ষণ আগে, এবং তিনি লিখছেন ? অথবা, অনেক আগে ? কিম্বা এই মুহূর্তেই তাঁর চোখের ওপর সব ঘটছে এবং তিনি বয়ন করে চলেছেন গল্প ? অথবা তিনি এভাবেই কি দেখেন তাঁর গল্প যে, এই গল্প আগেও ঘটেছিল, এখন ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে ?

লেখক কীভাবে দেখছেন তাঁর গল্পটিকে, কোন কালে, তার সংকেত পাওয়া যাবে গল্পে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের কালরূপটিতে। বাংলা ছাড়া অপর যে-ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে, সেই ইংরেজি ভাষায় দেখতে পাই গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ রূপই প্রযুক্ত হয়, সাধারণ অতীত রূপ— হি সেড্, শি লাফ্ড্, দে ওয়েন্ট; এর ব্যতিক্রম যে ওদের ভেতরে নেই তা নয়— আছে, তবে তা ষোলো আনাই পরীক্ষামূলক। ইংরেজি ভাষায় একজন গল্পলেখকের হাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়াপদ তার সাধারণ অতীত রূপটি নিয়ে ধরা দেয়, এতেই তাঁর কাজ চমৎকার চলে যায়; গল্পটিকে তিনি কালের কোন পর্যায়ে ঘটতে দেখছেন সেটা আমাদের অনুমান করে নিতে হয় ভেতরের অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে।

কিন্তু বাংলা ভাষার লেখকের বেলায় পরিস্থিতিটা অন্য রকম। একটু আগে ইংরেজি কথাসাহিত্যে দেখেছি এই রূপ— হি সেড, শি লাফড, দে ওয়েন্ট; বাংলা ভাষায় যখন লিখছি, অনিবার্যভাবেই কি লিখছি— সে বললো, সে হাসলো, তারা গেলো ? না। একটু লক্ষ করলেই দেখব, বাঙালি লেখকের হাতে এইটে ছাড়াও ক্রিয়াপদের আরো অন্তত

দুটি রূপ আছে যা তিনি ব্যবহার করতে পারেন; যেমন, সে বলেছিলো, সে হেসেছিলো, তারা গিয়েছিলো, এবং, সে বলে, সে হাসে, তারা যায়। আর এই রূপটিও আছে লেখকের হাতে— সে বলেছে, সে হেসেছে, তারা গিয়েছে।

অর্থাৎ বাংলা ভাষায় একজন কথাশিল্পীর জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রিয়াপদের একাধিক রূপ যা তিনি কাজে লাগাতে পারেন— বলে-বলেছে-বলেছিলো-বললো, হাসে-হেসেছে-হেসেছিলো-হাসলো, যায়-গিয়েছে-গিয়েছিলো-গেলো। এবং ক্রিয়াপদের এই রূপগুলোর যে-কোনো একটিকে তিনি মূল রূপ হিসেবে ধরে নিয়ে গল্প নির্মাণ করতে পারেন। তাঁর গল্পটিকে তিনি কালের কোন দূরত্বে দেখছেন, এখন অথবা তখন কিংবা সারাক্ষণ— গল্পের সেই ঘটে যাবার কালের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্রিয়াপদের বিশেষ একটি রূপ নির্বাচন।

গল্প থেকে লেখকের এই কালিক দূরত্ব, যার নির্ধারক লেখক স্বয়ং, এখন আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়। কারণ, আর কিছুক্ষণের ভেতরেই আমরা দেখবো প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি গল্পে ক্রিয়াপদের এমন এক রূপ প্রয়োগ করেছেন যা গল্প লেখার ইতিহাসে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব— বাংলা ভাষায় তো বটেই, ইংরেজিতেও এর তুল্য প্রযুক্তি আমি দেখি নি। আমার বলতে লোভ হয়, গোটা বিশ্ব সাহিত্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' নির্মাণ-কৌশলের দিক থেকে অনন্য, শ্রদ্ধেয় এবং পথিকৃৎ এক রচনা।

তবে, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর আগে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো এবং বাংলা গল্পে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা জেনে নিয়ে তৈরি হবো; প্রেমেন্দ্র মিত্রর বিভিন্ন গল্প থেকেই উদাহরণগুলো নেবো।

সে বলে-করে-হাসে-গায়-নাচে— 'পুন্নাম' গল্প থেকে।

'অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে— তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে তো চলেইছে। প্যাঁকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাশে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে— সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো। শিশুর চোখ সে নয়— জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক-এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে বলে, 'মর না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।'

সে বলেছে-করেছে-হেসেছে-গেয়েছে-নেচেছে— 'মহানগর' থেকে।

'এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেল দিদিকে ধরে। তারা হয়ত দিদিকে মারছে, হয়ত দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়ত রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। এ কথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন, 'কান্না কেন বাবা?'

চুপি চুপি রতন বলেছে, 'দিদি যে আসছে না বাবা!'

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে, 'আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে।'

রতন আর বেশি কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড়ো ভয় হয়েছে।

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা সাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূরদেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে।'

সে বলেছিলো-করেছিলো-হেসেছিলো-গেয়েছিলো-নেচেছিলো— 'কলকাতার আরব্য রজনী' থেকে।

'এই বকবকানিতে নীলাম্বরের বিরক্তির বদলে একটু মজাই লেগেছিল এবার।

কতকটা ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলেছিল, 'তুমি সব জানো, না? একেবারে সব হাঁড়ির খবর।' চোখটা অন্ধকারে সয়ে আসায় লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারা আরেকটু স্পষ্ট দেখতে পেয়েই তুমি বলে সম্বোধন করতে পেরেছিল নীলাম্বর। চেহারা পোশাক আখখুটে ইতর গোছেরই। মুখটা ভালো দেখা না যাওয়ায় বয়সটা অবশ্য বোঝা যায় নি।

লোকটা নীলাম্বরের ভর্ৎসনায় একটু শুধু হেসেছিল। সহিষ্ণুতার হাসি যেন। বলেছিল, 'আমি জানব না তো জানবে কে, স্যার। এই শহরের হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর কি আমি না জানি।'

নীলাম্বরের এবার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল লোকটা পাগল-টাগল হবে। তবে ভয় করবার কিছু নেই। নীলাম্বর গায়ে দস্তুরমত ক্ষমতা রাখে, অমন একটা ফড়িংকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে! আপাতত রিকশা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়টা পাগলের সঙ্গে কাটাতে মন্দ লাগছিল না।

নীলাম্বর একটু বিদ্রুপ করেই বলেছিল, 'নাড়ির খবর হাঁড়ির খবর কি করে এত জানলে।'

সে বললো-করলো-হাসলো-গাইলো-নাচলো— 'ভবিষ্যতের ভার' থেকে।

'টিকে বেশ ধরে উঠেছিল; প্রস্তুত কলকেটি হুঁকোর মাথায় রেখে হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই বললেন, 'নিন মশাই।'

বললাম, 'মাপ করবেন।'

হেড পণ্ডিত মশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বললেন, 'তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান তো। ওগুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে— তা জানেন? সদ্য ওই মেম মাগীদের থুতু।'

ঘৃণায় এক ধাবড়া থুতু পণ্ডিত মশাই ঘরের দেয়ালেই ফেললেন। তারপর হুঁকোর খোলটি ডান হাতে কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একট টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'পায়েস ছেড়ে আমানি।'

যে চারটি গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো— 'পুন্নাম', 'মহানগর', 'কলকাতার আরব্য রজনী' ও 'ভবিষ্যতের ভার', এর সবই প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা, এবং এই যে তিনি একেকটি গল্পে ক্রিয়াপদের একেক বিশেষ রূপ প্রয়োগ করেছেন এর দায়িত্বও সম্পূর্ণ তাঁরই। ইংরেজি ভাষার একজন লেখকের মতো, যদি জিজ্ঞাসিত হন, তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন না এই বলে যে, ক্রিয়াপদের কোন রূপ গল্পে প্রযুক্ত হবে তা ঐতিহ্য বা রেওয়াজ হিসেবে আমি পেয়েছি ও কাজে লাগিয়েছি। গল্পের জন্যে বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের যে চারটি রূপ আমরা হাতের কাছে সারাক্ষণ পাই, প্রেমেন্দ্র মিত্রর আগেও লেখকেরা তাঁদের গল্পে ব্যবহার করেছেন, তাঁর পরের লেখকেরাও করেছেন; তাই বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব বহন করতে হয় ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপটি সচেতনভাবে নির্বাচন করে নেবার ব্যাপারে; সচেতনভাবে, কারণ, ক্রিয়াপদই হচ্ছে বাক্যের বাক্য হয়ে ওঠার হেতু।

এটা তো বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্রিয়াপদের রূপ বাক্যের মাত্রা রচনা করে; তাই 'সে করে' এবং 'সে করেছিলো' এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বাক্য, একটির সঙ্গে আরেকটির বিনিময় চলে না। যদি মনে হয়, আমি এমন একটি প্রসঙ্গ তুলেছি যা শিশুতেও বোঝে, অর্থাৎ 'সে করে' এবং 'সে করেছিলো' এ দুই যে ভিন্ন অর্থদ্যোতক— এ আমার না বললেও চলতো; তাহলে এখন বলি, এই সোজা ব্যাপারটাই কিন্তু বাঙালি লেখকের গল্প লেখাটিকে কিঞ্চিৎ জটিলতা দান করেছে। যেহেতু 'সে করে' এবং 'সে করেছিলো' এ দুই ভিন্ন মাত্রার বাক্য, তাই লেখককে গল্প লেখার আগেই খুব হিসেব করে ঠিক করে নিতে হয় ক্রিয়াপদের কোন রূপটি তিনি ব্যবহার করবেন তাঁর হাতের এই বিশেষ গল্পটির জন্যে। ক্রিয়াপদের রূপ যেহেতু সম্পূর্ণ কালনির্ভর, তাই লেখককে ভেবে নিতে হয় গল্পটিকে তিনি কোন কালিক দূরত্বে দেখছেন। দেখছেন অথবা দেখেছেন? দেখেন কিংবা দেখেছিলেন? এবং এই বিশেষ একটি রূপ বেছে নেয়া, এটা যে কেবল কালিক দূরত্ব ঠিক করে নেয়ার ওপরেই নির্ভর

করছে তাও নয়, বরং আমার মনে হয়, গল্পটির প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে ওঠা, এ সবেরও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

'পুন্নাম' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের বলে-করে-হাসে-গায় রূপটি ব্যবহার করেছেন; আমরা একটু কান পেতে শুনি না কেন, ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি কোন ভাবের দিকে আমাদের ডাকছে? বলে, করে, হাসে, গায়, আসে, যায়, পড়ে— যেনবা এই ক্রিয়াগুলোর শুরু নেই, শেষ নেই, বৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে ঘটে চলেছে, হয়ে চলেছে, বারবার, আবার, আরো একবার, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ঘিরে, বিরামহীন। তাই নয় কি? 'পুন্নাম' গল্পটিকেও প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছেন বারবার অভিনীত হয়েছে, হয়, হচ্ছে ও হবে এমন একটি ইতিহাস হিসেবে। এক দম্পতির শিশুপুত্র অসুস্থ, তাকে ভালো করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তরুণ দম্পতি। স্বামীটির '*মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি*'। ডাক্তার ছেলেটিকে নিয়ে হাওয়া বদল করতে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? ললিত অর্থাৎ স্বামীটি রাতে বিছানায় স্ত্রীর '*পেছন ফিরে শুয়ে মনে-মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।*' অসুস্থ ও অর্থাভাবে পিষ্ট এই বাড়িটির কলতলায় বুনো কী একটা গাছে নামহীন গন্ধহীন ফুল ফুটেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন, '*ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।*' আর তার পরেই তিনি লিখেছেন ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ, যা আমাদের সংকেত দেয়— কেন লেখক এ গল্পের জন্যে নির্বাচন করেছেন ক্রিয়াপদের করে-হাসে-বলে রূপটি।— '*এই ছোটো সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হতে আবার নতুন দিনে।— মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আমানুষিক কৃচ্ছসাধনার অসামান্য আত্মবলিদানের কাহিনীর ধারা।*'

এই ধারাটিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আরো বানান করে উচ্চারণ করেন গল্পের শেষ দিকে, যখন হাওয়া বদলের জায়গায় নতুন একটি শিশুর সঙ্গে আমাদের অসুস্থ শিশুটির বন্ধুত্ব হয়, আমাদের অসুস্থ শিশুটি ভালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ স্থানীয় অপর শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে ও মারা যায়, দূর থেকে কান্নার রোল ভেসে আসে। '*ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃতস্বরে বললে, 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল— আশ্চর্য নয় ছবি?'*

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু করে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে বলে যেতে লাগল, 'আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি।'— স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, 'তোমরা মাথা খারাপ হয়েছে।'

লক্ষ না করে পারব না, এই শেষ দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের করে-বলে-কাঁদে রূপটি ব্যবহার না করে করলো-বললো-কাঁদলো রূপটি প্রয়োগ করেছেন। যেনবা তিনি বিশাল থেকে ক্ষুদ্রে এসে প্রবেশ করলেন, মাঠ থেকে ঘরে, সমষ্টি থেকে ব্যক্তিতে— বিশেষ এই ব্যক্তিটির করোটিতে, যার স্বার্থপরতা দেখে তারই স্ত্রী বলতে বাধ্য হচ্ছে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি এই শেষভাগেও ক্রিয়াপদের আগের রূপটি প্রয়োগ করে যেতেন তাহলে আমাদের মনে যে ভাবটি তিনি গ্রহণ করতে বলতেন, তা হলো, এই স্বার্থপরতাই সত্য এবং চিরকালের। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর বক্তব্য তা নয় এবং তা যে নয়, তার প্রমাণ গল্পের শেষে এসে তাঁর ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন করা।

'মহানগর' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের দুটি রূপ ব্যবহার করেছেন, বলেছে-করেছে-গিয়েছে এবং বলে-করে-গিয়ে। দেখাই যাক না, এই দুই রূপ কীভাবে কখন কোন ভাবনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্ণয় করে নিয়েছেন।

'আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদশিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।' লেখকের দুটি হাত যতদূর প্রসারিত হয় ততদূর প্রসারিত করে এই যে তিনি আমাদের ডাক দিলেন, অচিরেই কিন্তু বলছেন, *'আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি— মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী সমুদ্রের দু'একটি ঢেউ।'* কিন্তু হাত গুটিয়ে আনতে চাইলেই তো চট করে পারা যায় না, মাপ ছোট করতে চাইলেই কি সহজে তা করা যায়? তাই বিশাল মহানগরের এক অংশে একটি মাত্র চরিত্র নিয়ে গল্প যখন শুরু করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনি একেবারেই হঠাৎ সেই বিশেষ পরিবেশের সমান্তরালে নিজেকে স্থাপিত করতে পারলেন না, করলে সেটা মসৃণ ও স্বাভাবিক হতো না; তাই চরিত্র বা ঘটনার পাশাপাশি হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না, তিনি একটু ওপর থেকেই দেখতে লাগলেন সব কিছু। *'জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকো, মাঝিরা বড়ো নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে, এখন তারা ছই-এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি করে গিয়ে বসেছে রতন তা কেউ জানে না— সেই বুঝি রাত না পোহাতেই।'* আমরা লক্ষ না করে পারি না ক্রিয়াপদের চলেছে-বসেছে রূপটি। *'রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে।'* আমরা অনুভব করে উঠি বিশাল থেকে বিশেষে এই যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন লেখক, এর জন্যে ক্রিয়াপদের এই রূপটি কত জরুরি ছিল। তারপর নৌকো যখন মহানগরের ঘাটে এসে লাগলো, ক্রিয়াপদ হয়ে গেল করে-বলে-ওঠে। *'মুকুন্দদাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পিছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে, 'তুই নামলি যে বড়।'*

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে, 'আচ্ছা, কোথাও যাস নি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা।'

আমরা অচিরেই জানবো যে রতন তার দিদিকে মনে মনে এই মহানগরে খোঁজে। আমরা অস্পষ্টভাবে আরো জানতে পারবো যে, রতনের দিদিকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছে; আমাদের অনুমান হবে, রতনের দিদি এই মহানগরে বেশ্যা পল্লীতে হয়তো আছে, হয়তো তাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেই গুণ্ডারা; কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়, বরং আমাদের চেয়ে রতনের ধারণা অনেক বেশি স্পষ্ট, সে বিশ্বাস করে এই মহানগরেই তার দিদি আছে। দিদির কথা সে আগে বহুবার বাবাকে শুধিয়েছে, লেখক তখন ক্রিয়াপদের করেছে-বলেছে রূপটির সাহায্য নিয়েছেন।

রতন এখন বাবার চোখ এড়িয়ে মহানগরে বেরিয়ে পড়ে এবং ভাগ্যচক্রে এক বেশ্যা পল্লীতেই প্রবেশ করে; সেখানে এক বেশ্যা রমণীই তাকে নিয়ে যায় চপলা নামে এক যুবতীর কাছে। রতনের দিদির নাম ছিল চপলা। যুবতী রতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে। *'এদিক ওদিক চেয়ে ধরা গলায় বলে, 'তুই একা এসেছিস?'* ভাইবোনে এভাবেই মহানগরে দেখা হয়। লক্ষ করবো, গল্পের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে গিয়ে আমি ব্যবহার করেছি ধরে-বলে-পড়ে-যায়; প্রেমেন্দ্র মিত্র মূল গল্পেও তাইই করেছেন— *'রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।'* ক্রিয়াপদের এই রূপটি না ব্যবহার করে যদি লিখতেন, 'রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে রইল, কিছু বলল না' তাহলে কি রচিত হতো, রক্ষিত হতো, ভাগ্যতাড়িত অসহায় দুটি ভাইবোনের বিচ্ছেদ ও আকস্মিক সাক্ষাতের এই স্পন্দিত বেদনাটুকু?

গল্পের শেষে আমরা দেখছি, রতন দিদির কাছে থাকতে চায়, কিন্তু দিদি তাকে রাখবে কী করে? দিদি তাকে জোর করে বিদায় দেয়। রতন হেঁটে যায় বড় রাস্তা পর্যন্ত। *'চপলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।'* রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে, *'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।'* বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া। *'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।'*

গল্পটি এখানেই শেষ : শেষ হয়েও যে শেষ হয় না; রতন যে আমাদের কানে বারবারই বলে যেতে থাকে, 'আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি, কারুর কথা শুনব না।' এবং বারবার যে মহানগরের ওপর বিস্মৃতির মতো গাঢ় অন্ধকার নামে, আমরা যে বুকের ভেতরে তোলপাড় নিয়ে অনুভব করে উঠি— শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতিই সত্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে সময়ের বহমানতার সংকেত, সেই সময় আমাদের সব কিছু একদিন ভুলিয়ে দেয়, রতনও একদিন ভুলে যাবে তার দিদির কথা, দিদিকে দেয়া তার প্রতিজ্ঞার কথা; এই বেদনা ও এই সত্য, এ কেবল ক্রিয়াপদের ঐ করে-বলে-আসে-যায় রূপটির ভেতর দিয়েই আমাদের বুকের ভেতরে অবিরাম এখন ঢেউ ভাঙ্গে; যতদিন এ গল্প আমাদের মনে পড়বে, এভাবেই এ ঢেউ এসে আমাদের পাড়ে আঘাত করবে— এখানেই ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটির যাদু।

'কলকাতার আরব্য রজনী' গল্পে আমরা পাই করেছিলো-বলেছিলো-হেসেছিলো-গেয়েছিলো, ক্রিয়াপদের এই মূল রূপ। একটি ছোট্ট পরীক্ষা করা যাক; এই যে ক্রিয়াপদ চারটি আমি এখন বলেছি, যদি এ চারটি শব্দ খুব দ্রুত উচ্চারণ করে যাই, লক্ষ করবো, এক ধরনের চটুলতা ফুটে উঠছে, যেনবা কারো পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয়া হয়েছে; আবার ঐ শব্দ চারটিই যদি টেনে টেনে উচ্চারণ করি, কী আশ্চর্য, আমরা দেখতে পাবো, রচিত হচ্ছে কম্পমান এক বিষাদ। এবার আমার ধারণাটির কথা বলা যায়; ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটির ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একই সঙ্গে চটুলতা ও বিষণ্নতা; এবং একে খুব ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এই গল্পে। নামেই রয়েছে সংকেত— 'কলকাতার আরব্য রজনী', তার নিচে আবার উপশিরোনাম 'কয়লা চোরের কেচ্ছা'; আমরা ঘন হয়ে উঠি মজাদার কিছু শোনবার জন্যে, কারণ, একে আরব্য রজনী, তায় কেচ্ছা— কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো লেখক কেবল মজাদার 'কেচ্ছা' শোনাতে কলম ধরবেন, ভাবা যায় না; অতএব এর ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু কথা আছে, আছে মানব জীবন সম্পর্কে কোনো আবিষ্কার, কোনো পর্যবেক্ষণ। অতঃপর গল্পটি পাঠ করে উঠে আমরা অনুভব করি, কেচ্ছা তো বটেই, সেটা মোড়ক মাত্র, ছিঁড়ে ফেলবার বস্তু, এ গল্পের ভেতরে রয়েছে মানুষ সম্পর্কে লেখকের এই পর্যবেক্ষণটি যে, মানুষ গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবার জন্যেই প্রস্তুত, প্রেম ভালোবাসাও মানুষকে মানুষ হিসেবে ধরে রাখতে পারে না, মানুষ কেবলই নষ্ট হয়ে যেতে চায়, নষ্ট হয়ে যায়।

গল্পটি এই যে, এক তরুণ দম্পতি, বড় গরীব তারা— *'চৌকাঠ পেরিয়ে কদিনই বা সংসারে ঢুকেছে; কিন্তু এরই মধ্যে হালে পানি না পেয়ে ফেঁসে গেছে পাথুরে ডুবো ডাঙায়।'* এখন তারা শেষ কড়ি খরচ করে *'শেষ বাসর সাজিয়েছে, ফুল কিনে এসেন্স আতর ছড়িয়ে।'* অতঃপর তারা আত্মহত্যা করবে। এদিকে ওই রাতেই এক চোর চুরি করে ফেরার পথে গোপনে এই দম্পতির কথা শোনে, তারপর করুণায় সে তার চুরি করা বেশ কিছু টাকা দম্পতিটির জন্যে রেখে যায়। সেই টাকায় তাদের দারিদ্র্য ঘোচে, তারা আবার জীবনের স্বাদ ফিরে পায়; আর, চোরটি— তার নাম বেচারাম, *'বেচারামের সেই এক নেশা লাগল, স্যার। ভগবান হওয়ার নেশা, পঞ্চ রংয়ের চেয়ে কড়া। কিছুদিন অন্তর অন্তর বেশ কিছু লুকিয়ে সেখানে ঢেলে আসে।'*

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পটি বলেছেন মাঝরাতে পার্কে রহস্যময় বাউণ্ডুলে এক ব্যক্তির জবানীতে এবং স্বয়ং তিনি যেন শুনছেন; কেচ্ছার মোড়কটা এখানেই। গল্পের শেষদিকে এসে সে বলছে, *'ঘর-দোর পাল্টেছিল, শেষে পাল্টাল মানুষ।'* একদিন চোর বেচারাম এসে দ্যাখে, রাতদুপুরে সিঁড়ির কাছে মেয়েটি বসে আছে; তারপর— *'রাত দেড়টার সময় ছোকরা এলো, স্যার। বুঝতেই পারছেন, মদ খেয়ে এসেছে কোন হুরীর ঘর থেকে কে জানে। দুজনে তারপরে কি চিল্লামিল্লি চুলোচুলি। নেহাৎ দুপুর রাত বলে কাক চিল ওড়েনি।*

মেয়েটি বলে, 'মানতাসার জন্যে টাকা রেখেছিলাম, তুমি তাই চুরি করে গিয়ে ফূর্তি করেছ।' ছেলেটা বলে, 'বেশ করেছি। মানতাসা গড়াবে। গয়নার লালচ আর মেটে না।'

চোর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যেতো এদের সংসার, আজ এই যা সে দেখলো তাতে তার ভগবান সাজবার নেশা ছুটে গেলো। অন্য বাড়িতে চুরি করে ফিরছিলো সে, ঝুলির ভেতরে ছিলো টাকা পয়সা সোনার গয়না; সে আজ গোপনে এদের বাসায় রেখে গেলো কিছু গয়না। আমাদের মনে হতে পারে, চোর বেচারাম বুঝি আরো একবার করুণায় উথলে উঠে সাহায্য করে গেলো ওদের; কিংবা, পুরুষটির ওপর তার রাগ হয়েছে, তাই সে স্ত্রীটির জন্যে রেখে গেছে গয়না, যা নিয়ে আজ রাতের এই কলহ। চোর এ গল্প বলেছিলো পার্কের সেই লোকটিকে যার নাম নীলাম্বর, আর নীলাম্বর এখন বলছে লেখককে, এই দু'হাত ফেরা গল্পের এখানে এসে যেমন আমরা, তেমনি নীলাম্বর এবং লেখক, সকলেই উদগ্রীব হয়ে উঠি— অতঃপর ?

'তারপর ? জিজ্ঞাসা না করে পারে নি নীলাম্বর। তারপর আর বেশি কিছু নেই, স্যার। ছোকরার জেল হল চোরাই গয়না বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে।' আমাদের সন্দেহ থাকে না, বেচারাম ঐ পুরুষটিকে শাস্তি দেবার জন্যেই চোরাই গয়না রেখে গিয়েছিলো, সাহায্য করবার জন্যে নয়।

গল্পটি যখন ঘটেছে আর গল্পটি আমরা যখন জানতে পারছি— সময়ের দূরত্ব এ দুয়ের ভেতরে কম বেশি যাই থাক না কেন, লক্ষ করতে হবে এর বক্তা স্বয়ং চোরের মুখে বর্ণিত ঘটনার শ্রোতা, এবং শুনবার পর, কত পরে আমরা জানি না, সে বলছে লেখককে এবং তিনি বলছেন আমাদের। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বাক্সের ভেতরে বাক্স থেকে পায়রা বের করবার কৌশলটি অবলম্বন করেছেন 'আরব্য রজনী' ও 'কেচ্ছা'র মেজাজ আনবার জন্যে; আর তাকে যে ক্রিয়াপদের করেছিলো-খেয়েছিলো-বলেছিলো-হেসেছিলো রূপটি ব্যবহার করতে হয়েছে, সেটা শ্রুত ঘটনা বিবৃত করার কারণে যতটা, ততটাই চটুলতা ও বিষণ্ণতাকে একই সঙ্গে ধরে দেখাবার প্ররোচনায়।

ক্রিয়াপদের বললো-করলো-হাসলো-গাইল রূপটি 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পের শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ করবো ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি আমরা প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি। ক্রিয়াপদের এই রূপটির কাজই হচ্ছে কাজের কথাটি সরাসরি হাজির করা; এবং এই রূপটির রেখে যাওয়া ঢেউ হচ্ছে, ঐ যা ঘটে গেলো তার রেশ এখনো রয়েছে, এখনো সেটা ফুরিয়ে যায় নি। 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন এক তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যে মাস্টারির চাকরি পাবার পর স্ত্রীকে বলছে, *'মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর, তা জানো ? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর আছে ?'* এই গল্পের ভেতরে অতঃপর যত অগ্রসর হবো, দেখতে থাকবো— কীভাবে তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে, বাধা তাকে কাবু করছে, এবং

শেষে একদিন সে নিজেই আবিষ্কার করতে পারছে, যে-শিক্ষকতা ও যে-শিক্ষাদান রীতিকে সে ঘৃণা করতো, সে নিজেই কবে সেই শিক্ষকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

স্কুলের শেষ দুটো ঘণ্টায় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, 'কিছুদিন রেস্ট নিন না— আপনিই সেরে যাবে।'

বলি, 'হ্যাঁ, এইবার নেবো ভাবছি— আচ্ছা এর কোনো ওষুধ টষুধ দেয়া চলে না তো?'

'কিছু না। শুধু বিশ্রাম নিলে আপনি সেরে যাবে।'

ক্লাসে শেষ দু'ঘণ্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।

আর সত্যিই মাঝে মাঝে লিখতে দেওয়া তো আর খারাপ নয়। লেখাটাও তো দরকার। আমি তো আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না— লেখার ভেতর দিয়েও তো ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়। ভেবেচিন্তে লেখার একটা খেলাও তো বার করা যেতে পারে।

ছেলেদের বলি, 'কে কোন অক্ষর নিবি বল।'

'এফ, স্যার, আর— 'স'—

'বেশ। আজকের পড়া থেকে নিজের নিজের অক্ষর যে কটা কথার আগে আছে খুঁজে খুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগ্যে কটা অক্ষর পড়ে।'

বেশি করে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। ক'দিন ধরেই তারা এ খেলা করছে— জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার।'

এই তো বেশ লেখার পদ্ধতি। ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভালো মতলবই বেরিয়েছে। একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, 'আমার ওয়াই ছিল, স্যার, হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা এবার 'ই' ধরো—'

কী বোঝে জানি না, কেউ খাতা নিয়ে আসে না।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি।

চমকে দেখি—

ঘুমচ্ছিলাম—

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলাম।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এই গল্পের শুরুতে ক্রিয়াপদের যে বললো-করলো-হাসলো-গাইল রূপ ব্যবহার করেছেন তা আমাদের একটানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই স্কুলটিতে যেখানে আমাদের তরুণ শিক্ষকটি নতুন কাজ নিয়ে এসেছে। তারপর যখন দরকার হলো এই চাকুরি নেবার পূর্বকথা জানাবার— ক্রিয়াপদ হয়ে গেলো করে-বলে-হাসে-গায় এবং এই রূপটিই ধরে লিখিত হলো গল্পের শেষ দীর্ঘ পর্বটি। শিক্ষকটি যে ক্রমশ তার স্বপ্ন, সাহস ও মেরুদণ্ড হারাচ্ছে, এই যে শেষ পর্যন্ত হয়,

মানুষ এভাবেই যে একদিন পতিত হয়— এই ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটিকে লেখক বেছে নেন।

ক্রিয়াপদের যে চারটি রূপের কথা এতক্ষণ বলা হলো, বাঙালি গল্প লেখকের হাতে এই রূপগুলো ছাড়াও অন্য কোনো রূপ আছে কিনা, আমি অনুমান করি, সম্ভবত এরকম কোনো ভাবনা প্রেমেন্দ্র মিত্রর মনে একদা এসেছিলো। রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলা ভাষায় এখন পর্যন্ত যে সামান্য কয়েকজন প্রধান গল্প লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্যই একজন; এবং আমার বিবেচনায় তিনি বুধগণের মধ্যেও উজ্জ্বলতম, কারণ কালোত্তীর্ণ গল্প রচনাই তিনি করেছেন কেবল তা নয়, তিনি গল্পের নির্মাণ কৌশল নিয়েও কালোত্তীর্ণ পরীক্ষা করেছেন, সম্পূর্ণ নতুন একটি দরোজা খুলে দিয়েছেন, আর সেটি তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে।

সে বলবে, সে হাসবে, তারা যাবে— ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটি যে গল্প বলবার কাজে লাগতে পারে, এ আমরা ধারণাই করি নি। প্রতিদিনের ব্যবহারে ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটির ভূমিকা, আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি, আমাদের ধারণার চেয়েও ব্যাপক; আমরা অনেক কথাই ভবিষ্যৎ ছাড়া জ্ঞাপন করতে পারি না, যদিও এ সবের বক্তব্যে ভবিষ্যতের ভূমিকা এমন কিছুই নয়, যেমন— এখন খাবো, এবার ঘুমোবো, চিঠি লিখবো, আসবে তো কখন আসবে, কী বলবো দুঃখের কথা। আমার সন্দেহ হয়, কাউকে যদি বলা হয় ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগ না করে এক বেলা সংসারে ওঠাবসা করতে, সে পারবে না, বাজি হারবে। প্রতিদিনের সংসারে আমরা গল্প করবার কালেও ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটি বেশ ব্যবহার করি, যদিও বর্ণিত গল্পের সবটাই ঘটে গেছে অতীতে। যেমন, মনে করা যাক, পূর্বে কেউ দুর্ঘটনায় পড়েছে, সেই গল্প বলা হচ্ছে, বলতে বলতে আহত ব্যক্তিটির পথ চলার অন্যমনস্কতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়— তুমি দেখবে ও হাঁটছে, তোমারই পাশে পাশে, তুমি ডাকবে, তোমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফিরে তাকাবে না, যত হাত নাড়ো দেখতেই পাবে না।

কিন্তু গল্প বলার লৌকিক এই ভঙ্গিটি আমরা সাহিত্যে কখনো ব্যবহার করেছি বলে আমার মনে পড়ে না— সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগ করে রচনা তো দূরের কথা; পরীক্ষাটি অপেক্ষা করছিল একজন প্রেমেন্দ্র মিত্রর জন্যে।

এবং যে-কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও জানেন, ক্রিয়াপদের এই ভবিষ্যৎ রূপটি পাঠকের অভ্যেসকে ক্ষুণ্ন করবে, চমকিত করবে, গল্পের চেয়েও কৌশল বড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে— এবং আমরা জানি, রচনার চেয়ে কৌশল যখন বড় হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা শিল্প না হয়ে খেলায় পরিণত হয়; অতএব তিনি এমনভাবে অগ্রসর হন গল্পটিকে নিয়ে যেন আমরা বুঝতে না পারি ভেতরে ভেতরে কতখানি চমকপ্রদ তাঁর বলবার কৌশলটি।

প্রথমত, গল্পের নামই আমাদের উন্মুখ করে সমুখের জন্যে; ঐ 'আবিষ্কার' শব্দটি সংকেত দেয়— কোনো কিছু আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে— হ্যাঁ, ভবিষ্যতে; এবং আমরা পাঠক হিসেবে গল্পের ভেতরে কেবল নয় ভবিষ্যতেরই বলয়ে প্রবেশ করে যাই শিরোনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর, খুব মৃদু কণ্ঠে, কিছুটা ইতঃস্তত করে— এবং সবই লেখকের ইচ্ছাকৃত ভান, ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটির ভেতরে আমাদের ডেকে নেবার কৌশল এ, প্রেমেন্দ্র মিত্র শুরু করেন তাঁর গল্প এভাবে— *'শনি ও মঙ্গলের— মঙ্গলই হবে বোধ হয়— যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন।'*

এখানে, গল্পের এই প্রথম অনুচ্ছেদে, ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ ব্যবহার করা হয় নি, তবে যে রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রায় ভবিষ্যৎসূচক— যদি যান তবে আবিষ্কার করতে পারেন, যেন একটি পরামর্শ, কেবল একটি নির্দোষ প্ররোচনা মাত্র। এই প্রথম অনুচ্ছেদে লোভও দেখানো হচ্ছে, তেলেনাপোতায় গেলে মাছ ধরবার ভারী সুবিধে আছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখক আপনার অনেক কিছুই স্থির বলে ধরে নিয়েছেন; যেমন, আপনি মাছ ধরতে ভালোবাসেন, আপনি আপিস থেকে দু'দিন ছুটি পেয়ে গেছেন এবং এখন আপনি তেলেনাপোতায় যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। তাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুরু হচ্ছে দুম করে এভাবে—

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা।'

লক্ষ না করে পারি না, লেখক এই দীর্ঘ বাক্যে যাত্রার যে কষ্টের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা আমাদের সাবধান বা পিছপা করবার জন্যে কেবল নয়, কিছু পরিমাণে আড়াল করে রাখবার জন্যেও বটে যে, এখান থেকেই তিনি আমাদের ক্রমাগত এখন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলবেন। এই প্রথম ক্রিয়াপদ পেয়েছে ভবিষ্যৎ রূপ— এবং এখনো পরামর্শ ও পথ-সংকেতের সূত্রেই এই ভবিষ্যৎ রূপটি প্রযুক্ত হয়ে চলেছে, কিন্তু অচিরেই ফেরার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার, কারণ— *'একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।'* এবং আপনার পেছনের জগত, আপনার চেনা জগত, আপনার সমগ্র বাস্তব সেই কুণ্ডলিত জলীয় বাষ্পের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে।

লেখক ধরেই নিয়েছেন আপনি এখন তেলেনাপোতার পথিক; এবং তিনি এখন এই বাষ্প কুণ্ডলের সাহায্যে আপনাকে এতটাই বাস্তব থেকে বিযুক্ত করে ফেলেছেন যে, তিনি যা বলছেন তাইই আপনি মেনে নিচ্ছেন। গল্পে এই প্রথম, পথে বেরিয়ে এতটা এগোবার পর, আপনি জানতে পেরেছেন— আপনি একা নন, আপনার সঙ্গে আরো দু'জন বন্ধু আছেন, তাঁরাও আপনারই সঙ্গে একই পথের পথিক।

লেখক আপনার ওপর এতটাই অধিকার এখন আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন যে, রীতিমতো তিনি আপনাকে হুকুম করছেন। তেলেনাপোতায় পৌঁছে আপনি একটা ভাঙা দালানের সমুখে নেমেছেন, লেখকের নির্দেশ— *'এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।'* আর এখানে আপনি রাতে দেখতে পাবেন দূরের একটি জানালায় কোনো রমণীর ছায়া এবং পরদিন মাছ ধরতে বসে দেখা পাবেন এক যুবতীর যে *'কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন যে? টান দিন।'* আর আপনি সেই মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে এসে জানতে পারবেন, আপনার সঙ্গে যে দু'জন বন্ধু আছেন তাদেরই একজন এই মেয়েটির আত্মীয়। এ খবরটিও লেখক আপনাকে আচমকা দিয়েছেন, আগে দেবার দরকার বোধ করেন নি। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি, কীভাবে পাঠকের ওপরে লেখক তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতটাই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন যে তিনি যা বলছেন, যেভাবে বলছেন, সেটাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে— এবং অসহায়ভাবে নয়, লেখকেরই সহযোগী হিসেবে।

এবার গল্পটি সংক্ষেপে বলে নেয়া যায়। পুরনো এই দালানে থাকে যামিনী নামে এক যুবতী এবং তার অন্ধ মা— আর কোনো জনমানবের সাড়া নেই। দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে যামিনীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন তার মা; নিরঞ্জন নামে সেই বোনপো কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সেটা ছিল বুড়ির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে একটা কথার কথা; নিরঞ্জন চিরদিনের মতো পালিয়ে যায়; বুড়ি এখনো অপেক্ষা করে আছে— নিরঞ্জন আসবে, এলে তার হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজবে। নিরঞ্জন কখনোই আর আসে না, যামিনীর বিয়ে হয় না, যামিনী মেনে নিয়েছে তার আইবুড়ো জীবন, মা এখনো চেয়ে আছেন পথ, পায়ের শব্দ পেলেই তিনি চমকে ওঠেন— ঐ বুঝি নিরঞ্জন এলো। এই গল্পটিকে একদিক থেকে বলা যায়— স্থির একটি চিত্র, বিবর্ণ একটি ফটোগ্রাফ; মা ও মেয়ে— বিধ্বস্ত অট্টালিকার পটভূমিতে, চারদিকে এগিয়ে আসছে অরণ্য, আলোর চেয়ে অন্ধকারই এখানে প্রবল।

কোনো গল্প কীভাবে বলবেন লেখক, সে সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার, সিদ্ধান্ত তাঁরই— এ নিয়ে প্রশ্ন চলে না; একই গল্প যদি দু'জন লেখেন তবে দু'জনের কলমে দু'টো আলাদা গল্পই হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাঁর এ গল্পটি পড়বার পর সিদ্ধান্ত করতে পারি, স্থির করেন দুটি বিষয়— এক, মা ও মেয়ের এই স্থির জীবন আর কখনোই পরিবর্তিত হবে না; দুই, নিরঞ্জন ছাড়া জগতে আর কারো সাধ্য নেই, সম্ভবত সেই নিরঞ্জনেরও আর এখন ক্ষমতা নেই এই স্থির চিত্রে জীবন-সঞ্চার করতে পারে— বরং সে চেষ্টায় নষ্ট ভ্রষ্ট হতে হবে নিজেকেই; করুণা যদি করি এক মুহূর্তের জন্যে, তো প্রতিশোধ নেবে স্বয়ং প্রকৃতি।

এবং তাইই হয়। যামিনীর এই ইতিহাস শুনে আপনি বীরত্ব অথবা করুণা দেখিয়ে তার অন্ধ মায়ের সমুখে নিরঞ্জন সেজেছিলেন; তিনি যখন বলেছিলেন, *'এবার তো আর অমন করে পালাবি না?'* তখন আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, *'না মাসিমা, আর পালাব না।'*

'বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা? তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তেলেনাপোতা আবিষ্কারে এসে এ আপনি কোন মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন? বন্ধনের চিহ্ন হিসেবে আপনি আপনার ছিপখানা ফেলে এলেন তেলেনাপোতায় যেন আবার ফিরে আসবেন, এবং যামিনীর কাছে। কিন্তু ওই যে বলেছি, প্রকৃতি নেবে শোধ— প্রকৃতির কাছে কোনো ভাবালুতার অবকাশ নেই— আপনাকে ধরবে ম্যালেরিয়া, বহুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকবেন, কোনোদিন আর ফিরে যাওয়া হবে না সেই তেলেনাপোতায় কিংবা যামিনীর কাছে— কারণ, *'অস্ত যাওয়া তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে, তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র।'*

প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো খুব বড় মাপের একজন লেখকই পারেন, শেষ পর্যন্ত গল্পের প্রাথমিক অনুমানটিও নিঃশেষে গুঁড়িয়ে দিতে, যে, তেলেনাপোতা বলে সত্যি সত্যি কিছু নেই, এবং তারপরও আমাদের কাছে দাবি করতে, যে, আমরা জীবনের একটি নির্মম সত্যের নিষ্করুণ উচ্চারণের সম্মুখে বিস্ময়ে, বেদনায়, সীমাবদ্ধতার ক্ষোভে একবার ভেঙে পড়বো এবং আরেকবার উঠে দাঁড়াবো 'তবে তাই হোক বলে।'

তাঁর এই দাবির পেছনে জোর এনে দিয়েছিলো ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগের মতো তুলনারহিত পরীক্ষাটি।

পুনশ্চ উল্লেখ করি : প্রেমেন্দ্র মিত্রর কলমে এই বর্ণনা— *গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি,* আমাকে স্মরণ করায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা নারীদের মুখ। গল্পের কলকব্জায় এই যোগটুকু নিতান্তই আকস্মিক বলে আমার মনে হয় না। এমন কি হতে পারে, রবীন্দ্র অংকিত ওই চিত্র দেখেই হয়তো একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্রর করোটিতে এই গল্পের বীজ রোপিত হয়েছিলো?

জগদীশ গুপ্ত-র গল্প *দিবসের শেষে*

রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার— বাড়ির পূর্বে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে,— গোধুলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ শিরশির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না; কিন্তু এই এতো বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই— তার চোখ-কান এ সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাক্‌রান জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান, রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইতো না; এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কিন্তু লোকে সে কথা বিশ্বাস করে। দু'ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আম-কাঁঠালের কালে আম-কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারানী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে— তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এতো করিয়াও নারানীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে-যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ এক সময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে— তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারানীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই— এম্‌নি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিয়া বসিলো তাহা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য। নারানী তাহাকে হাত ধরিয়া খেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল— নিঃশব্দে যাইতে যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলো, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

নারানী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলো, 'সে কি রে ?'

'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

'কী ক'রে জানলি ?'

পাঁচু বলিলো, 'তা জানিনে।'

ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারানী প্রথমটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেলো। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলিয়াছে;— একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল; আর-একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে, পাগল ছেলে।

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিলো। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেলো তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্‌শির কথাটা, অধর বক্‌শি সে-বার নৌকা যাত্রা করিবার ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল— প্রাঙ্গণে লাফাইয়া লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলই চিৎকার করিয়াছিল— ও কে ? ও কে ? সেদিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতো আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা আর ফেরে নাই, সেও না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সেদিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'রতি, রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ; এরকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।'

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোর শাসন করিয়া দিলো, 'খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আন্‌বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।'

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ— নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল ছল শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই।— এই নদী, কামদা, তার দুই তীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী— চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লি-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিলো, 'আয়, নেয়ে আসি।'

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলো; মায়ের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'আমি আজ নাইবো না, মা।'

'কেন রে ?'

'ভয় করছে।'

নারানী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলো, 'পাঁচু নাইবে না আজ।'

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'কেন, কী হয়েছে ?'

'হয়নি কিছু।'

'তবে ?'

'নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।'

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিলো, 'না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতোজন হাসলে।'

গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে ঘষিতে রতি পাঁচুগোপালের উদ্ভট উক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে তো হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমির ? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কী হইতে পারে! চৌধুরী বাবু বলিয়াছিলেন, 'না কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস; কুমিরে যদি নেয় তো তোকেই নেবে—'

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, 'বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক হবে।'

হলধর রাজবংশীবাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল, 'রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ ? তাতে আবার জেতে নাপিত!'

ইত্যাদি বিরক্তিকর বিদ্রূপে মনে মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বক্শির এই শ্রেণীর ভুলের দরুন সদ্য-সদ্য নিধন প্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সংকল্প করিয়া রতি বাড়ি আসিয়াছিল।

নারানী পাঁচুকে বলিলো, 'যাও, বাবা, নেয়ে এসো। সঙ্গে বড়ো একটা মানুষ যাচ্ছে— ভয় কিসের ?' বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিলো। মনে মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিলো।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছটফট করিতো; আজ সে দাঁড়াইয়া নির্বিবাদে তেল মাখিলো, এবং বাপের গামছাখানা হাতে করিয়া তার পিছন-পিছন ঘাটে আসিলো।

স্নানার্থিগণের উঠানামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল— তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিলো। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে— এতো বড়ো একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরাবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।— এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কতো হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে। রতি শিহরিয়া উঠিলো। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলো— নদীর নিষ্কম্প বক্ষে একটি বুদ্‌বুদও কোথাও নাই। ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দুটি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে— সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতোন! প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া দূর-দুরান্তে স্থানে স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।— নদীর দুই তীর নির্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিলো।

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'ওটা কী ?'

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল— একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুশ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিলো, 'শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।'

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন, বাবা ?'

'খাবে বলে ?' ওরা বড়ো রুই-কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিলো না— জলের ভিতর তো অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায় ?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেলো। তখন তাহার মনে পড়িলো, কামদায় কুমির ভাসিতে এ গ্রামের কেহ কখনো দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ গ্রামের কানে কখনও পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের ?

ঝপ্ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিলো; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইলো এবং একহাতে তার ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিলো, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইলো, তারপর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলো।

রতি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে ?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি, বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো ?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'না।'

নারানী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে!'

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারানী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলো। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে-ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারানীর চোখে পড়িলো তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নাই। নারানী গালে হাত দিয়া একেবারে থ' হইয়া গেলো। হাঁকিলো, 'পাঁচু ?'

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধহয় এক দৌড়ে বাড়ি যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ির সীমানার বাহিরে যাইতে পারে নাই। মায়ের ডাক শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়োসড়োভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্তি দেখিয়া নারানীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিলো।

ব্যাপার এই—

নারানী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা ছোটো একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইয়াছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার ঠিক পদ্ধতিটা জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ় রসে সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে— তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধুলায় গড়াগড়িও দিয়াছে; কাজেই ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা।

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলো।

পাঁচু মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেলো— এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদের এবং নারানীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেলো। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা তেমনি তার— হয়েছে কী ?'

নারানী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো!'— বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা হ'লে তো হবে ?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিলো— সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিলো। রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা আমার ঘট ?'

উভয়েই ফিরিয়া দেখিলো, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো— এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো। মুদিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্বা ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না— পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিলো।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো, সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।

কেবল পাঁচুর মা সে-দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।

দিবসের শেষে গল্পের কলকব্জা

আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই আমার মনে পড়ে যায় জগদীশ গুপ্ত নামে বাংলা ভাষার একজন লেখক ও তাঁর 'দিবসের শেষে' ছোট গল্পটির কথা; এবং আজই আমি গল্পটি পড়ে ফেলি। এই ঘটনার ভেতরে, মনে হতে পারে আছে, কিন্তু, কোনো আকস্মিকতা নেই। আকস্মিক হতো যদি 'দিবসের শেষে' আজই আমার হাতে অমনি এসে ধরা দিতো, যেমন কখনো হয়— কোনো লেখার কথা ভাবছি আর লাইব্রেরিতে হাজারখানার ভিড়ে সেই লেখাটিই হাতে উঠে এলো। আমি খুব খুঁজে পেতেই আজ বের করেছি জগদীশ গুপ্তর বই এবং ভোরে মনে পড়ে যাওয়া গল্পটি হাতে নিয়েছি আরো একবার।

আরো একবার ? সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, আমার লেখক জীবনের শুরুর দিকে, একবার এই গল্পটি মনে নেই কোথায় পড়ে ভীত স্তম্ভিত হয়ে, কিছুতেই একে মাথা থেকে নামাতে না পেরে, কেবলি পায়ে পায়ে অবিরাম রমনার মাঠ ভেঙে এবং

গল্পটি নিয়ে ভেবে এবং এর বক্তব্য নিয়ে ভেবে এবং এর নির্মাণ নিয়ে ভেবে, এর কলকব্জা যাবতীয় আঁত অংশ-অংশ খুলে ফেলে, বিছিয়ে দিয়ে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, তবে নিস্তার পাই এর হাতে থেকে। তারপর, এই আবার, আজ, গল্পটি আমি পড়লাম। তা না হয় হলো; তবে এই, জগদীশ গুপ্তর কথা হঠাৎ একটি ভোরে, যখন শীত কেবল পড়তে শুরু করেছে, যখন বছরের ভেতরে ঘুম এই কেবল সুশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, আর গত রাতেই আমার একটি বড় লেখার শেষ পঙ্‌ক্তিটি লেখা হয়ে গেছে এবং যখন শেষ রাত থেকে মাঠের শেফালি গাছ দুটি টুপটাপ করে ফুল দিয়ে চলেছে, মনে পড়ে যাওয়া, এই বিশেষ লেখকটিকে, সূর্যোদয়ের মতো চেতনার জলতল ভেদ করে, আকস্মিক নয় কি ?— না, আকস্মিক একেও আমি বলবো না; কারণ, আমি লিখি এবং অন্য লেখক ও তাঁদের লেখা আমার বিদ্যালয়, অতএব জগদীশ গুপ্তর কথা আমার মনেই আসতে পারে। মনে এসেছিল বলেই যে আজই আমাকে ঐ বিশেষ গল্পটি খুঁজে এনে পড়তে হবে, পড়তেই হবে— অনিবার্য নয়, অনিবার্য ছিলো না; কিন্তু আমি পড়েছি বটে।

আকস্মিক— এর অর্থ কী তবে ? কারণহীন কোনো ঘটনা ? যুক্তিহীন কোনো আবির্ভাব ? সূত্রহীন কোনো পরিণতি ? কিছু এমন, অপ্রত্যাশিত ? কিছু এমন, অগাধীয় ? অথবা, আমরা এই শব্দটিকে প্রতিদিন ব্যবহার করি এর ব্যাস বেধ না জেনেই, প্রায় জনশ্রুতি হিসেবে পাওয়া একটি আওয়াজ হিসেবে— আকস্মিকতা ?

আর, অনিবার্য— ওটাই বা কী ? সাধারণ আমাদের জীবনে আমরা অনবরত ব্যবহার করি 'অনিবার্য'-সমূহের দীর্ঘ একটি তালিকা— দিন গেলে রাত আসবে, জল নিচের দিকে গড়াবে, দু'য়ে দু'য়ে চার হবে এবং আরো কত, আরো কত অনেক; আমরা এই সাধারণেরাই আমাদের জীবন যাপনের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, যে, অনিবার্যের চেয়ে অনিশ্চয়তাই প্রবল এ পৃথিবীতে।

আমি এখন আপনাদের ঠেলে দিয়েছি দুটি শব্দের দিকে, আকস্মিক এবং অনিবার্য; এর একটি উদ্দেশ্য আছে। জগদীশ গুপ্তর এই গল্প, 'দিবসের শেষে', যা আমাদের ঘুম হরণ করে, আমাদের স্বস্তিতে চিড় ধরায় এবং পায়ের তলায় মাটি দুলিয়ে দেয়, এর ভেতরে বিপজ্জনকভাবে পুরে দেয়া আছে ঐ শব্দ দুটির প্রচণ্ড বিস্ফোরক।

সত্যিই, বিস্ফোরকের মতোই হাজার হাত দূরে সরিয়ে রাখেন একজন গল্প-লেখক জীবনে যা কিছু অনিবার্য এবং যা কিছু আকস্মিক। তিনি এমন কিছুই ঘটাতে পারেন না যার প্রস্তুতি নেই। জীবনে অকস্মাৎ কত কিছু হয়, গল্পে অকস্মাৎ কিছু হতে নেই। এ এক মজার ব্যাপার, জীবন যা সবল ও সাবলীলভাবে ঘটিয়ে দিতে পারে, লেখকের সাধ্য কি তা পারে ? পারে না যে তার কারণটি বড় সরল— জীবন এক সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা, গল্প সম্পাদিত একটি নির্মাণ। জীবন বহে যায়, ঘটে যায়, এগিয়ে যায়— ব্যক্তির মৃত্যু, বা যুগের অবসান জীবনের ধারা স্তম্ভিত করতে পারে না; লেখক

এই বহমান ধারা থেকে কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন, এবং সচেতনভাবে; তাঁকে অনবরত মর-চোখে যুক্তির অন্তর্গত হয়ে থাকতে হয়; তাঁর এই সংগ্রহ করবার হাতটিকে চালনা করে জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শন ও বক্তব্য, এবং শেষ পর্যন্ত এই বক্তব্যই তাঁর সংগৃহিত অংশগুলোকে অর্থবহ বিন্যাসে রক্ষা করে।

তবে, আকস্মিকতা যদি বর্জন করেন লেখক, তিনি কি আলিঙ্গন করেন অনিবার্যতাকে ? হায়, এমন যদি হতো, তবে কত সরল হতো গল্প নির্মাণ! কিন্তু মানুষ সংখ্যা নয়, মানুষের জীবন গণিতের অংক নয়, এবং প্রতিটি মানুষ হন প্রতি-ভিন্ন এক ব্যক্তি; তাই, অনিবার্যতা মানুষের জীবনে অনিবার্য কোনো উপাদান নয়, রচিত গল্পে তো নয়ই। রচিত গল্পে অনিবার্যতা বরং প্রধান এক দুর্বলতা এবং তা এই কারণে যে, যা হবেই হবে তার ভেতরে মানুষের স্বাধীন কোনো ভূমিকা নেই। গল্প তখনই গল্প হয় যখন গল্পের চরিত্রগুলোর স্বাধীনতা থাকে সিদ্ধান্ত নেবার অথবা নিজের না থাকলেও যখন সে উপলব্ধি করতে পারে সেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে কোথাও না কোথাও কারো না কারো ভেতরে।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর এই গল্পে— 'দিবসের শেষে'— একজন লেখকের পক্ষে অবশ্যমান্য এই দুই নিষেধ উপেক্ষা করেছেন; গল্পটিকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন আকস্মিকতা ও অনিবার্যতার ওপর, এবং তারপরও তিনি রচনা করতে পেরেছেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ একটি ছোটগল্প। গল্পটি একবার বলে নেয় যায়।

'রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচু গোপালের মাদুলি ধারণ করে— তারপর পেটে আসে এই পাঁচু।' এই পাঁচুই গল্পের শুরুতে একদিন ঘুম ভেঙে উঠে মাকে বলে, *'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'* শুনে চমকে ওঠে নারাণী, স্বামীকে অবিলম্বে সে জানায় ছেলের এই সর্বনাশা কথা। রতি তৎক্ষণাৎ ছেলেকে শাসন করে বলে, *'খবরদার, ফের যদি ও কথা মুখে আনবি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।'* পাঁচু আজ আর নদীতে স্নান করতে রাজি নয়। দুপুরবেলা রতি বাড়ি ফিরে ছেলেকে নিয়ে নদীতেই স্নান করতে যেতে চায়, কারণ তার কথায়, *'ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতজন হাসলেন।'* হাসবার কারণ, বাড়ির পাশে এই কামদা নদীতে কস্মিনকালে কেউ কুমির দেখে নি; আর ছেলের যে-ভুলটা রতি ভাঙাতে চায়, তা হলো— ছেলেমানুষ একটা কথা বললেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না।

পাঁচুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে রতির অবশ্য হঠাৎ ভয় হয়। *'নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে।'* রতি সাবধান হয়েই পাঁচুকে স্নান করায়, বাড়ি এসে হাসতে হাসতে ছেলেকে ঈষৎ ঠাট্টা করে বলে, *'কেমন কুমিরে নেয়নি তো ?'* ছেলেও হাসে, মাও হাসে; মা বলে, *'ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।'*

সেদিন বিকেলেই ছোট্ট একটি অঘটন ঘটে। চুরি করে কাঁঠাল খেতে গিয়ে পাঁচু ধরা পড়ে গায়ে রস-কাদা-আঠা সমেত; মা চেঁচামেচি করে ওঠে, বাবা রাগ করে ছেলের হাত ধরে নদীর দিকে রওয়ানা হয় পরিষ্কার করাবার জন্যে।

জগদীশ গুপ্ত লিখছেন, *'পাঁচুর হাতে খেলার একটি ঘট ছিলো— সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিলো। রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা, আমার ঘট?'*

উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিলো, 'নিয়ে আসি বাবা?'

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো— এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো। মুদিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্বা ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না— পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো। সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।'

তারপর আর একটি মাত্র লাইন, দু'টি ছোট ছোট বাক্য, গল্প শেষ— *'কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।'* আমরাও স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বইয়ের পাতা বন্ধ করতে ভুলে যাই; আমাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ হয় এই ভেবে যে, শিশুটিকে বাঁচাবার কোনো উপায় আমরাও জানি না যে লেখককে বলবো, অনুগ্রহ করে আপনি তার প্রাণ রক্ষা করুন এই কৌশলে।

গল্পের সূচনাতে আছে পাঁচ বছর বয়সী পাঁচুর একটি উক্তি, *'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে'*— লেখকের ভাষায় *'তাহা যেমন ভয়ংকর, তেমনি অবিশ্বাস্য'*, কিন্তু তার চেয়েও বড়, উক্তিটি আকস্মিক। গল্পের শেষে এই উক্তিটিই সত্যি হয়ে যায়, অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন সত্যি সত্যি কামদা নদীর জল ভেদ করে কুমির ওঠে, যা কেউ কখনো শোনে নি, এবং পাঁচুকে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলে যায়। সমস্ত গল্পটি ঘটে যায় অনিবার্যভাবে; পাঁচুর কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হবার পরমুহূর্ত থেকে ভবিষ্যতবাণীটি ফলে যাবার দিকে অগ্রসর হয় দ্রুত গতিতে; প্রতিটি বাক্য, বর্ণনা, অণুঘটনা, সবই পাঁচুকে নির্মম ও নিশ্চিতভাবে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে কুমিরের

দিকে; তারপর যখন পাঁচুকে নিয়ে জলের ভেতরে তলিয়ে যায় কুমির— আমরাও তখন কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে অনুভব করে উঠি, 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে— মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়— যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি প্রাকৃতরূপ।'

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এক বস্তু, আর একে শিল্পে চালিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ আরেক বস্তু। জগদীশ গুপ্ত নিয়তির এই নিষ্ঠুরতা, মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'দৈব-নির্যাতন', শিল্পে অনুবাদ করতে গিয়ে মৌলিক একটি কৌশল স্থির করে নেন; সেটি হচ্ছে, যেহেতু তিনি পাঁচুর একটি আকস্মিক উক্তি দিয়ে গল্প শুরু করবেন, এবং সেই আকস্মিক উক্তিটিকেই শেষ পর্যন্ত সত্যি করে দেবেন, বস্তুত, যেহেতু এই আকস্মিক উক্তিই এ গল্পের হয়ে ওঠার কারণ, তাই তিনি সারা গল্পে কোথাও কোনো আকস্মিকতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। অচিরেই আমরা লক্ষ করবো, কীভাবে তিনি প্রতিটি বর্ণনা ও অনুঘটনার আভাস বহু আগে থেকেই দিয়ে যাচ্ছেন যাতে কোনো কিছুই আকস্মিক, উড়ে আসা বা ভাসমান বলে বোধ না হয়। বস্তুতপক্ষে গল্পটি দ্বিতীয়বার পড়বার কালে আমরা আবিষ্কার করবো কী আশ্চর্য উদ্ভাবন এই লেখকের, যে, এতবড় 'অনিবার্যতা'র ধ্বস মাথায় নামিয়ে দেবার জন্যে তিনি যে সরল কৌশলটি অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে— কোনো কিছুই আগে বলা ভিন্ন পরে আমদানি করা হবে না; আর তবেই একটি আকস্মিক উক্তি এত অনিবার্যভাবে সত্যি হয়ে যাবে এবং আমরা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নেবো।

এ গল্প লেখার আগে, জগদীশ গুপ্ত খুব হিসেব করে একটি সুরও স্থির করে নিয়েছেন— যেখানেই পারবেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করবেন— নিয়তিকে, যে, তোমার দুষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তো তুমি সব সাজিয়ে নিয়েছিলে বহু আগেই। কিন্তু এই ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তুলিতে, প্রায় বোঝা যাবে কি যাবে না, দ্বিতীয় পাঠেও হয়তো ধরা পড়বে না, তৃতীয় বা চতুর্থ পাঠের প্রয়োজন হতে পারে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, প্রথম পাঠেই যদি আবিষ্কৃত না হলো, তাহলে সে কৌশল প্রয়োগের মূল্য কোথায়? মূল্য এইখানে, যেমন, ঘড়ির ভেতরে কত সূক্ষ্ম দাঁত, চাকা, তার, কুণ্ডল— আমাদের না জানলেও চলে, কিন্তু ঐসবের উপস্থিতি বিনা ঘড়ি মোটেই সময় দেয় না।

দেখা যাক, জগদীশ গুপ্ত কীভাবে অগ্রসর হচ্ছেন পাঁচুর এই গল্পটি নিয়ে। গল্পের প্রথম বাক্য— *'রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার— বাড়ির পূর্বে নদী, কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শষ্যক্ষেত্র।'* লক্ষ্য করবো প্রথম বাক্যেই লেখকের মূল কৌশল ও সুর, দুটোই উপস্থিত। পাঁচু নদীতে গিয়ে কুমিরের মুখে পড়বে; পাছে আমরা প্রশ্ন করি ইঁদারা

থাকতে, পুকুর থাকতে নদীতেই কেন যাবে পাঁচুকে নিয়ে তার বাবা, তাই গল্পের বিন্দুমাত্র আভাস দেবার আগেই আমাদের তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন যে, বাড়ির নিকটতম জল-উৎস হচ্ছে কামদা নদী। আর ব্যঙ্গটিও আমরা লক্ষ করতে পারবো নিয়তির প্রতি লেখকের ছুড়ে দেয়া *চমৎকার* এই বিশেষণটিতে— *'রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার।'* কেন চমৎকার ? কার জন্যে চমৎকার ? আর কারো জন্যে নয়, নিয়তিরই জন্যে; কারণ নদীর পাড়ে বাড়ি বলেই পাঁচুকে নিয়ে স্নান করতে রতি যাবে নদীতে; এটা নিয়তিরই পাতা একটি জাল।

গল্পের দ্বিতীয় বাক্যটি দীর্ঘ এবং দেখুন— *'সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে— গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ শির শির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না; কিন্তু এই এত বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃকপাতও নাই— তার চোখ কান এ সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই।'* এই যে সূর্যদেবের কথা বলা হয়েছে, এটাও এক বড় রকমের আভাস দিয়ে রাখা; সূর্যকে দেবতা রূপে শুরুতেই চিহ্নিত করাটা গভীরভাবে পরিকল্পিত, কারণ, গল্পের শেষে, পাঁচু যখন কুমিরের মুখে, লেখক লিখবেন, *'পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো— সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।'* এখানে সূর্যকে আর দেবতা বলা হয় নি, বলবার দরকারও নেই, কারণ আগেই আমাদের লেখক সূর্যকে দেবতা বলে সনাক্ত করেছেন, এখন এর সঙ্গে মনে মনে যুক্ত হলো দেবতার একটি বিশেষণ— রক্তপায়ী; সেই দেবতাকেই কুমির নিবেদন করছে তার মুখের আহার— পাঁচু!— যেনবা দেবতার প্রসাদ পাচ্ছে সে। ওই দ্বিতীয় বাক্যে ব্যঙ্গের সুরটিও লেখক বাজিয়ে দিয়েছেন— প্রকৃতির এক প্রশান্ত সুশীল চিত্র আঁকবার পর এ কথা বলে, যে, রতির *'চোখ-কান এ সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই'*— যেন তিনি বলতে চাইছেন, ওইসব মন ভোলানো কথা কবি প্রসিদ্ধিমাত্র, রতি না জেনেছে ভালোই হয়েছে, আজ বিকেলেই তো সে দেখবে প্রকৃতির নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর রূপটি। রতি তার নিজের চোখেই যে সেটা দেখতে পাবে, লেখক সেই কথাটিই যেন জানাতে চান পরের বাক্যের এই অংশটিতে— *'রতি বস্তুতান্ত্রিক'*— অর্থাৎ সে চোখখোলা মানুষ।

চতুর্থ বাক্য দেখুন এবং লক্ষ করুন লেখক কীভাবে প্রতিটি বিষয়ের পূর্বাভাস বা বীজ রেখে যাচ্ছেন— *'একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইতো না; এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।'* অর্থাৎ শাদা কাথায়, পশ্চিমে যাদব দাসের বাগান থেকে রতি নাপিত আম-কাঁঠাল চুরি করে থাকে। এই সার কথার ভেতরে আমরা

লেখকের বিশেষ কৌশলটি অবলোকন করতে পারছি। প্রথমত, গল্পের শেষ ভাগে পাঁচু ধরা পড়বে চুরি করে কাঁঠাল খেতে গিয়ে এবং তার মা কাঁঠাল চুরি সম্পর্কে বাঁকা কথা বললে রতির সেটা আঁতে গিয়ে লাগবে, কারণ, গোড়াতেই দেখেছি কাঁঠাল চুরিতে সে অভ্যস্ত, অতএব নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে অহেতুক ক্ষিপ্ত হবেই সে, পাঁচুকে টান মেরে নিয়ে যাবে নদীতে গা ধোয়াতে, আর সেখানেই কুমির তাকে নেবে। পাঁচুর কাঁঠাল চুরি করে খাওয়াটা পাছে সাজানো বা আকস্মিক মনে হয়, তাই লেখক শুরুতেই পাঁচুর বাবা রতির প্রসঙ্গে কাঁঠালের বাগান ও চুরির কথা বলে রাখলেন। দ্বিতীয়ত, সেই যে নিয়তির প্রতি ব্যঙ্গ— এখানেও লেখক রতিকে সরাসরি আম-কাঁঠাল চোর না বলে বাঁকা ইশারা দিয়েছেন এই ভাবটি আনতে যে, দ্যাখো, নিয়তির এও এক ফাঁদ, রতি কাঁঠাল চুরি না করলে পাঁচুও গা নোংরা করতো না, নদীর ঘাটে যাবারও প্রয়োজন হতো না, কুমিরও তাকে নিতো না।

গল্পের দুটি অনুচ্ছেদ লিখে ফেলেছেন জগদীশ গুপ্ত, এখনো গতি সঞ্চার করেন নি, এখনো তিনি ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে চলেছেন; গতিটি আনবেন তিনি চতুর্থ অনুচ্ছেদে, তার আগে তৃতীয় অনুচ্ছেদে নিয়তির নিষ্ঠুরতা ও অশুভ ছায়ার সংকেত দিচ্ছেন তিনি এভাবে একটি বাক্যে— '*রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব গৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে— তারপর পেটে আসে পাঁচু।*' গল্পটি পুরো পড়বার পর ফিরে এসে এই বাক্যটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, পাঁচুগোপাল নামে দেবতাটি আরো কঠিন রকমে নিষ্ঠুর, কারণ তার নামে মাদুলি ধারণ করে যে-পুত্রের মা হয় নারাণী, যে-পুত্রকে প্রসব গৃহ থেকেই নদী গর্ভে দিতে হয় নি, সেই পুত্রকে পাঁচ বছর মায়ের কোলে রেখে, মায়ের স্নেহের পুর্ণিমায় পাঁচুকে ভিজিয়ে তবে তার প্রাণ হরণ করেছে এই পাঁচুগোপালই— সম্ভবত কুমিরের ছদ্মবেশে।

অতঃপর চতুর্থ অনুচ্ছেদে পাঁচু ঘোষণা করলো, আজই তাকে কুমিরে নেবে; রতি তাকে কঠোর শাসন করলো কুকথা মুখে আনবার জন্যে; আর এখান থেকেই লেখক শুরু করলেন নতুন এক চাল; অতঃপর আমাদের একবার তিনি আশ্বস্ত আরেকবার উৎকণ্ঠিত করতে লাগলেন— যেন এই বিশেষ চালের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধৈর্য-অসহিষ্ণুতা, অমল-কুটিল এ সবের ব্যবধান ভেঙে দিতে তিনি এখন উদ্যত। ছেলের মুখে কুমিরে নেবার আগাম কথা শুনে রতি যদি বিচলিত হয়ে থাকে, পরের অনুচ্ছেদেই লেখক আমাদের আশ্বস্ত করছেন এই বলে, '*তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ— নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছলছল শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পংকিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী, কামদা, তার দুই তীর আর জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষুসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী— চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লী-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।*'

বেশ। ভয় নাই। রতিও দুপুরে বাড়ি ফিরে পাঁচুর অহেতুক ভয় ভাঙাবার জন্যে নিয়ে গেছে তাকে নদীর তীরে; কামদা নদী। রতি হঠাৎ দেখল, *'নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে— এতো বড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরাবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই।'* আমরা গোড়াতেই দেখেছি, প্রকৃতির যৌন্দর্যের প্রতি রতির পক্ষপাতিত্ব নেই, তবুও সাধারণ মানুষের মতো নদীকে সেও মায়ের মতো জেনে এসেছে তার সুপেয় শীতল জলের জন্যে, সেই নদীকে আজ প্রথম তার ভয় করে ওঠে। আমরা লক্ষ করবো, এ গল্প যদিও সাধুভাষায় রচিত, এর আর কোথাও এতগুলো তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই— এবং এই শব্দ-চয়নেই আমাদের কাছে ধরা পড়বে, নদীর ওই চিত্রটি প্রাকৃতিক নয়, মানসিক— রতিরই, ভয়ঙ্করতা আনতেই তৎসম শব্দ লাগানো। বাক্যগুলো আরেকবার পড়লেই আমরা আবিষ্কার করতে পারবো, তৎসমেরও যে-শব্দগুলো লেখক ব্যবহার করেছেন তা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে আসা শব্দ। কিন্তু এই ভয়টিকে তিনি, জগদীশ গুপ্ত, পাঁচুর শুক দেখে ভয় পাওয়ার মতো ছেলেমানুষি দিয়ে কাটিয়ে দিলেন, বাপ ছেলে দুজনকেই হাসিয়ে দিলেন, তিন পুত্র বিনাশের পর চতুর্থ পুত্র পাঁচুকে নিয়ে সদ্য শংকিত যে-মা নারাণী, যে 'কুমিরে নেবে' শুনে কাঁটা হয়ে আছে, তাকেও তিনি টান টান দড়ির ওপর থেকে নামিয়ে আনলেন।

'রতি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে ?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো ?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'না।'

নারাণী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

আমরা অনুভব করি, উত্তেজনা আমাদেরও আর নেই; সকলি শিথিল ও কোমল বলে বোধ হচ্ছে এখন, প্রায় যেন ঘুম পাচ্ছে, আমরা যেন ভুলেই গেছি পাঁচুর সেই ভোরবেলার ছেলেমানুষি আচমকা একটা কথার কথা, *'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'*

কথাটা যে ভুলে গেছি, বা প্রায় ভুলে গেছি— লেখকের এটি উদ্দেশ্যমূলক একটি বিভ্রম রচনা; এরপরেই গল্প যখন সামান্য বিরতির পর আবার শুরু হবে, আমাদের বুঝে উঠতে যেন বিলম্ব হয় গল্প এখন কোনদিকে যাচ্ছে। এই বিলম্ব হওয়াটা পুরো লাভ দেবে অচিরেই, কারণ, অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা যে আঘাতটি শেষে পাবো তার ওজন দশগুণ হয়ে তবেই তো দেখা দেবে।

শেষ ভাগে গল্প যায় কাঁঠাল চুরি করে ধরা পড়া পাঁচুর দিকে; গায়ে তার ধুলো, রস, আঠা; অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সে কাঁঠাল খাচ্ছিলো, তার বাবা মা ছিলো দিবানিদ্রায়, এই সুযোগে; সঙ্গীরা পালিয়ে যায়, ধরা পড়ে একা পাঁচু।

'পাঁচু মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেলো— এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে'— আমাদেরও এখন ঈষৎ স্মরণ হয় সেটা ছিলো কুমিরে তাকে নিয়ে যাবার ত্রাস; আমরা এখন পাঁচুর সঙ্গে, পাঁচুর মায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই— ছেলেটা তবে খামোকাই ভয় পাচ্ছিলো, আমাদেরও জ্বালাতন করে রেখেছিলো; তারপর, লেখক লিখছেন, *'কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলো। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা, তেমনি তার— হয়েছে কি?'* পল্লীর এ বড়ো পরিচিত একটি দৃশ্য, গৃহস্বামীর এ বড়ো পরিচিত একটি হুঙ্কার; আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই, যে, সেই কুমির বিষয়ে আর কিছুই উত্থাপিত হবে না। গল্প এগোয়, যেমন চিরকাল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এ ঝগড়া যে-পথে এগোয়, *'নারাণী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি করে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো।' —বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।'* এই ব্যঙ্গ, আমরা অচিরেই দেখবো, আমাদের বিভ্রান্ত করবারই কৌশল বটে, এবং নিয়তির প্রতি শেষ বিদ্রূপ, যে, এই কাঁঠালের জন্যেই পাঁচুকে শেষ পর্যন্ত নদীর কাছে যেতে হবে, তুমিই এর নাট্যকার। *'রতি ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা হলে তো হবে?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।'* আসলে রতি স্ত্রীর মুখে নিজের কাঁঠাল চুরি করার প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে এলেও শুনতে চায় না, দ্রুত সে ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে যায়, তার পরের উদ্ধৃতি একটু আগেই আমি দিয়েছি, ঐ উদ্ধৃতিতেই গল্প শেষ হয়।

এবং গল্প শেষ হয় একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো ওজনের ধাক্কায়— অন্য গল্পের মতো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নয়, অথবা কোনো মন্তব্যে নয়, চরিত্রের কোনো অন্তর্গত ভাবনা দিয়ে নয়— সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি কোণ থেকে নিরাসক্ত কলমে আঁকা একটি অবিস্মরণীয় চিত্র দিয়ে। রক্তের বর্ণে অঙ্কিত সেই চিত্র, সূর্যাস্তের বর্ণ, অস্তায়মান সূর্যের বিশাল গোলকের পটভূমিতে ক্ষণকালের জন্যে স্থির— কুমিরের মুখে পাঁচু, পর মুহূর্তে কুমির অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু তখনো আমাদের বিভ্রম ও আঁখিতারায় অঙ্কিত হয়ে থাকে ঐ চিত্রটি— এখন, অনেকক্ষণ ও সর্বক্ষণের জন্যে। রচনার এই অসামান্য কৌশলের কারণেই এ গল্প উৎরেছে বলে আমি মনে করি; সামান্য অমনোযোগে যে-গল্প আষাঢ়ে গল্প হয়ে যেতে পারতো, কারিগরি উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগে সেই গল্পই মনুষের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে নিদ্রাহর একটি রচনা হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প *ভয়ংকর*

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অসময়ে সহর থেকে টাকা এসেছিল, কারখানায় পৌঁছে দেবার জন্য ভূষণ দত্ত প্রসাদকে ডেকে সাতশো তেইশ টাকা দিল। চার মাইল দূরে বিরূপা নদীর ধারে ভূষণের মস্ত চামড়ার কারখানা। কাজ শেষ হবার পরেও আজ সকলে সেখানে ধন্না দিয়ে থাকবে, কিছু কিছু টাকা অন্তত সকলকে আজ দেওয়া চাই। নইলে কাল কেউ কাজে আসবে না। রাস্তা ধরে বীরগাঁ হয়ে কারখানায় যেতে অনেক সময় লাগে, রেললাইন ডিঙিয়ে পেনোর মাঠ পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে প্রসাদ কারখানায় পৌঁছে যাবে।

গুমোট হয়েছে। আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল। বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না ?

বলা দূরে থাক, ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।

মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাসবুনানি কদমকেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড় বড় গহ্বর দুটি কাঁচা-পাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মতো জোরালো নয়। ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্তে তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে ?'

'আজ্ঞে না, যাই।'

গেরুয়া রঙের ছোট টাইট জামাটি গায়ে দিয়ে সে টাকাগুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে পকেটে রাখল। এতটুকু দায়িত্ব নিয়েই নিজেকে তার বিপন্ন অসহায় মনে হচ্ছে। আশাকে ইসারায় ডাকতে দেখে আরেকবার বুকটা তার কেঁপে গেল।

'জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।'

'মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর!'— আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পার না ?'

চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সবসময়েই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এইরকম শুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।

রাস্তার মোড়ে বসাকদের মন্দির। সামনে দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের মানুষ-সমান উঁচু চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রসাদ প্রার্থনা জানাল, আজ যেন ঝড় না ওঠে, আর— আর, তার যেন সুমতি হয়।

আশার সুমতি হোক এই প্রার্থনা জানাবার ভরসা তার হয় না, আশার মনে পাপ আছে মনে করলেও তারই পাপ হবে। আশা ভূষণের স্ত্রী, আশা গুরুজন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে পায়ে হাত দিয়ে আশাকে সে প্রণাম করেছিল।

আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি ধরে নেড়ে দেবার সময় ঠোঁটে আঙুল ঘষে গিয়েছে। চলতে চলতে প্রসাদ ঝাল নুন তেলের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে চোখে তার জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। এ বিপদ ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো অসম্ভব। সুমতি না ছাই জাগবে তার, আশা কাছে এসে দাঁড়ালে ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে অসে, সত্য সত্যই আশা যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায় ?

আশা যে কেন এমন হয়ে গেল কে জানে। মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধুকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে অথবা কার সুখশান্তি-ভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কমবয়সী, কুমারী, বোকাটে ধরনের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে-কোনো ঘরোয়া মেয়ে হলেই তার চলত। কিন্তু তার জন্য যে-কোনো মেয়েই বা কে খুঁজে দিচ্ছে। জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরীব, মেয়েটি চলনসই, সুতরাং সুলভ। তিন দিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, 'সে তো আমাদের ভাগ্যি।'

তাকে দিয়েই প্রসাদ আবেদন পাঠালে ভূষণের কাছে। ভূষণ উদারভাবে বলল, 'তা করুক না বিয়ে, বিয়ে করবে তাতে আর হয়েছে কি!'

দুপুরবেলা তাকে ঘরে ডাকিয়ে সোহাগের কৌতুকে আশা বলল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে ? মাগো মা, কোথায় যাব।'

সলজ্জভাবে একটু হাসলেও প্রসাদ মুখ নিচু করল না। আশাকে দেখতে দেখতে গভীর স্বস্তি বোধের সঙ্গে তার মনে হতে লাগল, তার বৌ এরকম হবে না, সুন্দর রোগা প্যাটকা চেহারা তার বৌ-হবু মেয়েটার। তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ন্যায় বিচারের মূল্য কতটুকু। মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে।

তবে কেমন যেন প্রাণহীন মানুষ, জড় পদার্থের মতো, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়েচেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।

মুচকে হেসে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'

সেই থেকে এইরকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে-রাত্রে বাড়ি থাকবে না।

কোথাও চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে। অজানা অচেনা জগতকে সে কম ভয় করে না। ছোটোখাট ফরমাশী কাজ করে, সাবধানে খেয়ে দেয়ে শরীরটা ভালো রেখে কোনো রকমে এখানে মাথা গুঁজে সে টিকে আছে। দুর্বল শরীর, এতটুকু অনিয়মে অসুখ হয়। লেখাপড়াও ভালো জানে না, কোনো কাজও শেখেনি। অপরিচিত নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে দুদিনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পেনোর মাঠের মাঝখানে ভীরু প্রসাদকে ঝড় ধরে ফেলল।

পরপর কদিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এলোমেলো বাতাসও উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিও নামেনি, ঝড়ও ওঠেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ উড়ে বাতাস পড়ে গিয়েছে, দিগন্তের কোলে শুধু চোখে পড়েছে ঘনঘন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক। প্রসাদ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল, আজও যেন তাই হয়। নেহাৎ যদি খারাপ হয় তার অদৃষ্ট, শুধু যেন বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজলেই

তার সর্দিকাশি হবে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে জ্বর এসে হয়তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে নিমুনিয়ায়, ভুষণের সেজ শালার মতোই হয়তো চারদিনের দিন অচেতন হয়ে সাতদিনের দিন খটখটে জ্যোৎস্নার রাত্রে অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মরে যাবে, তবু মাঠে একা ঝড়ের মধ্যে পড়ার চেয়ে তাও অনেক ভালো।

আকাশে ধূসর কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে দুরুদুরু বুকে প্রসাদ জাম পাড়ছিল, দূর থেকে ঝড়ের সোঁ-সোঁ আওয়াজ কানে এলো কারখানার দিক থেকে। ন্যাকড়ায় বাঁধা জামের পুঁটুলি পকেটে ভরে সেদিকে পিছন ফিরে প্রসাদ ছুটতে আরম্ভ করল। কোনোমতে পেনোর মাঠ পার হয়ে রেললাইন ধরে স্টেশনে পৌঁছে যদি আশ্রয় নেওয়া যায়। দুশো গজ দৌড়ালেই প্রসাদকে হাপরের মতো হাঁপাতে হয়, সুতরাং হাঁপ ধরবার আগেই বাতাসের প্রথম ধাক্কায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে বসা মাত্র ধুলো আর বালিতে দুটি চোখ যেন তার অন্ধ হয়ে গেল। একটা শুকনো ঝাঁকাটির চারা গড়িয়ে এসে তার গায়ে আটকে গেল, শুকনো পাতা তার গায়ে মাথায় ক্ষণিকের জন্য লেপটে থেকে ছিটকে উড়ে যেতে লাগল, একটা শুকনো ডাল কোথা থেকে এসে লাঠির মতো আঘাত করল তার ঘাড়ে! তারপর নামল বৃষ্টি। ঝড়ের শক্তি আর কলরব যেন দশগুণ বেড়ে গেল। দুটি বুড়ো আঙুল দু'কানে ঢুকিয়ে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে প্রসাদ তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জীবনে কখনো সে ঝড়ের মূর্তি চেয়ে দ্যাখেনি। ঝড় উঠলে সে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে চোখ কান বন্ধ করে থাকে, মাঝেমাঝে মুখ দিয়ে বার হয় ভয়ের ওঁ-ওঁ কাতরান। কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কালবৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল। বৃষ্টিধারাকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গায়ে তার প্রচণ্ড বেগে ঝাপটা মারতে লাগল ক্রমাগত, চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ। একটা কিশোর তেঁতুল গাছ গুঁড়ির কাছে মটকে ভেঙে আছড়িয়ে পড়ল, ডগার সরু সরু ডালপালাগুলি অসংখ্য চাবুকের মতো একসঙ্গে আঘাত করল প্রসাদের পিঠে। সেই মুহূর্তে ঠিক মাথার উপরের অবনত আকাশে প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল বজ্র।

তখন ধীরে ধীরে প্রসাদ উঠে বসল। অন্ধ ভয়ে মনে মনে সে মুহুর্মুহু মরছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় জাগায় তার খেয়াল হয়েছে যে এখানে এভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল। এত জোরে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল যে মাথাটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবু বমির বেগ ঠেকানো গেল না, দুহাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। এমন হাল্কা মনে হতে লাগল নিজেকে যে শুকনো পাতার মতো বাতাস

যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্ত দুহাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর উঠে দাঁড়ানো মাত্র বাতাসের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কিনা ভেবে কিছুক্ষণ সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় বারবার তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে প্রবল হাসিকান্নার আবেগে প্রসাদের দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেই অগভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকু তার দুঃখ হল না, আঘাতের বেদনাও অনুভব করল না। নিজের সঙ্গে সে যেন তামাসা করছে এমনি ভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে হাসতে লাগল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগে সস্নেহ পরিহাসের ভঙ্গিতে ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে বলল, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে, ছুটতে গেলি কেন?' হামা দিয়ে খাদের গা বেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার ট্রেনের আলোর দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

প্রকাণ্ড একটা গাছ ভেঙে পড়ে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। একটি থার্ডক্লাস কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রসাদ মরমে মরে গেল। একগাড়ি লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জামা কাপড় তার কাদা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, না-জানি কী ভাবছে সকলে তাকে দেখে! কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধ, ভিতরে অসহ্য ভ্যাপসা গরম। প্রসাদের দম্ আটকে আসবার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি অপর দিকের দরজা খুলে সে লাইনে নেমে গেল।

বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পৌঁছে দিয়েছিস?'

'আজ্ঞে না।'

ভূষণ কটমট করে তার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে।'

এক পকেটে ন্যাকড়া বাঁধা জাম ছিল, অন্য পকেটে ভূষণের রুমালে বাঁধা সাতশো তেইশ টাকা। জামগুলি ছেঁচে গেছে, রুমাল সুদ্ধ টাকাগুলি কখন কোথায় পড়ে গেছে ভগবান জানেন। পেনোর মাঠেই কোথাও পড়েছে, সে যখন আছাড় খাচ্ছিল অথবা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল।

থাবা উচিয়ে ভূষণ তার দিকে এগিয়ে আসে, ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করে দেয়। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ভূষণ তাকে মারবে! খালি পেটটা গুলিয়ে উঠে আবার তার বমি ঠেলে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে মাথার কাঁপুনি শুরু হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে ভূষণের মস্ত গোলগাল মুখখানা পাশাপাশি দুদিকে লম্বা হয়ে যায়।

কাছে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেই ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে, খানিকটা তফাতে থেমে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে! তাকে মারবার জন্য এগিয়ে এসে ভূষণের ভয় হয়েছে।

'পেনোর মাঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া যায় ভালোই, নইলে তোকে পুলিশে দেব।'

ভূষণের ধমকে ঝাঁঝ নেই, এ যেন শুধু কথার কথা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এসে প্রসাদের মূর্তি হয়েছে ভীতিকর, তার লাল চোখের ভয়ার্ত চাউনি দেখে বুক কেঁপে ওঠে। আশার সখের আলমারিতে বসানো প্রকাণ্ড আয়নায় প্রসাদ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, অনুমান করে প্রথমে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর ধীরে ধীরে জাগল উল্লাস, নিজেকে ভূত সাজিয়ে গুরুজনকে আঁতকে উঠতে দেখলে ছোট ছেলের যেমন উল্লাস জাগে সেইরকম, কিন্তু ঢের বেশী প্রচণ্ড ও উৎকট।

তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। সে টের পাচ্ছে রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দু'পা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরও ভয় পাবে, আরও সংশয় ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরও নরম গলায় কথা বলবে, হয়তো দুপা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ ? এত সহজে সে ভয় পায় ?

কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্তগুলি প্রসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকেলেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তার সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভাণ করে বলে, 'পড়ে গেলে কি করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আরেকটু হলে। তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে ?'

ভূষণ ভয়-বিস্ময়ের ভাণ করে সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'গাছ চাপা পড়েছিলে ? খুব বেঁচে গেছ তো!'

তখন বিজয়ী বীরের মতো প্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আশা তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'মাগো মা, এ কি ?'

ন্যাকড়ায় বাঁধা ছ্যাঁচা জামগুলি দেখিয়ে প্রসাদ বলল, 'আপনার জন্য পেড়েছিলাম।'

আশা চাপা গলায় বলল, 'সত্যি ?'

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্টোভ জ্বেলে আশা রাঁধছে ভূষণের নৈশভোজনের মাংস। ঘরের মধ্যে গন্ধ আর গরমের অসহ্য সমন্বয়। গায়ের জামা সেমিজ সে খুলে ফেলেছে, ঘামে ভিজে সিদ্ধ মাংসের মতো তার মেটে চামড়া হয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে। 'একটাও ভালো নেই ?' বলে মুখে পুরবার উপযুক্ত জাম খুঁজতে সে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের আলগা আঁচলটিও তার খসে পড়ল, মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল রিঙে বাঁধা একরাশি চাবি।

প্রসাদ চোখ বুঁজতে চায়, বুঁজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে সে-আনন্দ তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে গড়া কাঁধ, বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

গভীর আলস্যে হাই তোলার মতো মুখের ভঙ্গি করে আশা বলল, 'মরণ তোমার! বাড়ী ভরা লোক নেই ?'

তবু সে তাকে বুকে চেপে ধরে রাখল আরও খানিকক্ষণ। ছোটছোট কটা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তার মুখে বুলিয়ে, হলুদ রঙীন আঙুলে তার কপালের এলোমেলো চুল সরিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলে মাঠে ? খুব লেগেছে ?'

বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মতো সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে! ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশি নয়। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা-কপাল কুটে সে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃৎপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল। প্রায়

জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।'

আশার স্নানের ঘরে গোলাপের গন্ধ, একটানা, অনিবার্য, জমজমাট গন্ধ। তিন আনা দামের একটি সাবানে এত গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়, গোলাপের আরক কত সস্তা। মনটা প্রসাদের আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যুভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মতো অন্যের চটচটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়। ঘষে ঘষে সাবান মেখে প্রসাদ স্নান করল। রান্নাঘরের এক কোণে বসে ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাত পেট ভরে খেয়ে নিল। ঝড়বাদল তখন অনেকটা কমে এসেছে। প্রসাদ সদরে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ভয় দেখাতেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বাতাস হঠাৎ প্রবল হয়ে চারিদিকে সাঁ-সাঁ রবে শব্দিত হয়ে উঠল। প্রসাদের নবলব্ধ সাহসও এতক্ষণে অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বাতাস অনেকটা শান্ত হয়ে এলে সে পথে নেমে গেল। রেললাইনে এখনো ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। লাইন পার হয়ে যে-পথে পেনোর মাঠ থেকে সে পালিয়ে এসেছিল সেই পথে ভূষণের দামী বড় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলল। টাকার পুঁটুলিটা খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে। নয়তো স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, যে-কোনো দিক থেকে, প্রথম ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে। তবে তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের পরিচয় হলে, ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান-টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বৌ-ও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণ-যৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?

ভয়ংকর গল্পের কলকব্জা

মনে হতেই পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলো পড়ে, যে, এ সবই তাঁর কলমে এসে গিয়েছিলো বড় অনায়াসে; তাঁর ভঙ্গি বড় সরল, ভাষা সহজ; তিনি গল্প শুরু করেন খুব সাধারণভাবে, কথা বলেন নিচুস্বরে কোনো অধিকার দাবি না করে, ঘটনা থেকে ঘটনায় চলে যান অবলীলাক্রমে, এবং গল্প যখন শেষ করেন, যত চমকপ্রদই হোক সে পরিণতি— তাঁর বহু ছোট গল্পের শেষ আমাদের মূল ধরে আছাড়

মারে— সে উপসংহার থেকে তিনি এতখানিই আপন দূরত্ব রক্ষা করেন যে, মনে হয়, গল্প উদ্ভাবনে, জীবন পর্যবেক্ষণে এবং সত্য আবিষ্কারে তাঁর, একজন লেখকের, কোনোই হাত ছিলো না।

যেন জীবনের জল কলরব করতে করতে জটিল কুটিল ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে, বহমান সেই জীবন থেকে এক আঁজলা খপ করে তুলে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন, পর মুহূর্তে ঢেলে দিলেন জীবনস্রোতে, তৎক্ষণাৎ মিশে গেলো ধাবমান জীবন প্রবাহে— বেমালুম; কিন্তু আমরা ভুলতেও পারলাম না যা আমাদের দেখানো হলো। আমাদের অভিজ্ঞতা এই— মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প শেষ হয়ে যায় কিন্তু চরিত্রগুলোর সঞ্চরণ তখনো শেষ হয়ে যায় না; আমরা পরের গল্পে যাই কিন্তু আগের গল্পটিকে পেছনে যে ফেলে আসতে পারি তা ঠিক নয়; চরিত্রগুলো কখনোই আমাদের ত্যাগ করে না; আগের গল্পের মানুষজন পরের গল্পের আশেপাশেই ফেরে, আমরা একটু এ পাশ ও পাশ তাকালেই তাদের সাক্ষাত পেয়ে যেতে পারি। হৃত হয় আমাদের নিদ্রা, লুপ্ত হয় আমাদের স্বস্তি, আয়নায় যদিবা আমাদের মুখ হয় প্রতিফলিত, সেখানে আর আবিষ্কার করতে পারি না পরিচিত-নিরাপত্তা— এ সবই হয় এই লেখকের গল্প পড়ে, এই শাদামাটা ভাষায় লেখা, আপাতদৃষ্টে কোনো কৌশল বিনাই নির্মিত— সরীসৃপ, প্রাগৈতিহাসিক, যে বাঁচায়, আজ কাল পরশুর গল্প, সমুদ্রের স্বাদ, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, কুষ্ঠরোগীর বৌ— যেমন মনে এলো কয়েকটি গল্পের নাম করলাম, কিম্বা এই 'ভয়ংকর' যা এখন আমাদের হাতে।

কৌশল বিনা ?— অথবা এইই তাঁর কৌশল ? সাহিত্যিক দূরে থাকুন, সাংবাদিক— যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছুনো যায় ততই যাঁর কৃতিত্ব, অতএব যিনি সরল প্রকাশের সাধক, সেই সাংবাদিকের চেয়েও, অনুমান করি, কম, অনেক কম শব্দভাণ্ডার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এটা নিশ্চয়ই তাঁর বিদ্যার অভাববশত নয়, তাঁর প্রবন্ধ আমার দেখেছি এবং তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য', এবং এ সব থেকে জেনে যাই, ইচ্ছে করলে ভাষাকে যেমন নতুনভাবে তিনি ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি শব্দভাণ্ডারও বাড়াতে পারেন। অতএব বিশ্বাস করতে হয়, সরল এক বাগভঙ্গি তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন; ভাষার সারল্যের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এনেছেন কথকতার সারল্য— কোনো চমকপ্রদ কৌশল নয়, কালক্রম নিয়ে খেলা নয়, ইন্দ্রজাল রচনার চেষ্টা নয়, এমনকি অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে বাক্য পরম্পরার ভেতরে ছন্দ নির্মাণেরও আকাঙ্ক্ষা নয়, কিছুই নয়, কেবল বলে যাওয়া, গল্পটি বলে যাওয়, এই হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম।

তাঁর গল্প পড়ে মনে হয়, যেনবা ইস্টিশানে, কি লঞ্চঘাটে, কি কাছারির বারান্দায় অপেক্ষমান একটি সমাবেশ, সমুখে সুদীর্ঘ অপরাহ্ন, সমাবেশটি বিদ্রোহী নয়, সহিষ্ণুও নয়, তবে নিশ্চিতভাবে উৎসুক বটে; এদেরই একজন, সে কথক বলে নয়,

জীবনে কিছু দেখেছিল বলে সেই অধিকারে, প্রকৃতিদত্ত প্রাঞ্জলতা ধরে বলে যাচ্ছে। মনে হয় প্রকৃতিদত্ত, কিন্তু বড় পরিশ্রম করে পাওয়া এই প্রাঞ্জলতা। শিল্প সৃষ্টির কোনো কৌশলই প্রকৃতিদত্ত নয়, রক্তবাহিত নয়, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয়। বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের একজন এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকক্ষ আর সকলের চেয়ে যে 'সরল' ও 'সাধারণ'— গল্প বলার এই ভঙ্গিটি তিনি খুব সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখার কারিগরি দিক সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখায় যাঁরা হঠাৎ দেখতে পান না, তাদের জন্যে সরাসরি তিনি বলেন, *'লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অংক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখা একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে।'* অবাক হয়ে লক্ষ করি, আপাতদৃষ্টে যাঁর লেখা সরল মনে হয়, কৌশলবর্জিত মনে হয়, নাগরিকদের সমাবেশে গ্রাম্য বলেও যাঁকে মনে হতে পারে, সেই তিনি লেখার হাত অর্জন করাকে দেখছেন অংক শেখার সমপর্যায়ে, দেখছেন একটি যন্ত্র বানাবার কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে তুলনা করে; খেলা ও গানের মতো ব্যাপারটাকে প্রতিদিনের রেওয়াজের বস্তু হিসেবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখতে গিয়ে সচেতনভাবে একটি বড় ব্যাপার করেছিলেন যার তুল্য উদারহরণ গোটা বাংলা সাহিত্যে আর চোখে পড়ে না— তাঁর আগেও না, তাঁর পরেও না। ব্যাপারটি হচ্ছে— একেকটি গুচ্ছ পরিকল্পনা করে তিনি গল্প লিখেছেন, একটি বিশেষ চিন্তাকে একাধিক গল্পে ধরবার চেষ্টা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এক আকুতি একাধিক জীবনের ভেতরে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, এক পর্যবেক্ষণকে বিভিন্ন কাল ও পাত্রে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। এই ব্যাপারটি বাংলা কবিতায় বহু কবির হাতে বহুবার এসেছে; মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কিম্বা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'র কথা আমাদের মনে পড়বে; মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'বনবাণী', 'মহুয়া' এবং আরো অনেক; আমরা দেখতে পাবো একটি বিশেষ সুর, একটি বিশেষ মনোভঙ্গি, একটি বিশেষ আর্তি, একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ কীভাবে একগুচ্ছ কবিতায় কাজ করছে; আমরা লক্ষ করব, প্রতিটি কবিতাই স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ কবিতা, এবং তা সত্ত্বেও গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা অখণ্ড একটি রূপ নির্মাণ করছে, সব স্বতন্ত্র মিলে এক অনন্য সম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে উঠছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প রচনাতেও এই একই পরিকল্পনা ও প্রেরণা আমরা আবিষ্কার করি; তাঁর কিছু ছোটগল্পের বই হাতে নিলেই ব্যাপারটা আমাদের চোখে ধরা পড়বে। 'বৌ' নামে গল্প সংকলন, এতে আছে কত রকমের বৌয়ের গল্প— দোকানির বৌ, কেরানির বৌ, সাহিত্যিকের বৌ থেকে শুরু করে কুষ্ঠরোগীর বৌ পর্যন্ত; কিম্বা 'ভেজাল' এই বইটি— কত রকমের ভেজাল এই সংসারে, ভালোবাসায়

ভেজাল, আশ্বাসে ভেজাল, বিশ্বাসে ভেজাল, জীবনযাপনে ভেজাল, এমনকি পিতৃত্বে ভেজাল— ভেজালের এ এক অনুপুঙ্খ মানচিত্র; 'সমুদ্রের স্বাদ' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি গল্পের বই, ভূমিকায় তিনি বলছেন, *'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে সমুদ্রের স্বাদের গল্পগুলি লেখা।'*— স্পষ্ট টের পাওয়া যায়, একটা মূল সুর বা অবলোকন কীভাবে এই লেখককে দিয়ে একগুচ্ছ গল্প লিখিয়ে নিতো। এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা সচেতন ছিলেন বোঝা যায় 'আজকাল পরশুর গল্প' বইয়ের ভূমিকার এই অংশটি পড়ে— *'গল্পগুলি একটা বিশেষ ভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল যাতে আজকাল পরশুর গল্প নামটির সঙ্গতি হয়ত আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে— গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।'* কোনো সন্দেহ আমাদের মনে থাকে না যে, এই লেখক একটি বীজ পরিকল্পনার ভেতরে গল্প উদ্ভাবন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং, 'এক বছরের মধ্যে লেখা' থেকে ধারণা পেয়ে যাই— কীভাবে একটা সুর তাকে কিছুকাল অধিকার করে থাকতো।

'ভেজাল' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'ভয়ংকর'— জীবনের যেখানে যত ভেজাল এই লেখক দেখতে পেয়েছেন তার কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন তিনি এ বইয়ের এগারোটি গল্পে। আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পর্যবেক্ষণ বা দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু গল্প লিখতেন এবং আমরা 'আজকাল পরশুর গল্প'র ভূমিকা থেকে এও জানতে পেরেছি, যে, তিনি গল্পগুলো সাজাবার ব্যাপারেও একটা যুক্তি প্রয়োগ করতেন, অর্থাৎ তিনি বিশেষ পর্যবেক্ষণটির ক্রমবিকাশ দেখাতে চাইতেন গল্প পরম্পরার ভেতর দিয়ে; এ কথা মনে রেখে এখন বলতে পারি, যে, 'ভেজাল' বইটির প্রথম গল্প হিসেবে 'ভয়ংকর'কে যে তিনি নির্বাচন করেছেন এরও একটা অর্থ আছে। এই অর্থটি আমরা গল্প পড়বার পরেই কেবল আবিষ্কার করতে পারবো।

গল্পের প্রধান চরিত্র প্রসাদ; লেখকের বর্ণনায়, *'প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালো মানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।'*

এই ভূষণ হচ্ছে প্রসাদের মনিব। *'মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাস-বুনানি কদমকেশর চুল, ফোলাফোলা গাল, নাকের গহ্বর দুটি কাঁচাপাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে।'*

ভূষণের স্ত্রী আশা। *'চোরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সব সময়ই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ,*

তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপটা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে।'

এই তিনটি চরিত্র এ গল্পে; তিনজনের ভেতরে আশার বর্ণনাই একটু বেশি জায়গা নিয়েছে, ফলে মনে হতে পারে আশার ভূমিকা এ গল্পে প্রধান; কিন্তু না; চতুর্থ আরেকটি চরিত্র আছে, প্রকৃতির সংসার থেকে সে এসেছে, লেখকের বর্ণনায় তার একটি কাজ— *'চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ।'*— হ্যাঁ, মানুষ নয়, রক্ত মাংসে নির্মিত কোনো প্রাণীও এ নয়, ঝড়!— এ আমাদের পরিচিত কালবৈশাখী, প্রাকৃতিক একটি ঘটনা।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত রকমের— খাদ্যের জন্যে সে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তার সৌন্দর্য চেতনার আদি উৎস প্রকৃতি, তাকে বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর করায় প্রকৃতি, তার প্রথম বন্ধু প্রকৃতি, তার শেষ আশ্রয় প্রকৃতি; এবং প্রকৃতিরই বর্তমান দুর্ভাগ্য এই যে, আধুনিক লেখকের কাছে সে প্রায় উপেক্ষিত, অপরীক্ষিত, অব্যবহৃত; সম্প্রতি এমন— যেন প্রকৃতিকে ব্যবহার করাটা আধুনিক মানস অনুমোদন করে না; যেনবা প্রকৃতিকে ব্যবহার করলে আমরা 'গ্রাম্য' বলে নিন্দিত হবো, সহজিয়া বলে ভর্ৎসিত হবো— তাই প্রকৃতির দিকে আমরা আর তাকাই না।

'ভয়ংকর' গল্পটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে বড় মাপে কেবল ব্যবহার করেছেন তাইই নয়, তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন জীবন্ত মানুষের মতো একজন হিসেবে এবং এই প্রকৃতিই রক্তমাংসের মানুষকে আমূল বদলে দিচ্ছে। আমার ধারণা, বাংলা সাহিত্যে এ এক নজিরবিহীন গল্প যেখানে প্রকৃতিকে মানুষের সমান কি তার চেয়েও বড় একটি চরিত্র হিসেবে আমরা পাচ্ছি।

গল্পটি এই—

মস্ত চামড়া কারখানার মালিক ভূষণের চাকরি করে প্রসাদ, থাকে তার বাড়িতেই। ভূষণের বৌ আশা; তার সম্পর্কে প্রসাদের ভাবনা, *'দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে, সত্য সত্যই যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায়?'*

আশা সম্পর্কে প্রসাদের ভয়ের কারণ— *'মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে।— রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরুলাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন।'* কিন্তু

সব ভণ্ডুল করে দিলো আশা। প্রসাদকে ডেকে সে ঠাট্টা করলো, *'তুমি নাকি বিয়ে করবে? মাগো মা, কোথায় যাব।'* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার আত্মগোপনকারী কৌশল প্রয়োগ করে, প্রতারক সরল ভাষায়, নিচুস্বরে অতঃপর লিখছেন, *'তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হলো এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা-কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু। মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা-না-ভাবাকে।'*

বিস্মিত না হয়ে পারি না; এই কথাগুলো আরেকবার পড়ে, থেমে থেমে পড়ে, আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই; প্রথমবারে যদিবা বুঝতে পারি নি, এবার আর সংশয় থাকে না— বাঙালি ঘরের সাধারণ এক বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে কী ভয়ংকর চিত্র লেখক এখানে আঁকলেন এবং কী সহজে, নীরবে; কোনো হৈ চৈ না করে তিনি খুলে দিলেন গোপনতম একটি দরোজা যার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিপাত মাত্র আমাদের মর্মমূল পর্যন্ত শিহরিত হয়ে উঠলো। আশা এবং তার কামনা, তার ছলনা, তার রতিরচনা থেকে মুক্তি চায় প্রসাদ; কিন্তু সে ভীতু মানুষ; আশাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য তার নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পের অন্তিমে প্রসাদকে ছিনিয়ে আনবেন আশার কাছ থেকে, ভয়ের কাছ থেকে, এবং তাকে তুলে দেবেন তার নিজেরই দুটি পায়ের ওপর, ঠেলে দেবেন কর্ম ও জীবনচঞ্চল জগতের দিকে।

গল্প শুরু হচ্ছে এভাবে— *'বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।'* কিছু টাকা ভূষণ পাঠাবে নদীর ধারে তার কারখানায়, প্রসাদের মারফতে। অনতিবিলম্বে আমরা জানতে পারি, *'গুমোট হয়েছে।'* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-ঝড় এনে প্রসাদকে চিরদিনের মতো পালটে দেবেন, তার আভাস তিনি, লক্ষ করবো, সচেতনভাবেই সংকুচিত আকারে উপস্থিত করছেন— গুমোট হয়েছে; এবং পরের বাক্যে *'আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল'*— এটাও বলা হলো, তবু এখনো আমরা ঝড়ের ভূমিকা কিছুই অনুমান করতে পারছি না, এবং অবিলম্বে যে বলা হচ্ছে, টাকা নিয়ে নদীর পাড়ে যাবার কথা শুনে, *'বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না।'*— এটা পড়েও আমাদের মনে ঝড়ের ভূমিকার কথা মনে আসে না, বরং প্রসাদের জন্যে করুণা হয়, হাসি পায়, তাকে উদ্ভট এক ন্যালাখ্যাপা বলে বোধ হয়। টাকা নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওয়ানা হয় প্রসাদ; রওয়ানা হবার আগে আশা তাকে বলেছিল, *'আজ্ঞে হ্যাঁ,*

আনব।— মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর।— আশা গা ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পারো না?'

আশার এটা শয়তানী, প্রসাদকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা; আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি নেড়ে দেবার সময় ঝাল নুন তেল একটুখানি লেগে যায় প্রসাদের চিবুকে; মাঠ ভেঙে টাকা নিয়ে যেতে যেতে ঝড়ের আগে হাওয়ার একটু একটু তোড়ের ভেতরে প্রসাদের জিভেয় সেই ঝাল তেল নুন অনুভূত হতে থাকে। আমরা সেই যে বলেছিলাম ঘটনা থেকে ঘটনায় গড়িয়ে যাবার সাবলীলতার কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এখানেই এক সূত্র পেয়ে যাই যে, তিনি এইসব কৌশলের বলে, এইসব তুচ্ছ ও ভুলে যাবার মতো ব্যাপারগুলো দিয়ে রচনা করেন গ্রন্থি— দুই ঘটনার ভেতরে। কত সহজে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসাদের এই মাঠ যাত্রার ভেতরে এই কাঁচা আমের সুবাদে নিয়ে আসেন অতীত ইতিহাস; আমরা জেনে যাই প্রসাদকে নিয়ে আশার খেলা। প্রসাদ বিয়ে করবে শুনে আশা বললো, *'বুঝেছি গো, আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'* অর্থাৎ আশা প্রসাদকে বলতে চাইলো, সে যে বিয়ে করতে চাইছে সেটা নিতান্ত আশাকে না পাবার দুঃখে। কিন্তু এ তো সত্যি নয়; প্রসাদ তো আশাকে চায় নি; কিন্তু আশা নিজমুখে কথাটা উচ্চারণ করবার পর কোন পুরুষের না মনে হবে যে হয়তো আমার মনের মধ্যেই কথাটা ছিলো, সাহস করে বাইরে বের করতে পারি নি, এতই অসম্ভব যে নিজেই বুঝি নি।— এতবড় জটিল একটি চিন্তা মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর সচেতনভাবে গৃহিত সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করেন নিরীহ এমন একটি বাক্যে— *'এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে রাত্রে বাড়ি থাকবে না।'*— এবং এই বাক্যটিও নিরীহ লেখকের পর্যবেক্ষণ হিসেবে নয়, প্রকাশ করেন অনুচ্চারিত কম্পিত চিন্তা হিসেবে।

আশার এই সর্বনাশা খেলায় ছটফট করে প্রসাদ— *'কোথাও চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? অজানা জগতকে সে কম ভয় করে না।'* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে অচিরেই আমাদের দেখাবেন এই ভয় জয় করে নেবার প্রক্রিয়া; এই ভয় জয় করাটাই এ গল্পের গল্প হয়ে ওঠার কারণ।

শুরু হয় প্রসাদের ভয় বিনাশের প্রক্রিয়া, শুরু হয় ঝড়; মাঠের মধ্যে প্রসাদ, একা, *'কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কালবৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল।'* আমরা এখনো জানি না, প্রসাদের জীবনে এই ঝড় কী বিরাট ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। আমরা এখনো একটি বিপন্ন মানুষকে দেখছি, যে এখন উপড়ে পড়া এক গাছের তলায় পড়ে গেছে, গাছের ছোট ছোট ডাল ঝড়ে তার পিঠে চাবুকের মতো আঘাত করছে।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'ভয়ংকর' এক অসামান্য রচনা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রধান রচনা উপেক্ষিত এই গল্প— এবার, এই বৃক্ষপিষ্ট প্রসাদের ভেতরে এনে দেবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ঝড়ের ভয়ে প্রসাদ এতক্ষণ যে মরছিলো, এবার সত্যি সত্যি গাছের তলায় পড়ে প্রসাদ অনুভব করবে, *'এখানে এ ভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল।— ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে।'*

এর পরের বাক্যটি একই অনুচ্ছেদে একটানা লিখে গেছেন লেখক; লিখতে পারতেন আলাদা অনুচ্ছেদে, যে-কোনো লেখকের পক্ষেই সেটা স্বাভাবিক হতো, কিন্তু ইনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইনি পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিয়েছেন সরল ও সহজ ভঙ্গিতে গল্প বলবেন, যেনবা কৌশল বিনা, তাই তিনি একটানা লিখে যান অতঃপর এই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বাক্য— যেনবা চমকপ্রদ মোটেই নয় এরকম একটি ভান করছেন তিনি— লিখছেন, *'মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধ প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কিনা ভেবে কিছুক্ষণ সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে কিনা ভেবে বারবার উৎকণ্ঠায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।'*

আবিষ্কার করি, এই উৎকণ্ঠা প্রসাদের ভয়ের নয়; নবলব্ধ সাহসে অতঃপর সে যে পা ফেলবে, সেই পা কোথায় গিয়ে পড়ে, কোথায় তাকে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার উৎকণ্ঠা এ— যেনবা এক শিল্পীর উৎকণ্ঠা তার চিত্র প্রদর্শনীর পূর্বাহ্নে; এক কবির উৎকণ্ঠা আবৃত্তির পূর্ব মুহূর্তে; এক নবজাতকের উৎকণ্ঠা ও চিৎকার পৃথিবীতে প্রবেশ করেই। এবার বাকি শুধু ফসল তোলা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরেই যে বাক্যটি রচনা করেন তা আবারো প্রমাণ করে তাঁর ঘটনা থেকে ঘটনায় যাবার অদ্ভুত সাবলীলতা; এই ঘটনা থেকে ঘটনায় যাওয়া কেবল সাবলীলভাবেই নয়, গভীর অর্থপূর্ণভাবে। তাই ঝড়ের ভেতর থেকে প্রসাদ বেরিয়ে আসে, তার জীবনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে, তার ভীরুতা থেকে বেরিয়ে আসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন এই বাক্য— *'শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো।'* না, কাঁচা হাতের লেখা আশাবাদের প্রতীক এ আলো নয়— *'হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।'* ঝড়ে আটকা পড়েছে এই ট্রেন।

গল্পের শেষে এই ট্রেনেই ওঠাবেন প্রসাদকে আমাদের লেখক; কিন্তু এক্ষুণি নয়, সহজে নয়। কত সহজ হতো, এখান থেকেই প্রসাদ যদি ট্রেনে চড়ে, ভূষণকে ফেলে,

আশাকে ফেলে, তার অতীতকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো; কিন্তু প্রসাদ এখন তার ভয়কেই কেবল জয় করেছে তা নয়, মোকাবেলা করবার সাহসও অর্জন করেছে সে। প্রসাদ ফিরে আসে বাড়িতে; মাঠে তার টাকাগুলো ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল, সে-কথা ভূষণকে জানায়, ভূষণ তার দিকে তেড়ে আসে, কিন্তু প্রসাদ এবং আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই, '*ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে। খানিকটা তফাতে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে।*'

প্রসাদের চেহারায় যে কাদা-রক্ত তাই নয়, তার চেয়ে বড়, চেহারায় এখন ব্যক্তিত্বের বিভা; তাই আশাও এবার তাকে খেলাতে আর সাহস পায় না, সে প্রসাদকে বুকের ভেতরে টেনে নেয়; তারপর— '*প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড় বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারোটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।*' অর্থাৎ রাত বারোটার পর স্বামী মদের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে আশা প্রসাদের ঘরে আসবে, এই প্রতিশ্রুতি আশা তাকে এই প্রথম দেয়। কিন্তু তার আগেই আশার বুকে প্রসাদ পিষ্ট হতে হতে যে অনুভব করেছে, '*ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তন*' সে-কথা তো আর আশা জানে না। অতএব, আশার স্নানের ঘরে তারই সাবান দিয়ে গা সাফ করে, ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাতে পেট ভরিয়ে, প্রসাদ উঠে দাঁড়ায়। ঝড় তখন কমে এলেও প্রসাদের আবার কেমন ভয় করে, খুব ক্ষীণমাত্রায়; তবে এটুকু ভয় মানুষকে বরং এগিয়েই নিয়ে যায়, গতিরোধ করে না; প্রসাদ পা বাড়ায়। '*তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের পরিচয় হলে ভয় তার কেটে যাবে।*'

এত বড় একটা পরিবর্তন, সোয়া তিন হাজার শব্দের একটি গল্পের ভেতরে, তাও প্রকৃতির একটি হস্তক্ষেপে— এবং তা বর্ণিত হয় আপাতদৃষ্টে কোনো কৌশল বিনা, নিচুস্বরে, সরল ভাষায়, সহজ ভঙ্গিতে; হঠাৎ পড়লে মনেই হয় না, এ গল্পের লেখক বাংলা কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এক শিল্পী; যেনবা কোনো সমাবেশে ঢিলেঢালা পরিবেশে বলা একটি প্রায়-গুজব; এটাই হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় কৌশল, গভীরভাবে পরিকল্পিত নির্মাণকলা। এবং যখন স্মরণ করি, 'ভেজাল' নামে গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পই এটি, তখন আরো আবিষ্কার করি, লেখকের বলবার কথা হচ্ছে মানুষকে ভেজাল মুক্ত হতে হয় তার নিজের উপলব্ধিতে, একা, এবং স্বয়ং; বাইরের মানুষ বা মানুষের তৈরি কোনো ঘটনা মানুষকে বদলাতে পারে না; বদলাবার চেষ্টা ও সম্ভাবনা নিজের ভেতরে থাকে বলেই মানুষ বদলায়।

মার্জিনে মন্তব্য

গল্পের কলকব্জা : কবিতার কিমিয়া

কবিতার কিমিয়া

কবিতা কেন লেখা

খাপছাড়া বইয়ের প্রথম পাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : লেখার কথা মাথায় যদি জোটে / তখন আমি লিখতে পারি হয়তো! সেই বইয়েরই পঁয়ত্রিশ নম্বর পদ্যটাকে খানিক বদলে লিখে দেখি মানেটা কী দাঁড়ায় :

কবিযশোপ্রার্থীর
লেখা কর্তব্যই,
কাগজ কলম আদি
আছে সব দ্রব্যই।
বাকি শুধু লেখাটাই,
তাও হলো দৈবে—
কবিতার পাঠ-সভা
পাঁচটায় হইবে।
চোখ বুজে ভাবে, বুঝি
এল সব সভ্যই।
চোখ চেয়ে দেখে, বাকি
শুধু নিরেনব্বই।

মানেটা তো এই দাঁড়াচ্ছে, কবিতা শোনার লোক নেই। কবি নিজেই তার কবিতার শ্রোতা, নিজেই তার কবিতার পাঠক! তারপরও কবি লেখেন কবিতা। পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহের সাহিত্য সাময়িকীতে বিস্তর কবিতা ছাপা হয়— কখনোবা রঙিন চিত্রশোভিত হয়ে, সে সব কেউ পড়ে কি ? পত্রিকায় কবিতা ছাপা না হলে কি পাঠকেরা অভাব বোধ করতো— কী যেন কিছু একটা নেই! জরিপ করে দেখা যেতে পারে। আমি মুখে মুখে জনে জনে শুধিয়ে দেখেছি, না, তেমন আর কী ? কিছুই মিস্ করবো না। এমনও অনেকে বলেন, কবিতা ছেপে পত্রিকার পাতা নষ্ট!

মানুষ যদি কবিতা মিস্ না-ই করে, কবিতা ছেপে যদি পত্রিকার পাতা অপচয়ই করা হয়, তবে কবিতা লেখার দরকারটা কী ? কবিতাপাঠের সভা হয়, উৎসব হয়, সেখানে বিস্তর লোক উপস্থিত দেখি; এ প্রমাণে কি বলা যাবে কবিতার জন্যে কিছু না হলেও কিছু মানুষ উৎসুক ? খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ওই সভা বা উৎসবে যারা আসে তারা সকলেই হয় কবিতা লেখে অথবা লিখতে চায়, আর আসে ভিড়ের টানে কিছু মানুষ। চারদিকে তাকিয়ে এমনও মনে হয়, সমাজে যারা নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, কবিতা তাদের আকর্ষণ করে না, তাদের স্বক্ষেত্রেরও কোনো দরকারে আসে না কবিতা।

জীবনানন্দ দাশ স্বভাবতই ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। সেই তাঁরও উষ্মা গোপন থাকে না যখন তিনি কবিতার কথা প্রবন্ধে প্রশ্ন করেন: *কবিতা আমাদের জীবনের*

পক্ষে সত্যই কি প্রয়োজন ? কেন প্রয়োজন ? কবিতা যে এত অল্প লোকে ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিরই নিয়ম, না কি অধিকাংশের বিকৃত কি দূষিত শিক্ষার ফল ? আরো একটু এগিয়ে সখেদে এ পর্যন্ত তিনি বলেন, *যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন ?*

কবিরা কি সত্যিই তবে সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে— উপস্থিত, কিন্তু আচ্ছাদিতভাবে নির্বাসিত ? এর উলটো কথাও আমি স্বকর্ণে শুনেছি। নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবি ডেরেক ওয়ালকট একদা ওয়াশিংটনে এক সাহিত্য সম্মেলনে আমাকে বলেছিলেন, আমি আপনাদের ঈর্ষা করি; আপনারা তৃতীয় বিশ্বের কবিরা আছেন সমাজের কেন্দ্রে, আর আমরা পাশ্চাত্যের কবিরা পড়ে আছি সমাজের প্রান্তে।

ওয়ালকটের কথাটা কি সত্যি ? বাংলাদেশের কবিদের দেখি রাজনৈতিক সভায় তাঁদের সমাদরে আহ্বান করা হচ্ছে, কবিতা পড়তে বলা হচ্ছে; দেখতে পাই অনেক রাজনীতিকই কবিদের কাছে টানেন, আদর করে ভালো আসনে টেনে তাঁদের বসান; এমনকি রাজনীতি নিয়ে কবিদের মধ্যে মেরুকরণও আছে বাংলাদেশে। এ সবের পরেও কি বলা যাবে আমাদের দেশ মানুষ রাষ্ট্রের জন্যে কবি ও কবিতা সত্যি সত্যি আবশ্যিক একটা বিষয় ? কেন্দ্রেরই একটি ঘটনা ? কিন্তু আমাদের কবিরা বলবেন, তাঁরা উপেক্ষিত। এবং তাঁদের কথা ফেলবার নয়।

তারপরও কবিরা লিখছেন কবিতা। তারপরও কবিতা কিন্তু থেমে নেই। কবিতা লেখা হয়েই চলেছে। নতুন নতুন কবি আসছেন। প্রতি বইমেলায় শ'য়ের ওপরে কবিতার বই বেরুচ্ছে। আমাদের চারদিকে সবচেয়ে বেশি যদি কিছু লেখা হয় তা কবিতা। ছাপা হচ্ছে, আবৃত্তি হচ্ছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়— কবিতার বই কেনে কারা ? কবিতা পাঠ শোনে কারা ? একবার আমারই এক প্রেমের কবিতার বই দেখেছিলাম পার্কের ঘাসে তরুণীর কোলে মাথা দিয়ে শয়ান এক যুবকের বুকের ওপর— পাতা খোলা পড়ে আছে। কবিতা তবে প্রেমিক-যুগলেরই কাজে আসে ? আর দেখেছিলাম শামসুর রাহমানের এক কবিতার পঙ্‌ক্তি রাজনৈতিক এক দিবসের ব্যানারে জ্বলজ্বল করতে। কবিতা তবে রাজনীতির কাজেও লাগে। প্রেম আর রাজনীতিই কি তবে কবিতার কোল-দাতা ?

আরো এক অঘটন দেখি। কবিতার দিকে হাত বাড়ায় কবি অকবি সকলেই— অকবিই অধিক। একজন কবি তো এক রাইফেলধারীকে কবিতায় হাত লাগাতে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন, সব শালা কবি হবে! আরেক কবি আমাদেরই, তিনি তীব্র বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, কবি ও কাকের সংখ্যা সমান সমান। তারপরও ভালো মন্দ কবিতা-অকবিতা লেখা হয়েই চলেছে।

কেন লেখে কেউ কবিতা ? ভেতরে কথার একটা চাপ বোধ করে বলে ? কথার ভেতরে ধ্বনির সঙ্গীত তাকে দুলিয়ে দেয় বলে ? দৃষ্টির ভেতরে জগতটাকে সে নতুন

বা অন্যরকম হয়ে উঠতে দেখে বলেই কি ? কবিতা তবে কী ? রবীন্দ্রনাথের মতো কবিও এর উত্তরটা ঠিক দিতে পারেন নি। তিনি বলছেন, *কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটা নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদমহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে-সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে, কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়; নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ঐগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।* আর জাঁ কক্‌তো বলেন, *বৃক্ষকে জিগ্যেস করুন বোটানি কী, সে যদি উত্তর দিতে পারে তবে কবিও হয়তো বলতে পারবেন কবিতা কী!*

কবিতা কি প্রেরণার বিষয় ? ভাবের ঝোঁকে লিখে ফেলা শুধু ? আর কিছুরই দরকার নেই ? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘোষিতভাবেই প্রেরণায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, *প্রেরণা... শব্দটির ঢের অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির শুদ্ধতা ও সঙ্গতি নষ্ট হবার নয়। নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়— আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন— এবং সে সবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃংখলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়।... কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিক ভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা।*

তাহলে শব্দেরই এ সীমাবদ্ধতা; এ কারণেই প্রেরণাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে বিপদে পড়ি। আবেগ আর প্রজ্ঞার সমন্বয় হলে মন যে অগ্নির মতো দীপ্তিময় হয়ে ওঠে— অন্য শব্দের অভাবে অগত্যা প্রেরণা বলতে হয় তাকেই। এই প্রেরণাই আমাদের দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়। সুধীন্দ্রনাথকে দিয়েও লিখিয়ে নিয়েছে। এই প্রেরণা আমাদের সহস্র-চক্ষুস্মান করে তোলে। আমরা জগত এবং কালপ্রবাহ, জীবন এবং উত্থান-পতন দেখে উঠি— অস্তিত্বের মর্মে গিয়ে বাসা গড়ি; ভাষায় তাকে প্রকাশ করি এবং সে ভাষাটিও প্রাত্যহিকের শব্দ-আদল ধারণ করলেও তারা হয় কবিরই স্বকৃত স্বউদ্ভাবিত— যেনবা মন্ত্র, যার অর্থ ঠিক বুঝি না, কিন্তু এক ইন্দ্রজালের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠি, রক্তের ভেতরে অনুভব করে উঠি বিস্ময়।

কবিতাকে আদিম কালের মন্ত্র রচনারই সম্প্রসারণ বলে আমি দেখতে পাই। কবিতাকে আমি অনুপ্রাণিত সংলাপ বলে অনুভব করি। কবিতার ভেতরে আমি জীবন-অভিজ্ঞতার সার আবিষ্কার করি। সংকেতে প্রতীকে রূপকল্পে কবিতা আসলে তুলে ধরে আমাদেরই আশা হতাশা, বোধ ও বিবেচনা, আনন্দ দুঃখ, আর আমাদেরই অস্তিত্বের সংকোচন ও সম্প্রসারণের সংবাদ।

এ সংবাদ কার কাজে লাগবে, সেটা জানার চেয়ে একজন কবির জন্যে অনেক বেশি জরুরি সংবাদটি জানিয়ে ফেলা। রাজার কান গাধার মতো লম্বা— তথ্যটা বিপজ্জনক— গর্দান চলে যেতে পারে খবরটা জানালে। কিন্তু না জানিয়ে উপায় কী ? যা জেনেছি বুঝেছি তাকে গোপন রাখা গৃহস্থের সুবুদ্ধি হতে পারে, আর সকলের নয়।

উপকথায় পাই খবরটা একজনকে বলতেই হয়েছিলো; সে বলেছিলো শর বনের নির্জনে। বাতাস ছিলো না বসে। শরের বনে বাতাস এক অট্টহাসের হা হা স্বর তুলে খবরটা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলো! কবিতাও ঠিক এইভাবে কাজ করে। বলে যেতে হয়— এমনকি বৃক্ষকেও; একদিন তা সবার কানে পৌছোয়। জীবনানন্দের *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি* একদা কারোই কানে পশে নি, মুক্তিযুদ্ধের সময় কবির ওই কথাটাই ছড়িয়ে গেলো সারা বাংলাদেশে— অবরুদ্ধ গৃহ থেকে যোদ্ধার বাংকার পর্যন্ত— সুকান্তর কথায় *হিমালয় থেকে সুন্দরবন*— হঠাৎ বাংলাদেশে!

মনে হয়, কবিতার ওই রাজনৈতিক-সামাজিক উপযোগিতাটা আমাদের মতো দেশকে বেশ তপ্তই রেখেছে বহুদিন থেকে; রাজনৈতিক কবিতার তাই এত প্রকোপ বাংলাদেশে। অধিকাংশই সে সকল সাংবাদিকতা— কবিতা নয়। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক কেন যে-কোনো বিষয়ে কবিতা লেখার জন্যেই একটা ধারণাশক্তির দরকার হয়। এ বিষয়ে কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটা কথা আমাদের ধাতস্থ করতে পারে। তিনি বলেন, *যাকে কাব্যের ধারণাশক্তি বলছি তা কেবলমাত্র ঘটনার টুকরো কুড়িয়ে সরাসরি বাক্যে গ্রন্থনশক্তি নয়। সেভাবে জর্নলিজম-এর নগদ মূল্য মেলে, পরিবেশের চমক লাগানো যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং সঙ্গে-সঙ্গে খরচ করবার কৌশলবিধি সৃষ্টিশীলতার মুখ্য পরিচয় নয়, অধিক ক্ষেত্রে সেটা কাব্যপ্রকাশের বিরুদ্ধ পথ। নানা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার শক্তিই ধারণাশক্তি। ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হওয়ার জন্যে চাই অনেক সম্বৃত-বেগ, যা আপনকালে এবং ছন্দে প্রকাশ পায়, যাকে তাড়া দেওয়া যায় না, অথচ যার মধ্যে বিভিন্ন-সমন্বিত সৃষ্টির অনিবার্যতা আছে।*

সম্বৃত-বেগ থেকে জাত সৃষ্টির এই অনিবার্যতাই একজনকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারে কবিতা। বিভিন্ন-সমন্বিত কথাটাও লক্ষ করবো। ভাষামাধ্যমের ভেতরে একমাত্র কবিতাতেই বিভিন্ন সকল অভিজ্ঞতার সমন্বয় দেখা ও করা সম্ভব। অমিয় চক্রবর্তী তাই এতদূর পর্যন্ত বলেন, *রাস্তায় ঘাটে কবিতা ছড়ানো; সিঁড়ির ধাপে, ঐ পাশের দরজায় পিতলের কড়াটা পর্যন্ত!*

অমিয় চক্রবর্তীর কথা থেকেই আরো খানিকটা বুঝে দেখি। *খুব স্পষ্ট লেখবার তাগিদ নিয়ে বসি না তা তো নয়। কিন্তু সেই তাগিদকেও জোর করে জাগানো যায় না। হঠাৎ জাগে। প্রবণতা তৈরি করতে পারি মাত্র, মনকে বাঁধতে পারি, চরিত্রশক্তিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজের ধ্রুবসুরে বেঁধে তুলি, মানুষের বড়ো অধিকারে সকলকে সমান জেনে সংহত সাম্যচিত্তে যখন কলম নিয়ে লিখতে বসি তখনো আয়োজন চলছে। এই আয়োজনকে প্রত্যহ সত্য করে তোলবার সাধনা লেখকের। কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, বা সম্পূর্ণ অবস্থাতেও যখন হঠাৎ ঠিক কথা, স্পষ্ট যুক্তি, সুভাষিত মনোভাব এসে পৌছতে থাকে তখন জানি আমার চেষ্টার অতীত একটি আত্মশক্তির ক্রিয়া চলছে। লেখকের সেই আত্মশক্তি তার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়, যার*

যতটা আয়ত্তাধীন লেখক হিসেবে তার শক্তির পরিচয় তত বড়ো। অনেক সময় মনে হয় নিজের মধ্যে সমস্ত মানসিক কারখানার কোনো একজন বড়ো কর্তা আছে, তাকে বাদ দিয়ে যথাবিধি লেখা, ভাবা, যুক্তিতর্ক, হৃদয়াবেগের প্রাত্যহিক নানাবিধ নিয়মিত কাজকর্ম চলতে থাকে, কিন্তু সবটা চালনা করা, কী তৈরি হচ্ছে তার তদারক করা, এবং সমস্ত আয়োজনকে হঠাৎ অন্য পথে নিযুক্ত করার কাজ লেখকের মনের কোনো এক মনোনায়কের হাতে। হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করেছি তার মানে গেছে বদলে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে।

কবিতায় থাকে— অমিয় চক্রবর্তীর কথা ধার করে বলতে পারি— ওই মনোনায়কেরই উপস্থিতি; ওই মনোনায়কই কবিতাকে লিখিয়ে নেয়। আর সে কবিতাও পৌঁছুতে চায় পাঠকের শ্রোতার ওই মনোনায়কেরই কাছে।

তাই, কবিতা আমরা না পড়লেও, পড়েও মনে না রাখলেও, আমরা নিজেরাই জানি না, টের পাই না— কিন্তু আমাদের মনোনায়ক ঠিকই জেনে যায়— কবিতা পড়া শেষ করে চোখ তুলে জগত যখন দেখছি, তখন সেই জগতের ভেতরে কোথায় যেন একটা বদল ঘটে গেছে। আসলে আমাদেরই সে বদল। কবিতার কাজ এইভাবে নিঃশব্দে গোপনে অগোচরে কিন্তু স-মানসেই চলে— চলে এসেছে কবিতার আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে।

কবিতা যেন বায়ু-সমুদ্র; এর ভেতরেই আমরা বাঁচি, কিন্তু মোটেই থাকি না সচেতন যে এই সমুদ্রটি আছে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, তিনি বলছেন, *কবিতা পড়ে অনুভব করা যায় খুব হৃদ্য জিনিসের স্পর্শে এসেছি— এই কবির এই কবিতায় যা রয়েছে আমার অভিজ্ঞতায়ও সে জিনিস ছিল, কিন্তু ঠিক এরকম স্পষ্ট, কৃতার্থ সংস্থানের ভিতরে ছিল না।... সৎ কবিতার স্পর্শে এসে আমার নিহিত অভিজ্ঞতার একটা আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটল এরকম ভাবে।*

এই পুনুরত্থান ঘটানোই কবিতার কাজ। এরই জন্যে কবিতা লেখা।

কবিতায় অর্থের শিবত্ব

কবিতার একটি কাজ আছে। কবিতা আমাদের পুনুরত্থান ঘটায়; কবিতা আমাদের কিছু বলে— সংকেতে চিত্রকল্পে সে আমাদের কিছু সংবাদ দেয়। পড়বার জন্যে যেমন বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়টা চাইই চাই, কবিতার সংবাদ নেবার জন্যেও তেমন একটা পাঠ নেবার দরকার আছে নিশ্চিতই। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাই, পাঠকের যেন এই একটা দাবি— পড়বার বা শোনবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝে ফেলবো। পাঠকের যেন কিছুই

করবার দরকার নেই, কেবল শোনা বা পড়া ছাড়া। কিন্তু, শুধু কবিতা কেন?— শিল্পের প্রতিটি মাধ্যমেরই সৃষ্টি নিজের ভেতরে গ্রহণ করতে হলে নিজেরও চাই প্রস্তুতি। শিল্পের কাছে নিজেকেও অনেকখানি এগিয়ে আসতে হয়।

জীবনানন্দ দাশ বলেন, *কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবী করে পাঠকের কাছে; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছানো দরকার।* অন্যত্র তিনি বলছেন, *খারাপ কবিতার থেকে ভালো কবিতা বেছে নেওয়ার কুশলতা, নানারকম কবিতার জাতি ও স্তর নির্ণয় করবার ক্ষমতা সকলের এক থাকে না।* জীবনানন্দ তাই পরামর্শ দেন, *দেশসময়ের যত বেশি সম্ভব শ্রেষ্ঠ সব কবিতা পড়া দরকার— ক্রমেই বেশি বোধ লাভ করতে হলে।* তাঁর এ পরামর্শ কেবল পাঠকের জন্যে নয়, তারও আগে— কবিতা যারা লিখতে চায়, আমি মনে করি, তাদেরই জন্যে প্রযোজ্য।

কিন্তু, উপলব্ধির আলোয় অর্থের ওই অনমনীয় শিবত্ব ব্যাপারটা কী? রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : *কালিদাস 'রঘুবংশে'র গোড়াতেই বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্র সম্পৃক্ত থাকে; এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সম্পৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে কবির।* কবি যখন এই কাজটি করে উঠতে পারেন, আর পাঠক যখন তা অনুভব করে উঠতে পারেন, তখনই কবিতার অর্থ শিবত্বে পৌঁছোয়। এই শিবত্বকে বোঝার একমাত্র উপায় কবিতা পড়া। এলিয়ট যে বলেন, কবিতা বোঝার আগেই হয় অনুভূত— সেই ইন্দ্রজালটির কৌশলই হচ্ছে কবিতা শোনা, কবিতা পড়া।

কবিতা পড়তে পড়তেই আমাদের মনে ধারণা জন্মায় কবিতা কি? কবিতা কি করে হয়? কথা— প্রতিদিনের কথাও কীভাবে কবিতার শরীরে জায়গা করে নেয়? রবীন্দ্রনাথ বলেন, *শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্য্যক্ ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সে বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত।* রবীন্দ্রনাথ ওই যে বলেছেন বেশিটুকু— আমি বলি ওই বেশিটুকুই কবিতা। কারণ, তাঁরই কথায়— *কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস।* অর্থাৎ সে জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না।

মুখের কথা, প্রতিদিনের ভাষা, এ সকল কবির উপকরণ বটে, কিন্তু যেমন আছে তেমনই তারা নয়। কবির কাজ হচ্ছে প্রতিদিনের সেই সকল শব্দের অর্থের ভেতরে অর্থাতীতকে পুরে দেয়া। এ কাজটিকে দুঃসাধ্য বলেছেন রবীন্দ্রনাথ— সাধ্যের অতীত বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ থেকেই একটা উদাহরণ দিতে পারি। গাছের পাতা আমরা চিনি, আলো চিনি, নাচও চিনি— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন *এই যে পাতায় আলোর নাচন,* তখন সে পাতাও আর পাতা থাকে না, আলোও থাকে না আলো,

নাচও থাকে না নাচ, তিন মিলিয়ে হয়ে ওঠে নতুন একটা কিছু, অর্থের অতীতে অর্থাতীত কিছু। শামসুর রাহমান যখন কবিতায় বলেন, *এখনো দাঁড়িয়ে আছি এ আমার এক ধরনের অহংকার,* তখন একে সরল একটি গদ্য বাক্য, সাংসারিক একটি উক্তি বলে আপাতশ্রবণে মনে হলেও— মোটেই তা নয়। এর প্রতিটি শব্দই প্রাত্যহিক ব্যবহারের বাইরে আমাদের সংকেত দিচ্ছে অন্য কিছুর, নতুন কিছুর, গভীরতম প্রদেশের এক সংবাদের। এভাবেই কবিতার শব্দাবলীতে আমরা সাক্ষাত পাই সেই শিবত্বের— দেখতে পাই ওই *এখনো* কথাটি কতখানিই না বিস্ফোরক, *দাঁড়িয়ে আছি* শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই নয়, অহংকারও নয় ধন-মান বা খ্যাতির অহংকার— মানুষের মর্ম ধরেই উত্থিত সে অহংকার বটে।

কবিতা লেখার শুরু ও ছন্দ তখন

কবিতা লেখার শুরু, প্রায় সবারই, কৈশোরে। তখন কবিতা হয় কিনা, সেটা এখানে বড় কথা বলে ধরছি না; না হয় বলি— পদ মেলানো; আমিও আমার বারো বছর বয়সে প্রথম পদ মিলিয়েছিলাম দু'পঙ্‌ক্তির। শামসুর রাহমানের কাছে শুনেছি, তিনি বেশ যুবা বয়সেই এক দুপুরে লিখে ফেলেন একটা পুরো কবিতাই; হ্যাঁ, কবিতাই; সেটা পদ মেলাবার মতো শিশু-খেলা ছিলো না। হাসান হাফিজুর রহমান আমাকে একদা বলেছিলেন বলে মনে পড়ে, সাত আট বছর বয়সে ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল বালুচরে কী কারণে যেন গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে; তাঁর বাবা বলেছিলেন, ওই দ্যাখ, বালুচর চিকচিক করে! আর হাসান নাকি সঙ্গে সঙ্গে পদ মিলিয়ে বলে উঠেছিলেন, সেই চিকচিক আমাদের চোখ অন্ধ করে! সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ বলতেন, ময়মনসিং তাঁর বাড়ি— ময়মনসিং বললেই তাঁর মন সেই ছোটবেলাতেই উসখুস করে উঠতো গরুর শিংয়ের সঙ্গে মেলাবার জন্যে!

এ সব ছেলেমির কথা থাক। অবশ্য ঈশ্বর নিজেই নাকি ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন কথাটা বলেছিলেন। শিব গড়তে বাঁদর গড়া বলে লোকচলিত একটা কথা আছে। অনেক কবির হাতেই উলটোটা ঘটেছে— শব্দ আর মিলের নুড়ি দিয়ে বাঁদর গড়তে গড়তে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিবই গড়েছেন।

কবিতা শুরুর কথায় এবার প্রণম্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। দেখি তাঁর কবিতা শুরুর ইতিহাস। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখছেন : *তখন 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।...ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার*

সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল। এই আদি কবি কিন্তু বাল্মিকী নন, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পদটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, পাওয়া যাবে তাঁর বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে। এরই মাত্র কয়েক বছর পর, *আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না।* রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, *আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়... আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।... গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।... ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে।... কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম।... সেই নীলখাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল।... সাতকড়িদত্ত মহাশয় যদিও আমার ক্লাশের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল।... তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে—*

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে।...

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

এর পর পরই আর একটি পদ রচনার সংবাদ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদি রচনার নমুনা হিসেবে।

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ • চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

লক্ষ করবো, রবীন্দ্রনাথকে যিনি কবিতার ছন্দ ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বাংলার সুপ্রাচীন ও কবিপ্রসিদ্ধ চোদ্দ অক্ষরের পয়ারই ধরিয়ে দেন। *কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুন্যবান*-এরই অবিকল ধাঁচে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার পঙ্‌ক্তিপাত— *রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।* আর ওই যে আমসত্ত্ব দুধে ফেলে হাপুস হুপুস শব্দে খাবার

পদ্যটি, ওর ছন্দটিও বালক রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন আরো এক প্রাচীন ও কবিপ্রসিদ্ধ ছন্দ থেকে— ত্রিপদী— পয়ারেরই সম্প্রসারণ এ—

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

লক্ষ করি এবং আমার বলবার কথাটি বলি যে, যাঁর হাতে বাংলার প্রচলিত সকল ছন্দ তো বটেই, সে-সব ছন্দের ওপরে নিজের তাল-মান-লয় ও যোগবিয়োগ ঘটিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষাই না যিনি করেছেন, যার এক দশমাংশও আজ পর্যন্ত বাঙালি আর কোনো কবির হাতে হয় নি, সেই রবীন্দ্রনাথকেও কবিতায় আসতে হয়েছিলো চোদ্দ অক্ষরের বাঁধা পয়ারের বাহনে চড়ে। এমনকি কবিতা রচনার আদর্শ হিসেবেও তিনি গণ্য করেছিলেন তাঁরই পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিলো এই কবির। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বড় কবি জেনে, নাকি সেই কবির ওপর তাঁর বৌঠানের টান দেখে ঈর্ষিত হয়ে, নিজেই বিহারীলাল হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন কিনা, মনস্তত্ত্বের বিষয়; সত্য এই, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিতে কবুল করছেন, *তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।... বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমরা মনের আকাঙ্খাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি— কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির ভক্ত পাঠিকাটি।* অর্থাৎ বৌঠান!

এভাবেই আমরা শুরু করি— রবীন্দ্রনাথের মতো ভাগ্যবান না হয়েও, যিনি বাল্যেই বিহারীলালের মতো কবিকে কাছে পেয়েছেন বা বৌঠানের ঠাট্টা শুনে শুনে বিহারীলালকেও ছাড়িয়ে যাবার জেদ ধরেছেন; আমরা হঠাৎই যখন একদিন কবিতা লিখতে শুরু করি, প্রধানত বিদ্যালয়ে পড়া সাহিত্য সংকলনে পাওয়া কবিতার আদলেই ছন্দটাকে ব্যবহার করি বা করবার চেষ্টা করি, শব্দে শব্দে মিল দেওয়াটাও আমাদের খুব জরুরি মনে হয়, আর, কবিতার বিষয় হিসেবে অধিক অনেকেই তথাকথিত কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়— প্রেম, জ্যোৎস্না, স্বদেশ, প্রকৃতি, ঈদ বা পূজো এইসবে যাই, কেউ কেউ বা সমকালের কবিদের কবিতা পত্রিকা বা বইয়ে যা পড়া যায় তা থেকেই বিষয়টা বক্তব্যটা উপমা-তুলনাটা বাক্যের গঠনটা ভঙ্গিটা নিজের লেখায় লাগাই। কবিতা লেখার উষাকালে আদর্শ জ্ঞান করে জীবনানন্দ যে নজরুল পাঠ করতেন, শামসুর রাহমান যে জীবনানন্দ পাঠ করতেন, হাসান হাফিজুর রহমান যে বিষ্ণু দে পাঠ করতেন, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ যে সমর সেন, এ সকলই এঁদের প্রথমকালের কবিতায় খুব স্পষ্ট করেই দেখা যাবে।

শুরুটা এভাবেই হয়। শেষটাই কেবল ভিন্ন হয়ে যায়— কারো কারো বেলায়, খুব কম পদ্যপ্রয়াসীর বেলায়। জীবনানন্দ বলেন, *সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।* প্রবাদতুল্য এই বাক্যটির সঙ্গে সকলেই আমরা পরিচিত। কিন্তু কেন কেউ কবি হয় আর কেউ হতে পারে না, তার ব্যাখ্যা এই বাক্যের পরেই কোলন চিহ্ন দিয়ে টানা বলা আছে যা অনেকে প্রায় লক্ষই করেন না। জীবনানন্দ সংকেতটা ধরিয়ে দিচ্ছেন : কবি— *কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবকাশ পায়।*

কবিতা সৃষ্টির ব্যাপারটাও জীবনানন্দের কাছেই পাবো : *কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই : যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি— একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটার বাংলা কী? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কল্পনাপ্রতিভা অথবা ভাবনা। আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা।*

এই ইমাজিনেশনের ভিত্তিটা কী? জীবনই তো— আমাদের চারপাশের জীবন। সেইটে চোখ মেলে দেখা চাই। খবর কাগজের সংবাদ, রাস্তার রাজনৈতিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, অস্তিত্ববোধ, অস্তিত্ব-সংকট— এ সব তো আছেই ও আসছেই কবিতায়, কিন্তু কীভাবে? আবারও জীবনানন্দের কথা শোনা যাক— রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই এত নিবিড়ভাবে কবিতা লেখার কিমিয়া নিয়ে কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তবতা আর চারপাশের জীবন একদিকে, কবিতা অন্যদিকে— ব্যাপারটিকে জীবনানন্দ দেখছেন এভাবে : আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে— *কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে সাধারণত আমরা যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না।... নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তু-সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত*

দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতরে তাদের একাত্মতা ঘটে— কাব্য জন্মলাভ করে।

আর এরই জন্যে চাই কল্পনা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা। এটি সকলের আসে না, হয় না, থাকে না— সমস্ত বৃক্ষই ফুল দেয় না। একজন যদি কবি, তবে তাঁর পেছনে পড়ে থাকে নব্বইটি ব্যর্থ পদ্যকারের লাশ। সেই লাশ হবো না কবি হবো— এই প্রতিজ্ঞাটি প্রথমেই মনের মধ্যে আনা চাই, সে প্রতিজ্ঞাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে নব নব কাব্য-বিকীরণের খোঁজ রাখা চাই, নানারকম চরাচরের ভেতরে চলাচল করা চাই। তবেই বিহারীলালদের থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, কাশীরামদের পয়ার থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্ভব— নইলে কবিতার সরোবরে মীনগণের মতোই হীন হয়ে যে পড়ে থাকতে হবে এতে সন্দেহ কী!

ছন্দটা কী

ছন্দ আছে সবার ভেতরেই— কবি অ-কবি, সাক্ষর নিরক্ষর সকলেই ছন্দের দোলা অনুভব করে নিশ্চয়। নিশ্চয় কেন, অবশ্যই। গান যিনি জানেন না, গান শুনতে শুনতে তাঁরও হাত ঠোকা দিতে থাকে। শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া; যদি সে তিনবার হুয়া না ডেকে দু'বার ডাকে— আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি, কেননা অসমাপ্ত থেকে গেলো— কী? না, ছন্দ। বিয়ের সাতপাক ঘোরা, কবুলের তিনবার বলা— কম হলেই যে ধর্মরক্ষা হলো না সে তো আছেই, ছন্দটাও যেন মারা গেলো। পাঠশালে নামতা ঘোষানো একটা সুরেই চলে, তবে তার চলনটা ছন্দে বাঁধা। ফিরে ফিরে এক-দুই-তিন-চার বললে মনের মধ্যে একটা কিছু তৈরি হয়— একে বলি দোলা— আসলে ছন্দের দোলা। এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন বললেও তাই হয়। বোধহয় একটা গণিত আছে এর। সঙ্গীতের সঙ্গে গণিতের একটি আত্যন্তিক সম্পর্ক আছে, কবিতার ছন্দেরও তা-ই আছে। আমাদের রক্তের ভেতরেই আছে।

রক্তের ভেতরে এই ছন্দটা, ছন্দের এই গণিতটা আমরা পাই কী করে? একটা উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদেরই জননীই সে উৎস। জননীর গর্ভে ভ্রূণ যখন বেড়ে ওঠে, জননীরই হৃদপিণ্ডের একতালে চলা লাবডুব লাবডুব ধ্বনি আমাদের ভেতরে তৈরি করে দেয় প্রথম ছন্দোবোধ। তারপরে, জননীই যে আরেক উৎস— তাঁর মুখে আমরা আদরের ঝিলিমিলি দুর্বোধ্য শব্দসকল শুনি— সেও ছন্দে; শুনি তাঁরই মুখে ছড়া, বচন, পদ্য— শুনতে শুনতে আমরা বড় হই, আমাদের কান তৈরি হয়, তালবোধও কমবেশি সকলেরই আয়ত্বে চলে আসে অনায়াসে।

এই তালবোধ থেকেই জন্ম নেয় ছন্দ। গণিতের ওই এক-দুই-তিন-চার কি এক-দুই-তিন থেকে গড়ে ওঠে ছন্দের শরীর, ছন্দের ব্যাকরণ। আমার ধারণা বাংলা ভাষায় যত রকমের ছন্দ আছে— সবই তো অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত অথবা স্বরবৃত্তের হেরফের— এদের ভেতরে কোনো না কোনো ভাবে ওই দুই গাণিতিক সংখ্যা বিন্যাসই কাজ করে— এক-দুই-তিন-চার এবং এক-দুই-তিন।

প্রতিদিনের কথায় বলি, আমার মন ভালো নেই— কবিতার ছন্দে এই কথাটাই যদি বলা যায় এভাবে— আমার মন একটুও ভালো নেই, কিম্বা, এখন আমার মন ভালো নেই আর, অথবা, মনটি আমার ভালো যাচ্ছে না ইদানিং— তবে কি মূল সংবাদটা কবিতার শরীরে একটু কৃত্রিম হয়ে পড়লো ? সর্বনাশ! কৃত্রিমতা মানেই তো বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো। কিন্তু কবিতায় ছন্দে গাঁথা ছন্দে বাঁধা বাক্য তো সত্যের চেয়েও সত্য বলেই আমাদের মর্মে ধরা পড়ে। তবে ?

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছন্দ ?— *এ কেবল বাইরের বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে।*

রবীন্দ্রনাথ শুধু শব্দে শব্দে মিল দেয়া আর মাত্রায় মাত্রায় ছন্দ গাঁথাকেই ছন্দ মনে করতেন না। তিনি বলেন, *শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে।... যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মনকে বিচলিত করে।*

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আমাদের সাবধানও করে দিচ্ছেন এই বলে : *গদ্য যখন কবিতায় আসেনি, সেদিন পদ্যছন্দের সতিন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই-পড়াটা অনেকস্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীয় রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবচ্ছন্দের মুক্তি দাবী করছে।*

দাবি করলেই তো হলো না। কবিতা হওয়া চাই। কীভাবে গদ্যও হয় কবিতা? ভাবের ওই ছন্দটাই ব্যাকরণসিদ্ধ ছন্দ থেকে মুক্তি দেয় কবিকে— তাকে দিয়ে গদ্যের শরীরেও কবিতা লিখিয়ে নেয়। তাই বলে, ভাব-ছন্দের দোহাই দিয়ে কাব্য-ছন্দটা না শিখলেও চলে ? না, একেবারেই নয়। কবিতা লিখতে হলে— গদ্যেই হোক, পদ্যেই হোক— ছন্দটাকে ভালো করে আয়ত্বে পাওয়া চাই, ছন্দের কানটাকে তৈরি করা চাই। সঙ্গীতের মতো শব্দেরও আধমাত্রা সিকিমাত্রা আছে, সেইটিও ধরতে পারা চাই। ছন্দ

যদি ভাঙতেও চাই, ছন্দে না লিখে গদ্যেই যদি কবিতা লিখতে চাই— তবু জানতে হবে ছন্দ, গদ্যের আগেই তা জেনে নিতে হবে, কলমে তার রেওয়াজ করে নিতে হবে। কারণ ? গদ্য-কবিতা লিখতে ছন্দ শিখে নেবার কারণটা ? উত্তর খুবই সহজ। ছন্দটা যে ভাঙবো, কী ভাঙছি সেটাই যদি না জানি, তবে ভাঙছি কী ?

গদ্য-ছন্দ : ভাব-ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বলেন, *যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক; ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে— নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।*

কিন্তু বলাবাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়।...

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।

এই সূত্রেই বলে নিতে হয়, ছন্দ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা সর্বস্তরে আছে : যা কিছু ছন্দে বাঁধা সেটাই কবিতা। ছন্দই যেন কবিতা! কিন্তু নয়। কবিতা ছন্দে নেই, ছন্দ তার এক বিশেষ পোশাক মাত্র— বাইরে বেরুবার— পাঠক-শ্রোতার দরবারে হাজির হবার। অন্য পোশাকে এলে যে সমাদর হবে না তার, এমন নয়। যদি বলি, গদ্যকবিতায় তো ছন্দ নেই, তবে কি পোশাক ছাড়াই উলঙ্গ সে হাজির হলো ? তাও নয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে, সে ছন্দটা যেন দর্জির বাঁধা ডিজাইনের পোশাক নয়, নিজের ডিজাইনে উদ্ভাবিত সে পোশাক— যাকে বলবো স্পন্দিত, ছন্দিত— কিন্তু প্রচলিত অর্থে ছন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, *রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে বেশ চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত।*

গদ্যকে এই প্রাত্যহিক ব্যবহার থেকে মুক্তি দিয়ে কবিতার শরীরে যখন তাকে কবিতায় আনছি তখন সে কোন্ ছন্দ ? গদ্যছন্দ ? স্পন্দিত গদ্য ? ছন্দাভাসের গদ্য ? পরিহাস করেও কি বলা যাবে গচ্ছন্দ ?

কিম্বা, রবীন্দ্রনাথেরই কথাসূত্রে, গদ্যে লেখা কবিতার ছন্দকে কি বলা যাবে— ভাবচ্ছন্দ ? তিনিও বলেন নি, কেউ বলে নি, এ ছন্দের নামই করা যায় নি। কবিতার শরীরে গদ্যের এই ব্যবহার— ভাবের ওই ছন্দ ও তার ব্যাকরণটি কবির একান্ত নিজস্ব; নামহীন সে; এই নামহীনতাই তার বৈশিষ্ট— এক কবি থেকে আরেক কবিতে সে ব্যক্তিত্ব, দোলা ও ধ্বনিসঙ্গীতে অনন্য।

কয়েকটা উদাহরণ হাজির করলেই বোঝা যাবে গদ্যে লেখা কবিতার 'ছন্দ' কীভাবে ভিন্ন দোলায় আমাদের দুলিয়ে দিচ্ছে, একেকটি স্বরকে একেবারে সিলমোহর মেরে দিচ্ছে কবিরই— যে, এটি তাঁরই, আর কারো নয়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে :

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।
রথে চলে চলেছে কাল,
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা— যার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করা গেলো, গদ্যের মতো টানা লিখে বা ছেপে গেলেও আমরা একে কবিতা বলেই চিনে উঠতাম; প্রাত্যহিকের সংবাদ যে গদ্যে বলা হয়, তার থেকে এর বাক্যগঠন খুব একটা ভিন্ন না হলেও, এর শব্দ-সঞ্চালন বিশুদ্ধভাবে কবিতারই। এর ভাষাস্পন্দনও কবিতার। ধ্বনিসঙ্গীতে সে ছন্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতার চেয়ে কম উড্ডীন নয়।

জীবনানন্দ গদ্যের শরীরে কবিতা লিখেছেন খুবই কম; তবুও যে ক'টি লিখেছেন তার স্পন্দনেও আমরা আবিষ্কার করি গদ্য তাঁর হাতে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কতটাই ভিন্ন বোল দিচ্ছে।

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :
মস্ত বড়ো ময়দান— দেবদারু পামের নিবিড় মাথা— মাইলের পর মাইল;
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়;
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার;
জানালায় জানালায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে ;
পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।
তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে— গান গায়— গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।

জীবনানন্দও এ কবিতা— যার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা গেলো— লিখতে ও ছাপতে পারতেন টানা গদ্যের আকারে; লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত কবিতায় পঙ্‌ক্তি ভেঙে লেখার কারণ যদি অনুমান করি, বাক্যের কিম্বা বলা ভালো বক্তব্য উপস্থিত করা বাক্যের যুক্তি ও যতি-ক্রম অনুসরণ, তবে জীবনানন্দের উদ্ধৃত অংশে পাবো টানা গদ্যে না লেখার আরেক মনস্তত্ত্ব। আমাকে— এই একটি শব্দ নিয়েই প্রথম পঙ্‌ক্তি, এ আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে একা বিচ্ছিন্ন থেকে, সরাসরি কবি, বলা ভালো কবিতার ভেতরে আমি-চরিত্রটির সমুখে— সটান। তৃতীয় স্তবকটি যে বেশ দীর্ঘ, অনুমান করি সে ওই মাইলের পর মাইল বিস্তারটি চোখেও দেখিয়ে দিতে; দ্বাদশ পঙ্‌ক্তিটিও একই মাপের দীর্ঘ বটে— কিন্তু এখানে মাইলের পর মাইল ধরে রাখতে নয়; বর্ষীয়সী ওই রূপসী যে পা ছড়িয়ে বসে আছে, অনুমান করি, সেই ছড়িয়ে বসাটাই এখানে আমরা চোখেও যেন দেখে উঠছি।

গদ্যের শরীরে কবিতা লেখার আরেক কবি— গদ্যেই যাঁর বহু বহু কবিতার অনন্য স্ফূর্তি— সেই বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতার প্রথম খানিকটা দেখি—

শুনতে পাই জীবিতের ভারে এই পৃথিবী অবসন্ন। কিন্তু মনে হয় মৃতের সংখ্যা আরো বেশি।

সে কোন জগৎ, যেখানে তারা ধ'রে যায় ? সে কি পাতাল, সে কি অন্তরিক্ষ, কোনো কল্পনাতীত সুদূর ?

কোনো বায়ুহীন ব্যোমে কি ভেসে বেড়ায় তারা ? কোনো অতল, অনার্দ্র জলে সাঁৎরে চলে ? তাদের ওষ্ঠাধর আছে ? কণ্ঠস্বর ? তারা কি জানে তারা মৃত ?

মনে হয় সন্তান সেখানে মা-কে ফিরে পায়, প্রেমিক-প্রেমিকা হাতে হাত ধ'রে হাঁটে— নিঃশব্দে, নিঃশব্দে— যেন মাটিতে তাদের পা পড়ে না অথচ মাটি তাদেরই জন্য সবুজ।

কিংবা হয়তো স্পর্শেরও আর প্রয়োজন নেই; বৈদ্যুতের দুটি স্ফুলিঙ্গ তারা এখন, স্রোতের মতো পরস্পরে ব'য়ে যায়। খিদে পায় কি তাদের ? ঘড়ি আছে ? আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী ? নতুন কেউ এলে কি এগিয়ে আসে, দল বেঁধে অভ্যর্থনার জন্য ? কোনো সাঁকোর রেলিঙে ঝুঁকে নিশেন ওড়ায় ?

না কি তারা প্রত্যেকেই একলা, সীমাহীনরূপে নিঃসঙ্গ, না কি এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের মতোই দূরত্ব তাদের অফুরান ?

কবিতাটি বুদ্ধদেব লিখেছেন পঙ্‌ক্তি ভেঙে নয়, গদ্যেরই মতো টানা, প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ; কিন্তু এও কবিতা, কবিতাই— বিশুদ্ধ ও স্পন্দিত।

শামসুর রাহমান স্বচ্ছন্দ বোধ করেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে— বিশেষ করে আঠারো মাত্রার, এবং প্রায়ই পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে পর্ব তিনি রাখেন নানা মাপের। সেই তিনিও গদ্যের শরীরে কবিতা লিখেছেন, এমনকি তাঁর একটি কবিতা যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ওপর লেখা অসাধারণ একটি কবিতা, তার খানিকটা তুলে দেখাই— তিনি যে ভাবে পঙ্‌ক্তি ভেঙে লিখেছেন, তা না করে টানা গদ্যের মতোই ছেপে দিই এটা বোঝাতে যে গদ্যে লেখা কবিতা পঙ্‌ক্তি ভেঙে লিখলেই কবিতা হয় না, ওটি কবিতা হয় তার অন্তর্গত সারাৎসারের জন্যেই। উদ্ধৃত করি শামসুর রাহমান থেকে :

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তভিটার অগ্নিস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের ওপর।

গদ্যের শরীরে কবিতা আমি প্রায় আমার কবিতা শুরুর দিন থেকেই লিখি; আমারও একটা নমুনা এখানে হাজির করি কীভাবে আমিও চেষ্টা করেছি কবিতার এ গদ্যকে আমারই স্পন্দনের সিলমোহরে বিশিষ্ট করতে। দীর্ঘ কবিতা থেকে একটি স্তবকের এই উদ্ধৃতি হয়তো কেবল আমার গদ্যছন্দই নয়— কবিতা কী, কবিতা কেন, কবিতা কীভাবে, এ সকলেরও একটা ধারণা দেবে।

বালক, আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, একদিন কবি হবে তুমি। একদিন
শব্দ হবে তুমি, ছন্দ হবে, ব্যাকরণ হবে। একদিন শব্দকে ভাঙবে তুমি,

ছন্দ একদিন তোমার হাতে খেলা করবে বাজিকরের হাতে আগুনলাঠি,
ব্যাকরণ তোমার কাছে থেকে শিখে নেবে কি করে ভাঙতে হয় তালা,
তোমার কড়া নাড়ায় খুলে যাবে শহরের বন্ধ সকল দরোজা ও জানালা,
গ্রাম উঠবে আহ্লাদে নেচে, যুবতীর মতো শুয়ে পড়বে মাঠে মাঠে,
মিছিলের পা হবে অগ্রসর ও জেদী, শ্লোগানের স্বর হবে অভ্রভেদী,
যুদ্ধের ফলাফল হবে নিশ্চিত, আর তুমি ময়লা জামায় ফেরেশতা, তুমি
কবি, তুমি দূরপ্রান্ত থেকে এই আগুনের মধ্যে অবিরাম হাঁটতে থাকা
বালক, একদিন তুমি এ সবের উপায় নিয়ে খুলে ফেলবে তোমার জামা,
মাতৃদুধে ধুয়ে নেবে তোমার রক্ত ভেজা চুল, আর তোমার জন্যে
জামা নিয়ে অপেক্ষা করবে যারা এতকাল উৎসন্নতার ভেতরে ছিলো
নির্বাসিত কিন্তু গোপনে গোপনে বয়ন করছিলো বস্ত্র, ভোর তোমাকে
পদক দেবে, রাত্রি তোমাকে মালা দেবে, চাঁদ তোমাকে চন্দন দেবে,
নদী তোমাকে দুধ দেবে, পলি তোমাকে পেশী দেবে, মানুষ তোমাকে
কবিতার ভাষা দেবে, মানুষের শোক তোমাকে দীর্ঘ জীবন দেবে,
মানুষের স্বপ্ন তোমাকে কবরের ভেতরে কাফনে জড়িয়ে রাখবে।
তুমি মরণশীল, তুমি মৃত্যুর নীল ভেতরে অমরত্বের বিমানে উড়বে।
বালক, আমি তোমাকে স্বাগত করছি, একদিন তুমি আমাদের কবি হবে।

কবিতা কী করে হয়

কবিতা কী করে হয়ে ওঠে কবির করোটির ভেতরে— কী সেই কিমিয়া, সেই কেমিস্ট্রি, সেই রসায়ন— কী করে অক্ষরপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হয় কবিতাটি— কবিতাই বা কেন, শিল্পের যে-কোনো মাধ্যমেরই কাজ শিল্পীর কল্পনা-করোটি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীর ধরে কী করে হয় উপস্থিত— এ এমনই যার অন্তর্গত কিমিয়াটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে একেক প্রকার।

টি এস এলিয়টের *ফোর কোয়ারটেট্স*-এর *লিটল গিডিং* পর্ব-কবিতায় এমত একটি কথা পাই— *প্রতিটি কবিতাই এক সমাধিলিপি!* সেই কবে পড়েছিলাম, চমকে উঠেছিলাম, এখনো ভুলতে পারি না। এখনো যখন এলিয়টের ওই কবিতাটি পড়ি, এখনো প্রতিবার ওই অনুভবে প্রহত হয়ে থেমে যাই। এখনো মাঝেমাঝে আমার নিজেরই একটি সদ্য লেখা কবিতার দিকে তাকিয়ে মনে হয়— এই তবে সমাধিলিপি রচনা করা গেলো আমারই!

এ *সমাধিলিপি* কথাটির গভীরে যে-কথাটি আছে— শেষ কথাটিই বলা হয়ে গেলো তবে। সমস্ত শর্ত সরিয়ে রেখে নিজের দিকে নির্মম নিষ্করুণ তাকিয়ে দেখা— যা কবিতারই একমাত্র কাজ— 'এই বুঝি এইই সব। এরপরে আর কিছু নয়। এভাবেই তবে রইলো আমার সকল দেখা ও কথার সারাৎসার।'

আবার কখনো ভেবেছি, সমাধিলিপির মতো করে শেষ কথাটি কি আমি বলতে পারছি শাদা কাগজে অক্ষরের পর অক্ষর, পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি নামিয়ে ? কত যে কবিতা আর শেষ করতে পারি নি, শুরুই করতে পারি নি আরো কত! ড্রয়ার টেনে অসমাপ্ত কবিতার স্তূপের দিকে তাকিয়ে কতবার মনে হয়েছে— শেষ করা যেত বটে, করি নি; করোটির ভেতরে প্রবেশ করে কতদিন মনে হয়েছে, অক্ষরেই ধরি নি, ধরা যেত বৈকি। কখনো কখনো এমনও বুঝেছি, আমি-যে নিজের একটি কাব্যশালার স্থাপনায় একটি জীবন আছি ব্যস্ত, এই শ্রমটিকে অসামান্য গণনা করে এখনো যে আমি এক পবিত্র-অহংকারে পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি, এর প্রবর্তনা ও বিবেচনাও আমি এলিয়টের ওই অনুভব থেকেই পেয়েছি নিশ্চয়।

একজন বড় কবি আসলে কিন্তু অনুকারক গড্ডলিকার জন্ম দেন না। তিনি বড় কবি হন যিনি আরেক কবিকে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব কবিতার দিকে এগিয়ে নেবার মন্ত্র এবং সংকল্প ও শুদ্ধি দান করতে পারেন।

কবিতা— কবিতা কেন— যে-কোনো শিল্প সৃষ্টিই যে কত কষ্টের ও দুঃখের, কত অপ্রতিভ কল্পনাপাতের, কত গূঢ় শ্রমসাধ্য, এবং যখন সৃষ্টিটি সম্পন্ন তখনো যে কত গোপন শোক থেকে যায়— এই যা রচিত হলো, করা গেলো সকলের কাছে উপস্থিত, এ তো অবশ্যই হতে পারতো মূল কল্পনার আরো কাছাকাছি, আরো উজ্জ্বল, আরো সম্পূর্ণ, আরো সার্বত্রিক, কিন্তু আমার আর নেই শক্তি ও ধৈর্য— এ সবই আমরা ভুলে যাই, বিশেষ করে কবিতার পথে নবীন পথিকেরা। আমি খিন্ন হয়ে দেখি, অধিকাংশ আমরা সৃষ্টির জন্যে নির্ভর করি দৈবের ওপর, ভরসা রাখি প্রেরণার ওপর, এমনকি 'প্রয়োজন'-এর ওপর— রাজনৈতিক, সামাজিক, অথবা যশোলাভসংক্রান্ত; আর শ্রম পরিমাণকে কমিয়ে দেখি আত্মঘাতী রকমে।

কবিতার জন্ম প্রক্রিয়ার বিষয়ে একদা পাঠ নিয়েছি রবীন্দ্রনাথ, এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট, বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের নানা প্রবন্ধ থেকে— বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অবিরাম কথন, লিখন, প্রবন্ধ থেকে তাঁরই কবিতা সম্পর্কে। স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে লিখছেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার জন্ম বিষয়ে, তখন তিনি সদর স্ট্রীটের বাড়িতে আছেন, একদিন সকালে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, গাছ তাঁর চোখে পড়ছে :

সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখে উপর হইতে যেন একটি পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা

এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনও যবনিকা পড়িয়া গেল না।

বিশেষ করে নিচে দাগ দেয়া অংশটি পড়ে আমাদের মনে হতেই পারে রবীন্দ্রনাথ দৈবেরই কৃপায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার বিষয়টি এক সকালে এইভাবে পেয়ে গেছেন। কিন্তু না। এমন সূর্যোদয় আমরা অনেকেই দেখেছি, আমাদের অনেকেরই মনে সূর্যের প্রথম আলো ঠিক অমন করেই একটি পর্দা সরিয়ে দিয়ে গেছে, আমরা অভিভূত হয়েছি সৌন্দর্যে, ভেসে গিয়েছি সেই তরঙ্গেও হয়তোবা, কিন্তু এর ভেতরে আমরা কতজন আমাদের সকল কথা, গান আর প্রাণ আর সুখ আর সাধ সত্ত্বেও অনুভব করে উঠেছি নিদারুণ এক বন্দিত্ব? এই বন্দিত্ব আর এ থেকে মুক্তির আকুলতা আমাদের কাছেই দেখিয়ে দেবার জন্যে দরকার ছিলো রবীন্দ্রনাথের। তিনি ভিন্ন আর কারো কাছে ধরা পড়ে নি যে,

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

ছন্দের দোলাটিও লক্ষ করি। এ কবিতার রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ তখনো ছন্দের ইন্দ্রজালের ভেতরে নবীন পথিক; তবু তখনি ছয় মাত্রার চালের ভেতরে তিনি যে বিস্ময়বোধ আর অস্থিরতা, আকুলতা আর কাতরতা ধরিয়ে দিতে পেরেছেন তা দৈবের বরে নয়, সচেতন কল্পনা-পরিশ্রমেই বটে। আমরা আরো দেখি ছন্দটিকে ভাবের কী সমান্তরালেই না ব্যবহার করেছেন। কবিতার প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি ছ'মাত্রার হয়েও অস্থির যে নয়, পর্ব থেকে পর্বে গড়িয়ে পড়বার জন্যে ব্যাকুল নয়– এটি যেন আমাদের চোখের সমুখে সেই স্বর্ণমণ্ডিত দৃশ্যেরই উদ্ঘাটনে বিস্ময়ের ধীর অভিভাব রচনা করছে ধ্বনিতে : উচ্চারণ করে পড়লেই বোঝা যাবে—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

আর এই পঙ্‌ক্তির পরেই লাগলো ঘূর্ণি, লাগলো দোল, জাগলো অস্থিরতা; একই ছন্দের ভেতরে থেকেও কবি আনলেন নতুন এক তাড়না :

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

অতঃপর আমাদের আর থামতে দেয় না; একই ছন্দ, কিন্তু চাল বদলে যায়, চলন বদলে যায়, নিরিখ পালটে যায় ভাবের তথা বলার কথাটি বলবার কৌশলের কারণে। ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এই যে প্রচলিত ছন্দকেই নতুন করে তোলা, এই যে শব্দগ্রন্থনের জাদুতে কল্পনার তাড়না সৃষ্টি করা, এ দৈব নয় কোনোক্রমেই কোনো অর্থেই।

ভাবের সঙ্গে ছন্দ মেলানো, প্রচলিত ছন্দকে নিজের খাপে বাঁকিয়ে নামানো, রবীন্দ্রনাথ এ কাজটি অনবরত করেছেন এবং আমাদের ইশারাও দিয়ে গেছেন সে সম্পর্কে। মনে করি সোনার তরী কবিতাটি। চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন :

ছিলাম তখন পদ্মা বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা।... ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

ছন্দে প্রকাশিত! সে কেমন ? কবিতাটির প্রথম স্তবকটাই দেখি সেই ছন্দটাকে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝে নিতে। হাতে নিয়েছেন তিনি বাঙালি কবির বহুব্যবহৃত চোদ্দ অক্ষরের পয়ার; একটু ভিন্নতা এনেছেন মাঝের পঙ্‌ক্তিটি আট আট অক্ষরে রেখে দিয়ে, আবার চোদ্দ অক্ষরের মাপে ফিরে গিয়ে— এবার পড়ে দেখি :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা,
ভরানদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

চোদ্দ অক্ষরের পয়ারই কি কানে ধরা পড়ছে ? মোটেই নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত পয়ারের চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের শেষ ছ'অক্ষরের একটি অক্ষর কমিয়ে যে জাদু সৃষ্টি করলেন, আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম, দেখতে পেলাম না-লেখা ওই একটি অক্ষরের অনুপস্থিতির ভেতরে দীর্ঘ প্রসারিত টান— যেনবা ওই ভরা পদ্মার বিস্তার— পাঁচ অক্ষরের হয়েও ছ' অক্ষরের অধিকই যেন আমাদের টেনে দিয়ে গেলো শেষ ওই আকারান্ত শব্দটি— বরষ— আআ, ভরস— আআ, পরশ— আআ! আর একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভরা পদ্মার সঙ্গে মিলিয়ে ছন্দে তাকে ধরা।

কবিতা তাহলে এ করেই আসে : দেখা ও দেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে ছন্দ সহযোগে। কবিতা এমন নয় যে, যে-কোনো কথাকেই যে-কোনো ছন্দে লেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথের শা-জাহান কবিতাকে, বা জীবনানন্দের বনলতা সেনকে লেখা যেতো না পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দে। আবার এই দুটি যে কবিতার কথা বললাম, দুটিই পয়ারে লেখা হলেও, এরা দু'জাতের; এই জাত ভিন্নতা হয়েছে ওই দুই কবির ভেতর-কথাটিরই ভিন্নতার কারণে। শা-জাহান এসেছে ভাঙা পয়ারে, প্রবহমান পয়ারও যাকে বলা যায়; আর বনলতা সেন এসেছে দীর্ঘ পয়ারের দীর্ঘ পাখা মেলে। শা-জাহান কবিতার স্তবকে স্তবকে সেই হাহাকার— ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া, তারপর অকস্মাৎ চাবুকের মতো প্রশ্ন— কে বলে রে ভোলো নাই ? আর, অন্তিম সেই উপলব্ধি— স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই, যা সম্রাটের আর নয়, হয়ে যায় আমাদেরই; কিছুই এ সকল সক্ষম পায়ে দাঁড়াতো না, আমাদের কাছে পৌঁছুতো না, যদি কবিতাটি লেখা হতো এমন ছন্দে :

জানতে তুমি ভারতভূমির ঈশ্বর শা-জাহান
কালের স্রোতে যায় ভেসে যায় জীবন এবং যৌবন ধনমান।
কেবল তোমার হৃদয়বেদন যেন
থাকুক চিরদিনের হয়ে, সম্রাটেরই সাধন ছিল হেন।
রাজক্ষমতা বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যার ওই রক্তরাগের মতোই যদি তন্দ্রাতলে হয় হয়ে যাক লীন
একটি শুধু দীর্ঘশ্বাস
নিত্য করুণ করে তুলুক আকাশ তোমার এইতো ছিল আশ।
মুক্তাহীরা মাণিক্যেরই ঘটা
শূন্য যেন দিগন্তেরই ইন্দ্রজাল আর ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি সে লুপ্ত হয়েই যাক,
কেবল থেকে যাক
একটি ফোঁটা তোমার অশ্রুজল
কালের ওই কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল—
এইযে তাজমহল।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেন কবিতা আমাদের পুনরুত্থান ঘটায়, সেটা যে-কোনো বলবার কথা যে-কোনো ছন্দে যে সম্ভব হবারই নয়, ওপরের ওই ছন্দান্তরেই তা পরিষ্কার। কোন্ ছন্দে যে সম্ভব হবে সেটাও একজন কবি জেনে যান তাঁর মণীষা-প্রতিভার আলোয়। শা-জাহান কবিতাটির জন্যে রবীন্দ্রনাথ নির্ণয় করে নেন পয়ারেরই ছাঁদ; কিন্তু ঠিক বাঁধি পয়ারও নয়— চোদ্দ কি আঠারো অক্ষরের— পয়ারকে তিনি করে তোলেন প্রবহমান; এর পর্বগুলো কমিয়ে বাড়িয়ে, চরণে চরণে মিল দিয়ে, একই সঙ্গে স্থিরতা ও অস্থিরতার তান লাগিয়ে তিনি নিয়ে আসেন এ কবিতায় অতীত ও

সর্বকালের এক স্বর্গীয় বিস্তার। একসময় তাঁর এ ছন্দকে বলাই হতো বলাকার ছন্দ। প্রচলিত পয়ারের সঙ্গে একে মেলানো যাবে না, বলা যাবে না— কেবল মাপের ছোটবড়র জন্যেই এর চমৎকারিত্ব; বরং এ পয়ার রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত ও নিজস্ব; আর, এটা তাঁকে করতে হয়েছে, আবারও বলি, তাঁর বিশেষ বলবার কথাটির বিশেষ সুর-তাল-ধ্বনি করোটিতে শুনে। এখানেই কবিতার কিমিয়া— কথা ও ছন্দের রসায়ন। এ বিনা লেখাই যায় না কবিতা।

জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন : কিমিয়ার সন্ধানে

কবিতার কিমিয়া যে কী— কতটাই সে আশ্চর্য এবং ব্যাখ্যার অতীত— একটা কবিতা নিয়ে বুঝে দেখি; একটি খুব চেনা কবিতা হাতে নিই— অনেকেরই কণ্ঠস্থ, তবু একবার আদ্যোপান্ত পড়ে দেখি, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে;
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্তপ্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন,
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কবিতাটি যখন আমরা শুনি, অথবা মনে মনে আওড়াই, তখন কি একবারও আমাদের মনে হয়— *হাঁটিতেছি* কথাটা সমুদ্রের সঙ্গে কীই না অসঙ্গত! হাজার বছর ধরে আমি জল ভ্রমিতেছি পৃথিবীর বুকে— কেন নয় ? কেন হলো 'হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' যখন তার পরেপরেই আসছে সমুদ্রের কথা ? জল ভ্রমিতেছি, জল ভাঙিতেছি— এমনটা লেখাই তো 'স্বাভাবিক' ছিলো! কবি তা লেখেন নি আর আমরাও অবলীলায় ওই গৃহস্থ-সুলভ সদ্‌যুক্তি ও স্বাভাবিকতাটি উপেক্ষাই করে অগ্রসর হই। কবিতার কিমিয়া এভাবেই আমাদের গার্হস্থ্য অভ্যস্ত মনটিকে নাড়িয়ে দেয়, ভেঙে দেয় আমাদের সকল 'স্বাভাবিকতা', শব্দের সকল প্রত্যাশিততা, এবং উড্ডীন করিয়ে দেয় অনুভবের নীলিমায়।

তাই, বনলতা সেন কবিতাটি শেষ করে উঠেও আমরা স্পষ্ট বুঝি না যে, প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যে দুটি সমুদ্রের কথা সাক্ষাত বলা ছিলো, ওরই পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে এসে যে সমুদ্রের উল্লেখও ছিলো সফেন-আকারে— আসলে সে-সকল সমুদ্রই নয়। জীবন! হ্যাঁ, জীবনই এ কবিতার প্রথম স্তবকে সমুদ্রের প্রতীক ধরে এসেছে। প্রতীক— কবিতায় সরাসরি নয়, প্রকাশ্য কখনোই নয়, প্রচ্ছন্ন থাকলেই তবে সে হয় কুশলী। জীবনানন্দের কবিতায় বলা ওইসব সমুদ্র যে জীবনের প্রতীক, তার সংকেত পাই যখন তিনি বলেন, 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' আমরা অনুভব করে উঠি— সিংহল সমুদ্র বা মালয় সাগর নয়, তিনি— বলা ভালো এই কবিতায় 'আমি' ব্যক্তিটি— আসলে ভ্রমণ করে এসেছেন জীবন। অনুভব করি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝি না। এলিয়টের সেই কথা : কবিতা বোঝার আগেই হয় অনুভূত!

লক্ষ করি, এ কবিতায় বিশেষণ প্রায় নেই বললেই চলে। ধূসর, ক্লান্তপ্রাণ— মাত্রই দুটি ব্যাকরণ-সম্মত বিশেষণ পদ; তাও কবিতার শরীরে তাদের স্থাপন যেন বিশেষ্যর মতোই আমি দেখতে পাই। কিন্তু একটি বড় বিশেষণ আছে— একটিই সে বিশেষণ; এবং এই বিশেষণটি একটিমাত্র শব্দে তো নয়; আসলে, পুরো কবিতাটিই বনলতা সেন নামক নারীটির বিশেষণ। আসলে, আমাদের সকল লেখাই কিছু না কিছুকে বিশেষিত করাই শেষ পর্যন্ত; এবং তাই অনিবার্যভাবেই সাহিত্যে নিবারণযোগ্য একটি দিক হচ্ছে বিশেষণের বাহুল্য। পারতপক্ষে বিশেষণ ব্যবহার না করা। বিশেষিত করবার জন্যেই তো লেখা!

কম্পিউটারের কল্যাণে আজকাল কতরকম হিসেব মুহূর্তে করে ফেলবার সুবিধে হয়েছে। এই সুবিধে নিয়েই আমেরিকার দুই কবি জন সিয়ার্দি আর মিলার উইলিয়ামস শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট নাটকটির শব্দ হিসেব করে নাকি দেখতে পেয়েছিলেন— প্রতি দুটি বিশেষ্য পদের বিপরীতে আছে একটি ক্রিয়াপদ, আর সাতাশটি বিশেষ্য পদের বিপরীতে আছে বিশেষণ একটি মাত্র। কতদূর এটা সত্যি বলবার সাধ্য নেই আমার, তবে বাংলা কবিতা যতটুকই পড়েছি, দেখেছি— বিশেষণ পদ কী যত্নেই না এড়িয়ে গেছেন কবির পর কবি— কবিতার পর কবিতায়। বিশেষণ

তো এড়িয়ে চলতেই হবে সাধ্যমতো, বিশেষণকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করে নেয়াটা একেবারেই চলবে না— নিতম্ব আছে বলেই নারীকে নিতম্বিনী বলা শীলতাই শুধু ক্ষুণ্ন করে না, ভাষাকেও হত্যা করে। বুদ্ধদেব বসু বলেন, ভাষার এই রকম স্বাধীনতা থাকলে শব্দের প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। এরই জের টেনে বুদ্ধদেব বলেন, *আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও ঈষদচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না; তিনি চান শব্দ হবে উপায় কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের।* টি এস এলিয়ট আরো খানিক এগিয়ে বলছেন, *শব্দগুলো কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পাশাপাশি বসে একে অপরের ওপর প্রতিফলিত হয়, তাতেই একটি নতুন অর্থ বেরিয়ে আসে।* আমাদের হাতের কবিতা বনলতা সেন থেকে 'শিশিরের শব্দ' বা 'রৌদ্রের গন্ধ' দেখলেই শব্দের এই পারস্পরিক প্রতিফলন ও নতুন একটি বিকীরণ আমরা পরিষ্কার দেখে উঠবো।

এই বিকীরণ, বিশেষণের ওই বর্জন, মনে রেখে, এখন তাকানো যেতে পারে বনলতা সেনের দিকে। পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে, স্তবকে স্তবকে, আঠারোটি চরণে যে কবিতাটি গড়ে উঠলো— দেখতে পাই, তার পুরোটাই একটি বিশেষণ!— এবং এটি বিশেষিত করছে বনলতা সেনকেই। বিশেষণের কাজই হচ্ছে : গদ্যে— শব্দকে বিশেষিত করা; কবিতায়— একটি ভাবকে বিশেষিত করা। আসলে, কবিতার কাজই হচ্ছে আমাদের একটি কোনো বিশেষ বোধকে বিশেষিত করা। অধিকাংশ কবিতায় এটি পর্বে পর্বে, স্তবকে স্তবকে সাধিত হয়। বনলতা সেন কবিতায় পুরো কবিতাটিই হয়ে ওঠে একটি মাত্র বিশেষ-করণ— বিশেষণ— বনলতা সেনের। কবিতাটি নিবিড়ভাবে শুনলেই বুঝে যাবো, কতদিন ও কত দূর ও সুদূর— বস্তুত কতই না নারী, কতই না প্রেম পরিক্রম করে এসে, সমুদ্র তথা জীবন ঠেলে, বিদিশার নিশার মতো, বিদর্ভের নিস্প্রদীপতার মতো অন্ধকারে এসে পৌঁছুতে হয় আর তখনই পাওয়া যায় 'মুখোমুখি বসিবার' বনলতা সেন তথা এই ক্লান্তপ্রাণ ভ্রমণকারীর একমাত্র অনিষ্ট নারীকে। তাও, শুধুই, 'মুখোমুখি বসিবার'; কিন্তু এ 'বসিবার'ও নয় শুধুই বসে থাকা— বরং কাছে আসা, ফিরে আসা, স্থিত হওয়া, নীড়ে ফেরা— কারণ, 'সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী', জীবনেরও লেনদেন হয় অবসিত— সেও তো ব্যবসায়িক অর্থে নয়, দেবার ও নেবার, হৃদয়ের কাছ থেকে হৃদয়েরই; এই হৃদয়টিরই সমুখে 'বসিবার' সময় হলো এত দীর্ঘ এত খিন্ন এত শ্রমী ভ্রমণের পর। স্থিত হলো কবিতার সেই 'আমি'— না, সেই 'আমি'ও নয়, আমরাই; আমরা পুনরুত্থিত হলাম আমাদেরই প্রশান্ত বোধিতে— যেনবা নির্বাণই ঘটলো বৌদ্ধিক পুরাণে যেমনটি বলা আছে।

আর, দেখি এর ছন্দটিকেই। পয়ারেই সে বাঁধা— বাইশ মাত্রার— প্রথম স্তবকের ছ'টি পঙ্‌ক্তিতেই। দ্বিতীয় স্তবকে মাপের কিছু হেরফের পাই— কখনো চোদ্দ, কখনো

আঠারো, কখনো বা ছাব্বিশ। তৃতীয় তথা শেষ স্তবকেও তাই— কেবল চোদ্দ মাত্রার পঙ্‌ক্তিই আর লেখা হয় নি। কেন যে কবিতাটির প্রথম স্তবকের সবগুলো পঙ্‌ক্তিই এক মাপের— অনুমান করি তার কারণ : এটি কবিতার প্রস্তাবনা, সংক্ষিপ্তসার, এমনকি উপসংহারও বটে— একই সঙ্গে; তাই একে নিটোল ও ভগ্নরহিত একটি রূপ দেবার দরকার হয়েছিলো। দু'দণ্ড শান্তি দেবার কথা স্তবকটির শেষ পঙ্‌ক্তিতে বলে ফেলবার পর আর বাকি থাকে কী! থাকে, বনলতা সেনকে বিশেষিত করবার কাজটিই যে পড়ে থাকে; অতঃপর তারই কেবল নির্মাণ— 'চুল তার' থেকে শেষ স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তির 'মুখোমুখি বসিবার' পর্যন্ত।

পয়ার একটা বাঁধা ছন্দ, পর্বের সংখ্যা কম বেশি যাই হোক— পয়ারই সে। কিন্তু জীবনানন্দের পয়ার— তাঁর সিলমোহর অঙ্কিত এ পয়ার— ধীর, যতিসমেত ক্রমান্বিত, ক্রমে উচ্চারিত, যুক্তাক্ষর প্রায় বর্জিত ও বিরল ব্যবহৃত— যা জীবনানন্দের পয়ারের এক ধ্বনি-সঙ্গীত-নিজস্বতা বলে এখন আমরা সনাক্ত করতে পারি। কিন্তু তবু, এই পয়ারের ভেতরেই যেন শুনতে পাই তাঁরই বহু পূর্ববর্তী এক কবির ধ্বনি-সঙ্গীত। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। স্মরণ করি মাইকেলের সেই কবিতা, তার থেকে চারটি পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দের অনুকরণে দু'পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে ফেলে দেখে শুনি :

মাইকেলের :

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়, তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে ধায়, ফিরাব কেমনে?

আর, জীবনানন্দের :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে;

স্বর ও ধ্বনি-সঙ্গীত, উচ্চারণে যতিপাত, এবং দীর্ঘশ্বাস— অবিকল মনে হয় আমার। অধিক এও তো দেখি, মাইকেলের সিন্ধু আর জীবনানন্দের সমুদ্র ও সাগর— একই জলবিস্তারের কথা। কবিতার এও এক কিমিয়া। বনলতা সেন পড়বার সময় মাইকেল আমাদের স্মরণে না থাকলেও, ওই কালসিন্ধু কোথাও না কোথাও আমরা বহন করে চলেছি— সেই সিন্ধুটিই যেন শ্বসিয়ে ওঠে, সফেন হয়ে ওঠে বনলতা সেনের ভেতরে।

আমরা জীবনানন্দের বনলতা সেনে অনেক উল্লেখ পাই যা আমাদের অভিজ্ঞতা, পড়াশোনা এবং দেখার বাইরে। যেমন, সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর— এ না হয় মানচিত্রে পেয়েছি বা কল্পনা করে নিতে পারি তাদের ভেতরে দারুচিনি দ্বীপটিকেও, কিন্তু বিম্বিসার, অশোক, বিদর্ভ, শ্রাবস্তী?— ক'জনাই বা ইতিহাস উলটে এদের সংবাদ নিয়েছি? কতটুকুই বা জেনেছি? আসলে, জানবার প্রয়োজনও পড়ে না; জানি যে না!— তাও আমাদের খিন্ন করে না এতটুকু! আমরা বরং ওইসবের ধ্বনি ও

দুর্বোধ্যতা-অস্পষ্টতা ও দূরত্ব দ্বারাই স্পৃষ্ট হই— এই স্পৃষ্টকরণই ছিলো কবির অভিপ্রেত; দূরত্বটিও তিনি বাস্তব মানচিত্রের দূরত্ব দেখিয়ে নয়, সৃষ্টি করেন ধ্বনি-সঙ্গীতে।

এটি বিশেষ করে লক্ষ করবো 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এই পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করলেই, যে, কীভাবে ক্রমাগত আ-ধ্বনি— তার— কবেকার— অন্ধকার— বিদিশার— আমাদের ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছে দূর থেকে আরো দূরে। এবং ওই দূরত্ব থেকে ক্রমেই কাছে নিয়ে আসবার, আমাদেরই কালে ফিরিয়ে আনবার কাজটিও জীবনানন্দ করেছেন শেষ স্তবকে এ-ধ্বনি লাগিয়ে, এ-কারযুক্ত শব্দ একের পর এক বসিয়ে : দিনের— শেষে— শিশিরের— শব্দের— রৌদ্রের— মুছে ফেলে— নিভে গেলে— গল্পের তরে— ঘরে আসে— জীবনের— লেনদেন। এ-কারযুক্ত শব্দ প্রথম দুটি স্তবকেও আছে, কিন্তু শেষ স্তবকের মতো সুর তাতে লাগে নি; এ যেন একটি সঙ্গীতকে শমে আনবার জন্যেই এবার এ-কার ধ্বনির ব্যবহার; আর এটি আমরা আবিষ্কার করতে পারবো স্তবকটি যখন উচ্চারণ করে পড়বো, দেখতে পাবো এবার আমরা এ-কারগুলো একটু টেনে পড়ছি আগের স্তবক দুটির এ-কারের তুলনায়।

কবিতার এও এক কিমিয়া— ধ্বনির ভেতর দিয়ে দূরে পাঠানো বা কাছে টানা। আ-ধ্বনি যে দূরে পাঠায়, এ-ধ্বনি যে কাছে টানে— খবরটা ধরতে পারবো ওস্তাদের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনলেই; তেমন একটা আসরে বসে, কানের প্রমাণে নাই যদি ধরতে পারি, চোখের প্রমাণেই দেখতে পাবো ওস্তাদ যখন সুরবিস্তার করছেন তখন কীভাবে তাঁর হাতটি সুরের ভাও বাৎলাচ্ছে— আ-ধ্বনিতে তিনি হাতটি তুলে ধরে দূরে পাঠাবার ভঙ্গি করছেন, এ-ধ্বনিতে গুটিয়ে আনছেন সেই হাতটিকেই কোলের কাছে, নিজের কাছে।

কিন্তু এ সকল তো জানবার দরকার নেই, দরকার পড়েও না। ঘড়ির ভেতরে যন্ত্রের কারিগরি না জেনেও আমরা ঘড়ি ব্যবহার করি দিব্যই, সঠিক সময়টা চাই ঘড়ির কাছে, তা পেলেই খুশি। কবিতাও তাই, তার ভেতরের করণটা থাকে ঘড়ির মতোই ঢাকনার তলায়— কাঁটা দেখায় সময়, কবিতা দেখায় স্বর-সুর-ধ্বনি সমেত একটা অনুভব। তবে, কবিকে, কবিযশোপ্রার্থীকে জানতেই হয় ভেতরের ওই করণ; আর তা জানবার একমাত্র উপায় কবিতা কেবল পড়া নয়, শোনা নয়— সে তো আছেই, তারচেয়ে অধিক, কবিতার হাড়মাংস জোড়জাড় খুলে দেখা। মাত্র একটি কি দু'টি কবিতার দিকে এমন চেয়ে দেখাটাও প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট হতে পারে। বাংলা কবিতার ভেতরে রবীন্দ্রনাথের শা-জাহান আর জীবনানন্দের বনলতা সেন, অন্তত এ দুটি তো পারেই।

পেছনে তাকিয়ে দেখি সে কত আগের কথা, কুড়িগ্রামে আমাদের সেই বাঁশবাতার দেয়ালঘেরা টিন-ছাদের বাড়িটিতে আমার নিজ ও তুতো-ভাইবোনদের বিশাল দঙ্গলে আমিই ছিলাম একমাত্র শিশু যে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে ভারী একটা কোলাহল বাধিয়ে দিতাম; মনের মধ্যে ঝংকৃত শব্দের রঙিণ মেলা চলতো সারাদিন; ছন্দের অবিরাম উঠন-পড়নে মাথার ভেতরে ঘোর লেগে যেতো; কখনো কখনো কারো রচনা নয়, অর্থবহ সুসম্বদ্ধ কিছু নয়, কেবল কতগুলো শব্দধ্বনি আমি আবৃত্তি করে যেতাম; গুরুজন সকলেই আমাকে ছিটেল মনে করলেও একমাত্র আমার বড়খালা, একাধারে যিনি আমার মায়ের বড় বোন ও বাবার বড়ভাইয়ের স্ত্রী, একমাত্র তিনিই আমার ওই ধ্বনিসৃষ্টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গভীর মনোযোগে শুনতেন ও আমার মা-কে বলতেন, 'একে একটু বেশি করে দুধভাত দিও।' হায়, এখন তিনি পরলোকে; এখনো যখন আমার কোনো লেখা আমার নিজেরই মনে হয় কিছু একটা হয়েছে, আমার মনে পড়ে যায় স্নেহপ্রবণ ওই নারীটির কথা: আমি বালক হয়ে যাই, আমার হৃদয় ভেঙে ও ভেসে যায়।

কিশোর বয়সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে কবিতাটি আমি আবৃত্তি করেছিলাম, আমার জীবনের দ্বিতীয় আবৃত্তি, সে ছিলো রবীন্দ্রনাথের *শা-জাহান*— সবটাই, এবং স্মৃতি থেকে; জনসমক্ষে আমার আবৃত্তির প্রথম কবিতাটি ছিলো রবীন্দ্রনাথেরই লেখা *দুই পাখি*। আমার সেই উষাকালে, আবৃত্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পরপর দু'দুবার বেছে নেয়া, রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি এবং আরো কয়েকটি কবিতা— *পুরাতন ভৃত্য, তালগাছ, বীরপুরুষ, প্রার্থনা, পরশপাথর* সেই ছেলেবেলাতেই বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ মুখস্ত করে ফেলা— আকস্মিক ঘটনা ছিলো না, রবীন্দ্রনাথের বিপুল খ্যাতিও কোনো কারণ ছিলো না; একটিই কারণ, আজ নির্ণয় করি; কবিতার গভীর কিছু না বুঝেও এই কবির ছন্দের দোল ও উচ্চারণে মন্ত্রতুল্য শক্তির জন্ম আমি ওই বালক বয়সেই হয়তো রক্তের ভেতরে অনুভব করে উঠতাম।

আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা-মন্ত্র রচনা আজো আমাদের ভাষায় সর্বোচ্চ এবং এখন পর্যন্ত অলংঘিত এক কীর্তি। এ কারণেই যৌবনে যখন শুনি এলিয়ট বলছেন— *বোঝার আগেই কবিতা আমাদের কাছে পৌঁছে যায়,* তখন সঙ্গে সঙ্গেই তা সত্য বলে সনাক্ত করে উঠতে পারি। এখন এতটা দিন উজিয়ে এসে আমি জানি, কবিতা রচনা মন্ত্র-রচনাই বটে।

কুড়িগ্রামেই কিশোর বয়সে একদিন অকস্মাৎ আমি রচনা করে বসি দুটি পদ্য, যার একটির বিষয় ছিলো তাজমহল; তাজমহল তখন পর্যন্ত চোখে দেখি নি, আবছা কেবল জানা ছিলো যে মোগল সম্রাট শা-জাহান তাঁর মৃত মহিষীর স্মৃতি ধরে রাখতে এই সৌধটি গড়েছিলেন:— আমার সেই আদি পদ্যপ্রয়াসে সেটাই ছিলো বলবার

বিষয়। আমাদের শোবার ঘরে তাজমহলের বাঁধানো রঙিন ছবি ছিল; বাবা হয়তো তাঁর কোনো এক কলকাতা-সফরে এটি সংগ্রহ করে থাকবেন পত্নীপ্রেমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে; কিন্তু সাংসারিক কোনো লঘু ত্রুটির কারণে মা যখন বাবার হাতে গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত হতেন, স্মরণ হয়, তিনি বিরলে বসে অগ্নিসম অশ্রু বর্ষণ করতে করতে বলতেন, 'মরার পরে সকলেই তাজমহল তুলতে পারে, তাজমহল না ছাই!' মন্তব্যটি আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায়; তাজমহল নিয়ে পদ্য লিখতে গিয়ে মায়ের ওই মন্তব্যটি কবিতার বক্তব্য হিসেবে উপস্থিত করতে পারলে 'বালক-প্রতিভা' হিসেবে নিশ্চয়ই আজ আমি নিজেরই পিঠ নিজে চাপড়ে দিতে পারতাম।

কিন্তু, আমার মায়ের— তার মানেই এক ব্যক্তির— একটি অনুভবকে কবিতার বিষয় বলে যে আদৌ আমি ভাবতে পারি নি, বরং মোগল সম্রাটের প্রেমের কথাই বাঁধিগতে বলতে উৎসাহ বোধ করেছি, এতেই এখন বুঝে নিই যে রচনাকালে আমরা কতখানি শাসিত হই প্রচল দ্বারা; কীভাবেই না আমরা প্রচলিত বিষয় অবলম্বন করি; এর কয়েকটি উদাহরণ— বিষয়ে– নরনারীর প্রেম, দেশপ্রেম, গণমানুষের সংগ্রামীচেতনা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং আঙ্গিকে— তিরিশের কবিদের কৃতি, ইয়োরোপীয় উপন্যাস-কথকতার চলন, হালে লাতিন আমেরিকার তথাকথিত যাদুবাস্তবতা। এমত কতশত প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রচলের ভেতরেই না আমাদের কলম চলছে; এবং এই প্রচল-দাসত্ব থেকে সর্বাংশে বা সর্বসময়ে মুক্ত নন প্রতিষ্ঠিত আমাদের অনেক কবি-লেখকই। কিন্তু প্রচলিত বিষয়ও যে নতুন কোনো বক্তব্যের জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে, এটা হয় ক'জনার হাতে ?

রবীন্দ্রনাথের *শা-জাহান* কবিতাটি এবার পড়ে দেখি। মনে হতেই পারে, শা-জাহান ও তাজমহলকে বিষয় করে কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি বুঝি প্রচল থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু না, একটু খোঁজ নিলেই আমরা দেখতে পাবো, বিষয় হিসেবে তাজমহল আজ যতই ক্লিশে হোক, রবীন্দ্রনাথের আগে তাজমহল বা তার স্রষ্টা শা-জাহানকে কবিতায় বা ভাষার অন্য কোনো মাধ্যমে আর কোনো কবি বাংলাভাষায় ব্যবহার করেন নি; এবং বিস্মিত হয়ে লক্ষ করবো, শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতার বিষয়ও কিন্তু তাজমহল বা শা-জাহান নয়, একেবারেই অন্যকিছু— ব্যক্তির অস্তিত্ব, জীবনমৃত্যুচক্র, স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা প্রসঙ্গিকতা এবং কালবোধ।

রবীন্দ্রনাথের শতসহস্র রচনার কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, তাঁর এই একটি কবিতাই— *শা-জাহান*— হতে পারে একজন নবিশের জন্যে রচনা প্রক্রিয়া ও কৌশল শিক্ষার স্থল; কারণ এই কবিতাটি আমার বিচারে বাংলাভাষার— এমনকি যেকোনো ভাষার মহত্তম একটি কবিতা;— কী বিষয়, কী আঙ্গিক, কী যুক্তি উপস্থাপনায়। আমরা এর মহত্তম হয়ে ওঠার কারণগুলো আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি এখন; পড়ে দেখি এ কবিতার প্রথম স্তবক পর্যন্ত :

এ-কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।

শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগ-সম দন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

শুধু এই প্রথম স্তবকটিই যদি রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, তাহলেই এবং তাহলেও এটুকুই হতে পারতো সম্পূর্ণ একটি কবিতা— তৃপ্তিকর, বক্তব্যে নিটোল এবং আবেগস্পর্শী; এর অতিরিক্ত কিছু চাইবার আমাদের থাকতো না; কবিতা হয়ে ওঠার জন্যে এই এক স্তবকের অধিকও আর দরকার হতো না। কিন্তু এ হতো সাধারণ একটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ কেন— আমরাই এ অবধি লিখে ফেলতে পারতাম, তৃপ্তি পেতাম একটি কবিতার রচনা শেষ করে উঠবার।

কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ; তিনি আরো একটু অগ্রসর হন; কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এক বিন্দু নয়নের জল রূপে তাজমহলকে দেখে উঠে তিনি আরো বলবার প্রেরণা পান— না, প্রথম স্তবকের সম্প্রসারণ হিসেবে নয়, ভাবের নতুন একটি পর্যায় উপস্থিত করে, অন্তরবেদনাকে চিরন্তন করবার যে সাধনা ওই সম্রাটের, তাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করে অতঃপর তিনি লিখে চলেন :

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই-নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে

বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

এবং আর একবার শা-জাহানের দিকে দৃষ্টিপাত করে :

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

পাষাণ যদি প্রশান্ত ওই তাজমহলেরই সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে, তবে তার অভিপ্রায় তো এই, রবীন্দ্রনাথ বলেন :

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

এই প্রথম একটি বাণীর মুখোমুখি হই আমরা— ভুলি নাই: কিন্তু এটিও তো প্রত্যাশিত— তাজমহল তো সম্রাটেরই 'ভুলি নাই' অনুভবটিরই বড় প্রত্যক্ষ এক দৃশ্যরূপ, বাণীরূপ; আর এ পর্যন্তই যদি কবিতাটি হতো, আমরা একে মহৎ কবিতা বলে উঠতাম; কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই ভেতরে শ্বসিয়ে তুলতে পেরেছেন আমাদেরই চিরন্তন ওই আর্তি যে, আমরাও আমাদের প্রেমিকাকে ভুলি নাই; আমাদের সেই না-ভোলার আর্তি আর তাজমহল হয়ে যেতো এক ও অভিন্ন; তাজমহল হয়ে উঠতো আমাদেরই মনোস্থাপনা; এভাবেই এ পর্যন্ত সমাপ্ত কবিতাটি হয়ে উঠতো মহৎ। কিন্তু তিনি, রবীন্দ্রনাথ, এখানেও থামেন না, ভুলি নাইকে সম্প্রসারিত করে চলেন পরের স্তবকে, আমরা দেখবো, বিশেষ একটি অভিপ্রায় ধরে :

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ—
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল

তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধুলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান।
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

অভিপ্রায়টি আমরা এখুনি ধরতে পারবো না, আমরা বুঝতেই পারবো না কেন এই সম্প্রসারণ ওই ভুলি নাই-এর। আমাদের মনে হতেই পারে, অবশ্যই এ পর্যন্ত এসে এটাই তো মনে হবে যে, দরকার ছিলো না এই সম্প্রসারণের; আরো একবার ভুলি নাই ভুলি নাই যেন চিৎকারেই হলো পর্যবসিত, যেনবা চিৎকারের কারণেই পতিত হয়ে গেলো কবিতটি; আগে যে আগের স্তবকে এসে আমরা বলে উঠেছিলাম— এই তো মহৎ এক কবিতা, সেই বিস্ময়কে আমরা যেন ক্ষুণ্ণই হতে দেখলাম; এ পর্যন্ত এসে ও থেমে ও ইতি টেনে আমরা অবাকই হলাম— কেন এত বড় একজন কবি এই প্যাচপেচে আবেগের ভেতরে টেনে নামিয়ে কবিতাটি শেষ করলেন। পরের দীর্ঘ স্তবকটি পড়ে ফেলা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে; এমনকি পরের স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করা মাত্র আমরা চমকে উঠবো; যেনবা ওই যে ভাববিহ্বলতা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিরুক্ত ভুলি নাই ভুলি নাই দিয়ে, এবার পরের ও কবিতাটির শেষ স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আমরা একটা চড় খাবো, *মিথ্যা কথা— কে বলে রে ভোল নাই?* তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবো এই চড়টি দেবার জন্যেই তাঁর ওই বারবার ভুলি নাই লেখা; এই ধাক্কাটি দেবার জন্যেই ও দেবার ফলেই এবার কবিতাটি হয়ে উঠবে বাংলাভাষারই কেবল নয়, পৃথিবীর একটি মহত্তম কবিতা; তাজমহলের মতো প্রচলিত বিষয় অবলম্বন করেও এবং করেই রবীন্দ্রনাথ এক অভাবিত স্মৃতিব্যাখ্যায় আমাদের উত্তীর্ণ করবেন। কবিতাটির শেষ স্তবক এবার পড়া যাক শেষ পর্যন্ত :

মিথ্যা কথা— কে বলে রে ভোল নাই ?
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?
অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির ?
সমাধিমন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে!
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজসিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে—
দিয়েছ তা ধুলিরে ফিরায়ে।

সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে,
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠিছে অম্বর-পানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দূর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

মহত্তম যে এই কবিতা, তার একটি লোক-প্রমাণ এই যে, এই শেষ স্তবকের কত পঙ্‌ক্তিই না এখন আমাদের কাছে প্রবাদ ও প্রবচনতুল্য : *জীবনেরে কে রাখিতে পারে / আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।* এবং *তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ* এবং *যে প্রেম সম্মুখপানে / চলিতে চালাতে নাহি জানে* এবং *প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ* এবং *স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি / ভারমুক্ত সে এখানে নাই।* আর, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করবো কবিতাটি শেষ হচ্ছে শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির প্রথমটির সঙ্গে আর কোনো পঙ্‌ক্তির মিল রচনা নেই দেখে; সমগ্র কবিতায় একেবারেই নিরবলম্ব ও মিলহীন পঙ্‌ক্তি *স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি* আমাদের মনে বাজিয়ে দিয়ে যায় শেষ ঘণ্টা; আমরা শা-জাহান আর তাজমহলের ভেতরে জীবনের একটি মৌলিক ক্রিয়া— স্মৃতিরক্ষা; মানুষের ও ইতিহাসের একটি সাধ ও স্বাক্ষর— স্মৃতি-স্থাপত্য— আজ আমাদেরই শহীদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ— এ সবের প্রতি নতুন একটি দৃষ্টি অর্জন করে উঠি।

কবিতায় প্রতীক হবে কতখানি স্পষ্ট

সেদিন ঘরবদল করবার সময়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো আমার প্রথম যৌবনে পড়া একটি বই। তিরিশের দশকের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেন্ডারের প্রবন্ধ আছে সে বইয়ে— *দ্য মেকিং অব আ পোয়েম*। তাকিয়ে রইলাম সেই প্রবন্ধের বেশ কিছু অংশে আমার দেয়া লাল দাগ ও সেকালে আমার সেই স্পষ্ট হস্তাক্ষরে— হায়, এখন যা অবনত ও প্রায় দুষ্পাঠ্য— মার্জিনে কিছু মন্তব্য; অনুভব করে উঠলাম অতীতের সেই আমাকেই যেন আমি কবি যশোপ্রার্থী, নিতান্তই নবিশ।

স্টিফেন স্পেন্ডারের পুরনো সেই প্রবন্ধটি আজ সকালে আবার পড়ে দেখলাম কবিতা তাঁর কাছে কেমন করে আসে ও হয়। তিনি লিখছেন, *যদি একটি কবিতা লিখতে শুরু করি তো আছে অন্তত দশটি কবিতা যাদের নিয়ে ভেবেছি কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে নি। যদি একটি কবিতা লিখেছি তো সাত কি আটটি কবিতা শুরু করেও শেষ করতে পারি নি।*

এই তথ্যটি দেবার আগে স্পেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিয়েছিলেন : *একজন কবির হয়তো আছে স্বর্গজাত প্রতিভা, আয়ত্বে আছে তার চমৎকার স্বচ্ছন্দ কলম এবং আছে লক্ষ্য নির্ণয় করবার মতো উন্নত বুদ্ধি; তিনি রচনা প্রক্রিয়ায় মন্থর ও অপ্রতিভ হতে পারেন, তাতে কিছু এসে যায় না; একমাত্র যা দেখতে হবে— আছে কি তাঁর রচনার কারণের প্রতি বিশ্বাস? এবং সেই বিশ্বাসটিকে তিনি কি ধরে রাখতে পারছেন প্রেরণার তোড়ে ভেসে না গিয়ে?* এই কথাটাই বুঝে দেখতে গিয়ে স্টিফেন স্পেন্ডার তাঁর নিজেরই একটি কবিতার জন্ম প্রক্রিয়া অতঃপর বলেছেন।

একদা তিনি এক রোদউজ্জ্বল দিনে দেখেছিলেন সাগর। সাগরের পাড়ে এগিয়ে এসেছে পাহাড়ের ঢাল; ঢালের উঁচুতে আছে ঝোপঝাড়, মাঠ, বাড়িঘর; সরু রাস্তা দিয়ে ঘোড়া টানছে গাড়ি, দূরে ডাকছে কুকুর, ঘণ্টা বাজছে আরো দূরে কোথাও। গ্রীষ্মের চমৎকার এই রোদভরা দিনটিতে সাগরে যখন প্রতিফলিত ও আত্মীকৃত হয়ে আছে তীরের সমস্ত কিছু, স্পেন্ডারের তখন মনে হচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রোদের রেখাগুলো যেন উজ্জ্বল তার— যেনবা বিশাল এক বীণারই টানটান তার, তারগুলো রোদে ঝলসে উঠেছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে আছে তীরভূমি; জলকে স্থল বলে ভুল করে ঢেউয়ের ওপর ওড়াউড়ি করছে প্রজাপতি, যেন সন্ধান করছে জলের ওপরে ফুল। স্পেন্ডার ভাবছেন, এ হচ্ছে এমন একটি ছবি যখন পৃথিবী প্রবেশ করেছে সাগরে, আর, বীণার ওই তারগুলো যেন দৃশ্যমান এক সঙ্গীত যার মূর্চ্ছনায় মাটি আর জল মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

এই দৃশ্যটিই কি কারণ হতে পারে একটি কবিতা লিখে ফেলার? এমন তো কত আশ্চর্য ছবি আমরা দেখি— কবিতার বিষয় কি হতে পারে তারা? কিংবা কখন তারা হয় কবিতার বিষয়, কবিতার কারণ?

স্পেন্ডারের চোখ দিয়ে আরেকবার দেখা যাক রোদ ঝলসানো সাগরে স্থল প্রতিফলিত ছবিটি। এখনো তিনি কবিতার কথা মোটেই ভাবছেন না, কিন্তু অচিরেই কবিতার নিঃশ্বাস তিনি সর্বাঙ্গে অনুভব করে উঠবেন যখন এই ছবিটি হয়ে উঠবে তাঁর কল্পনার রসায়নে একটি প্রতীক; আর, এটাই হয় অন্য মানুষের তুলনায় কবির একটি অতিরিক্ত বিশেষ বুদ্ধি, জীবনানন্দের ভাষায় কল্পনাপ্রতিভা, যা আমাদের জপানো হয়ে থাকে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা বা কাব্যি করা বলে।

স্পেন্ডার দেখতে পেলেন— সাগর হচ্ছে মৃত্যু আর চিরন্তনতার প্রতীক, মাটি মানব জীবনের প্রতীক, একদিন ক্ষণস্থায়ী এই মানবজীবন মিশে যাবে চিরন্তনতার সাগরে। এই কথা মনে হওয়া মাত্র, স্পেন্ডার আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন কড়া গলায়, প্রতীক-ট্রতীক ঠিকই আছে, কবির কাজ হচ্ছে ঠিক এইটিকেই অর্থাৎ প্রতীকটি যতই লোভনীয় মনে হোক সেটি কবিতা থেকে একেবারে দূরে রাখা। প্রতীক নিয়ে আপ্লুত হওয়া কবির কাজ নয়। তিনি বলছেন, কবির কাজ হচ্ছে ছবিটিকে শব্দের শরীরে ধরা, উচ্চারণের মাধ্যমে ছবিটিকে তৈরি করা এবং যে কবিতাটি লেখা হবে তাকেই দায় তুলে দেয়া যে তুমি প্রকাশিত হয়ে পাঠকের কাছে কবির অভিপ্রেত অর্থসহ আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় থাকো।

স্পেন্ডার বলছেন, কবিকে চূড়ান্ত সচেতন থাকতে হবে কতটুকু তিনি বলবেন এবং কতটুকু বলবেন না। ওই না-বলাটুকু কবিকে চারিয়ে দিতে হবে কবিতাটির লয়, চাল, বস্তুত সমগ্র ধ্বনিসঙ্গীতেই। এই সঙ্গীতটিই কবিকে ভেতর থেকে বলে দেয় কবিতাটি লেখা হবে কোন ছন্দে, কেমন চালে, কোন পর্দায়।

স্টিফেন স্পেন্ডারের ওই প্রবন্ধ থেকে এবার একটি অংশ দেখি, তাহলেই ব্যাপারটার আঁচ খানিক পাওয়া যাবে। সেদিনের সেই রোদঝলসিত সাগর নিয়ে যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন তার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি কতবার কতভাবে লিখেছিলেন কয়েকটি দিনব্যাপী, তিনি তাঁর হদিস দিয়েছেন। কবিতাটির চূড়ান্ত খসড়ায় পঙ্‌ক্তি দুটি এরকম :

কোনো কোনো দিন আসে যখন এ উজ্জ্বল সাগর
হয়ে যায় না-বাজানো বীণা যেন স্থলের কিনারে।

এটি প্রথম তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলো এভাবে— ঢেউগুলো যেন তার, পুড়ে যাচ্ছে সূর্যের তামাটে আগুনে। এবার দেখা যাক ধারাবাহিকভাবে, স্পেন্ডার এর প্রথম যে ছ'টি খসড়া বর্জন করেছিলেন :

১. *ঢেউগুলো যেন তার পুড়ে যাচ্ছে*
আগুনের গোপন সঙ্গীতে।

২. *দিন পুড়ে যাচ্ছে ওই তারের কম্পনে*
সুবর্ণগানের স্বর চোখের নিকটে।

৩. *দিন ঝলসে আছে ওই তারের কম্পনে*
শোনাচ্ছে সুবর্ণগান চোখের নিকটে।
৪. *দিন ঝলসে আছে ওই পুড়তে থাকা তারে*
সুবর্ণগানের ঢেউ চোখের কিনারে।
৫. *অপরাহ্ন পুড়ে যায় তারের ওপরে*
সঙ্গীতের রেখাগুলো ঝলসে দেয় চোখ।
৬. *অপরাহ্ন-মাজা ওই কেঁপে ওঠা তার*
দৃশ্যমান নীরব সঙ্গীত রাখে চোখের নিকটে।

আমরা ভাবতেই পারি, এর যে-কোনোটি দিয়েই শুরু করা যেতো একটি কবিতা; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবো স্পেন্ডার যে পঙ্‌ক্তি দুটি শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন তার ভেতরে কথা ও চিত্রের চাপ আছে বর্জিত ছ'টির চেয়ে অনেক বেশি। ঢেউয়ের মাথায় রোদের রেখাকে বীণার তার হিসেবে দেখা— একেবারেই বর্জন করেছেন তিনি; একেই তিনি বলেছেন প্রতীক দূরে সরিয়ে রাখা; একেই তিনি বলছেন— সবটা বলতে নেই। সাগরের কথায় হঠাৎ যে তিনি বীণার উল্লেখ করলেন, তাও না-বাজানো একটি বীণা, ওতেই যেন তিনি সেই দাবিটি করে রাখলেন— পাঠক, তুমি কল্পনা প্রয়োগ করো এবং দেখে নাও বীণা কী করে হয়ে ওঠে সাগর যখন রোদের তীব্রতায় উজ্জ্বল।

কবিতার ভেতরে কবি-চরিত্র ও তার দেখা বাস্তবতা

সব কবির কবিতার ভেতরেই থাকে একটি চরিত্র। এই চরিত্রটিকে স্বয়ং কবি বলে ধরে নিলে ভুল হবে। কবি এই চরিত্রটিকে নির্মাণ করেন ঠিক যেমন নাট্যকার নির্মাণ করেন তাঁর নাটকের চরিত্র। বিলম্বে— আমার কবিতা শুরুর প্রায় পনেরো বছর পর— একদিন লক্ষ করি, বিশেষ এক ব্যক্তি ও তারই ভাবটিকে আমার কবিতায় আমি ফিরে ফিরে ব্যবহার করতে চাইছি। লক্ষ করি, আমার করোটিতে একজন কবি ও তার কবিতা এ দুইই ক্রমশই যেন নদীর ভেতরে চর জেগে উঠছে; কিন্তু সে দৃশ্যমান নয়, জলতলে যেন আঙুল পরিমাণ নিচেই একটা মাটিপিঠ। লক্ষ করি আমার প্রথম দিককার কবিতায় একটি চরিত্র হিসেবে ওই আমি-কবির উপস্থিতি— সর্বনামে কখনো সে উঁকি দিচ্ছে, কখনো সে উত্তম পুরুষে পঙ্‌ক্তি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তখনো সে প্রতীক হয়ে ওঠে নি— হয়ে উঠবার অপেক্ষায় যেন নিকটেই আছে, হয়ে সে উঠবে আর কিছুদিন পরেই *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য়। এবং

এরও বছর পঁচিশ পরে কবি ও কবিতা আমার কবিতায় আবার প্রধান এক প্রতীক হয়ে উঠবে *নাভিমূলে ভস্মাধার* সিরিজে।

কুড়ি একুশ বছর বয়সে লেখা আমার *পুরনো প্রাসাদ* কবিতায় এই কবি প্রথম দেখা দেয় প্রেমবিচ্ছেদে পতিত একটি চরিত্র হিসেবে; প্রেমিক ও কবি সে— এটি আমরা জানতে পাই যখন কবিতাটির তৃতীয় পর্বে এসে উত্তম পুরুষে সে কথা বলে ওঠে; এবং তখন কেবল প্রেমিকও নয়, কবিও নয়, তাকে আমরা অধিক দেখে উঠি এমন এক হিসেবে, কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে বিকট দূরত্বটি যে জানে, জানে বিজ্ঞাপন থেকে বস্তুর কী শোচনীয় ফাঁক। পুরনো প্রাসাদ থেকে শোনা যাক তার কথা—

যদিও আমাকে তুমি সুচতুর শিল্পী বলে জানো,
জানে লোক, আমার তো সাধ্য নেই জানি।
সে কথা কোথায় পাবো উচ্চারণে যার
শব্দ আর শব্দাবলী রবে না শুধুই,
রাত্রির আকাশে তা'রা স্তব্ধতার মহানদী থেকে
উৎসারিত প্রায় দৃশ্যমান একটি বিস্ময় হয়ে
সঞ্চারিত হবে কোটি লোক থেকে লোকে।

এর পরপরই একগুচ্ছ কবিতা লেখা গিয়েছিল, এবং এর শিরোনাম দেয়া গিয়েছিলো *আত্মার মৃত্যু ও কবি যা দেখেছে*। এর পরিকল্পনায় কিছু শৈথিল্য, চ্যুতি ও পতন সত্ত্বেও বলতে চাই, শিরোনামের ওই 'কবি যা দেখেছে' কথাটিকে আমার কবিতায় একজন কবির প্রতীক হয়ে ওঠার ইতিহাসে একবার দেখে নিতে হবে। দেখে নিতে হবে, কারণ, এ কবিতাগুচ্ছের শেষ কবিতায় সর্বনামধারী ব্যক্তিটি আর কেউ নয়— সেই কবি স্বয়ং :

নিষ্ঠুর তমসা তার আদিম জননী
বিশাল স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে সে দু'হাত বাড়িয়ে।

এখানে আমি খেদের সঙ্গে বলে নিতে পারি, কবি নিয়ে আমার করোটিতে তখন যে কাজ চলছিলো সে সম্পর্কে তখনই আমার আরো একটু সচেতন হওয়া কর্তব্য ছিল; তাহলে এই কবিতাগুচ্ছটি তৃপ্তিকর হতে পারতো নির্মাণের দিক থেকে। কিন্তু এভাবেই আমাকে এগোতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে, তখনকার ঢাকায় গুরু কিম্বা গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সর্বাংশে নিজের বোধবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে— কখনো হোঁচট খেতে খেতে, কখনো ভুল করতে করতে, এবং এভাবেই দীর্ঘ সময় জুড়ে।

কবির সরাসরি উল্লেখ এই রচনার কয়েক বছর পরে পাচ্ছি একটি কবিতায়— *একা একজন কবি*, এবং শুনতে পাচ্ছি একটি প্রশ্ন এর শেষ পঙ্‌ক্তিতে :

এত বিষ, এত বিষে সঙ্গী হবে এত সাধ কার?

আমার কবিতা শুরুর দিনগুলোতে একবার প্রচ্ছন্নভাবে এসেছিলেন একজন খুব বড় কবি— গ্যোয়েটে— *মহিলাকে, শিল্পীর উত্তর* কবিতায়; ওখানে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কেন একজন কবি তথা শিল্পীকে—

হতে হবে অনাচারী, বৃত্তকাম, অসুস্থ, অনয় ?
কেন এ জরুরী যদি পরিণামে সর্বনাশ জ্ঞাত ?

আরেক কবিতায় সরাসরি নামসহ এসেছেন একজন কবি— হার্ট ক্রেন— *কবিতা ২২০* লেখাটিতে :

একদা যাচ্ছিলাম আত্মহত্যা করতে
হাতে এসে ঠেকল হার্ট ক্রেনের বই
যখন বিষ নেবো হাতে।

কিন্তু এ একবারই; আমার আর কোনো কবিতায়, আগে কিম্বা পরে, আত্মহত্যার কথা আর কখনোই আসে নি; এবং এখন আমি স্মরণ করতেও পারছি না, কেন ও কীভাবে সেদিন আত্মহত্যার চিন্তাটি একবারের জন্যে হলেও আমি কবিতায় নিয়ে এসেছিলাম।

বই উলটে দেখছি এখন, কত ভাবেই না কবি ও কবিতার কথা এসেছে আমার কবিতা শুরুর দিনগুলোতে; *কবিতা ২৩৯*-এ বলছি কবিতাকে বিশেষিত করবার চেষ্টায় :

ফেরাও ও দুটি চোখ, ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখো না।
নাস্তির নিপুণ তীরে বিদ্ধ আমি, শোনোনি চিৎকার।—
মধ্যরাতে ?— যখন ঘুমায় লোক সে কণ্ঠ আমার
চিন্তার বিপন্ন চিহ্ন এঁকে যায় অন্ধকারে, যাকে বলি
কবিতা আমার।

বিচ্ছিন্ন নোট কবিতায় বর্ণনা করছি আমি-কবি নয়, আমরা-কবিকে এভাবে :

আমাদের কেউ বানিয়েছিল উড়বার জন্যে, কেউ
বানিয়েছিল আমাদের, কেউ
উড়বার জন্যে আমাদের — কিন্তু আমরা
মাতালের মতো টলতে টলতে
ফাঁস লটকে ঝুলে রইলাম
কয়েকটা রাস্তার ওপরে।

কবিতা ৩২৮-এ হয়তো এই প্রথম আমি এভাবে দেখে উঠি আমাদের দেশ-ইতিহাসে কবির দ্বৈত ভূমিকাটি :

এদিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল কোথাও—
তার ভেতরে পুড়তে লাগল কয়েকটি শাদা হাত,
যার একটিতে ছিল রক্ত-গোলাপ
আরেকটিতে নিশান।

এবং অচিরেই *একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু* কবিতায় আমি রাজনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আরো সরল ও স্পষ্ট করে বলছি :

হে জননী,
তোমার প্রশংসা-গাথা রচনায় আমি আজ আগ্রহী আবার।
একদা শৈশবে কিসের সুগন্ধে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কোলে
খুঁজতাম যুঁইফুল শরীরে তোমার, মাগো, আজ সেই ঘ্রাণ ফিরে আসে,
আমাকে ফেরায় পথে, নিয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামে,
ফিরে আসি মেঘে রৌদ্রে মেঠোপথ হেঁটে;
শব্দ-ছন্দ-অলংকার ঝুমঝুম করে চলে পেছনে আমার
যেমন মেলার দিকে দুপুরের রোদ ছিঁড়ে যায় বাজিকর,
তার সঙ্গে পোষাজন্তু লাল জামা পরে।

এবং এ কবিতার দ্বিতীয় অংশে আমাকে খেদযুক্ত কণ্ঠে বলতে হচ্ছে :

আর তো গেল না লেখা এক বর্ণ;
কাটাকুটি ভরে দিল পাতা,
যেন চৈত্রে পড়ে আছে বিবর্ণ ফুলের শব মাঠে মাঠে
আর আমি হেঁটে যাচ্ছি
দূরে কোনো পদ্মার স্বর শুনতে পেয়ে, সম্মোহনে,
যত যাই তত দূরে যায়
ধ্বনি যায় প্রতিধ্বনি হয়ে,
মৃত্তিকায় ফুল,
প্রস্তাব আমার কণ্ঠে কর্কশ শোনায়—
পুরনো রেকর্ড যেন ঘষে ঘষে দম শেষ বলে যাচ্ছে থেমে,
থামবার আগে।
যখন ফিরে এলাম রাত্রির আকাশে
কাব্যের অংশের মতো খসে খসে পড়ছে তারা।

এখন আমি বলতে পারি, ১৯৬৭ সালে যখন আমি একটু একটু করে লিখে চলেছিলাম *বিরতিহীন উৎসব*-এর কবিতাগুলো, অদূরে অপেক্ষা করছিলো *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*— যা লেখা হবে ১৯৬৯ সালে, সেই কালে আমার কবিতা-চেষ্টার ভেতরে কবি ও কবিতা প্রতীক হিসেবে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো। প্রেম ও অস্তিত্ববোধ বিষয় হিসেবে কবিতার পর কবিতায় এনে চলেছি বটে— এ দুয়ের মধ্যেও থেকে থেকেই উঁকি দিচ্ছে কবি ও কবিতা প্রসঙ্গটি, কিন্তু স্পষ্ট করে কবি-কবিতা প্রতীক— যা আমার কাব্যের একটি প্রধান দিক বলে আমি এখন জানি— তার সংকেতটি স্পষ্ট লক্ষ করি *একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু* কবিতাটিতে।

এবং শিরোনামে উল্লেখিত ওই 'মৃত্যু' শব্দটিকে আমি এখন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি; কারণ, এ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ওই 'মৃত্যু' থেকে জীবনের ভেতরে প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে ১৯৬৯ সালে *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-র কথা; আবার ওই 'মৃত্যু'র মুখোমুখি আমি কবিকে কল্পনা করেছি ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলার বুকে শায়িত এক তপস্বীর রূপে যার নাভিমূলে ভস্মাধার।

কবি-কবিতা ব্যাপারটি এর আগে আর কখনো এমন করে আমি অনুভব করি নি, যেমন, *একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু* কবিতায়; পেছন ফিরে এখন শুনতে পাই, ওই কবিতার চতুর্থ অংশে আমাকে সূচনার অক্ষরবৃত্ত ভেঙে গদ্যস্পন্দনে বলে উঠতে হচ্ছে :

হে জননী
তোমার মুখ যখন দুঃসহ কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে
আমার আত্মা হয়েছে অগ্নিপুষ্পের স্তবক;
তোমার শরীর থেকে যখন রক্তপাত হচ্ছে
আমি সহস্রের হাতে সমর্পণ করেছি
আমার অস্থির আঙুল;
যখন তোমার চোখ থেকে উদ্‌গত হচ্ছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা
আমি একটা তরণীর মতো ঋজু হয়েছি
ধাবিত হবার জন্যে।
এবং যেহেতু আমার শক্তি কতগুলো শব্দে
আমি সমস্ত শরীরের মধ্যে অনুভব করেছি
জ্বলন্ত ধ্বনিসমূহের নির্গম
আর একটা পূর্ণিত আলোক-পিণ্ডের শুভ্র বিচ্ছুরণ।

কিন্তু এটাও এখানে বলে নিতে হয়, যে, এই যে উচ্চারণ আমি করেছিলাম— এর ভেতরে আবেগ ছিলো যতটা সিদ্ধি ছিলো না ততখানি; তা না থাক, আমার কবিতা-চেষ্টার চার দশকের ইতিহাসে এর একটা ভূমিকা আছে— ভূমিকাটি হচ্ছে এক অবস্থান গ্রহণের। *একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু* আমাকে একটি শক্ত পাটাতনের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু দিলে কী হবে ?— ব্যাপারটি তো এখন আমি এভাবে দেখছি! কিন্তু ওই কালে, ওই সাতষট্টি সালে, আমি দেখতে পেয়েছি অমন 'জ্বলন্ত ধ্বনিসমূহের নির্গম' অনুভব করা সত্ত্বেও— আমি আর কবিতা লিখতে পারছি না; কবিতার উচ্চারণ থেকে ক্রমেই আমি দূরে সরে যাচ্ছি, কবিতার স্তব্ধতা আমার প্রতিদিনের বয়স্য হয়ে উঠছে।

সেই পাথর-জিহ্বার কাল, সেই কষ্টের কাল— বর্ণনা করি এমন প্রবণতা আমার যে তখন ছিলো না, এ আমি ভাগ্য বলে মানি; আমি তো জানি, শব্দ-ছন্দ-অলংকার জ্ঞান দিয়েই তখনো আমি লিখে যেতে পারতাম; বহু কবি এমনটি করে থাকেন, বহু কবির রচনায় আমি তাঁদের এই প্রায়োগিক সিদ্ধির জোরে এগিয়ে যাওয়া লক্ষ করেছি ও এখনো আমার চতুর্পার্শ্বে করি; কিন্তু সে কীর্তি আমার জন্যে নয়; সৃষ্টিকে আমি হাড়ের ভেতরে অনুভব না করি তো আমি নই আমি; হচ্ছে না তবু অভিনয় ও দিচ্ছি না তবু দিচ্ছি দ্যাখো— এই চাতুর্য শিল্পের জন্যে নয়; অতএব দিনের পর দিন আমি উন্মত্তের মতো শহর ভাঙি, সুরাপান করি, জীবন নিয়ে তছনছ খেলা করি অতঃপর; কবিতা আর লিখি না।

এখন একটু পেছন ফিরে কবি ও কবিতার এই বিশেষ উল্লেখ ও উপস্থিতি আমার কবিতা সংগ্রহ-এর পৃষ্ঠা ধরে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি। ওই সংকলনের ভূমিকায় লিখেছি : বারো বছরের বালক আমি কুড়িগ্রামে একদিন এক ভোরবেলায় চোখ মেলে হঠাৎ দেখে উঠেছিলাম রান্নাঘরের পেছনে সজনে গাছের ডালে একটি লাল পাখি। সেই প্রথম কিছু একটা আমার ভেতরে ঘটে যায়— কবিতাই কি ?— মনে মনে তৈরি করে ফেলি একটি পদ।

আমার জানালার পাশে একটি গাছ রহিয়াছে।
তাহার উপরে দুটি লাল পাখি বসিয়াছে।

আসলে পাখি ছিল একটি; পদ রচনা করতে গিয়ে কে যেন আমাকে ভেতর থেকে বলিয়ে নিলো— একটি নয়, দুটি। ওই যে ঈষৎ বদল ঘটিয়ে ফেললাম বাস্তবের, বোধহয় ওখান থেকেই সবকিছু বদলে নেবার, বদলে দেবার, বদলে দেখবার শুরু। বাস্তবতাকে এইভাবে বদলে দেখবার ব্যাপারটার ভেতরেই বোধহয় আছে শিল্পের সবকিছু। বলা বাহুল্য, বাস্তবতাকে বদলে দেবার ও শিল্পে সেটি ধরিয়ে দেবার ব্যাপারটি আদৌ স্বেচ্ছাচারী কিছু নয়; ওই বদলে নেবার ও দেবার ভেতর দিয়েই আমরা আমাদের আপন-দেখা ও অস্তিত্ব-বোধটিকে প্রকাশ করি— বিশেষ করে ভাষাশিল্পের কবিতা মাধ্যমে। কবিতারই নিজস্ব এ কিমিয়া।

একবার 'কবিতা আমাদের কী করে ?' এক নেমতন্ন বাড়িতে অকস্মাৎ এই প্রশ্নের মুখে পড়ে যাই আমি। লালনীল আলোর মালায় শোভিত বিশাল বাগানে, অতিথিদের ভিড়ের ভেতরে, হাতের সুরাময় গেলাশটি দোলাতে দোলাতে আমার ব্যাংকার বন্ধুটি, যিনি এতক্ষণ আমাকে বোঝাচ্ছিলেন যে কবিতা বাস্তব জীবনের কোনো কাজে আসে না, তিনি হঠাৎ আমার মুখে একটি স্থির হাসি লক্ষ করে প্রশ্নটি ছুড়ে দেন।

আমিও একটি ঘোর থেকে যেন জেগে উঠি এবং বলি, 'কবিতা আমাদের স্থানচ্যুত করে।' বলেই আমি চমকে উঠি। বলবার পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, যে, হ্যাঁ, ঠিক এই উত্তরটিই তো আমি দীর্ঘকাল আগেই খুঁজে পেয়েছিলাম যে, কবিতা আমাদের স্থানচ্যুত করে।

একটি খাঁটি কবিতা পড়ে উঠবার পর, আমরা আমাদের আগের স্থানে আর থাকি না, সে স্থানে আর ফিরে যেতে পারি না, কাল ও জীবনের প্রতি যে অবস্থানেই আমরা থাকি না কেন, অতি সামান্য হলেও তার একটা বদল ঘটে। এবং কেবল কবিতা কেন, যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিই এই কাজটি করে থাকে— উপন্যাস, নাটক, ছবি, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত — আমাদের স্থানচ্যুত করে।

কিন্তু যে কথাটা একটু আগে বলছিলাম, যখন সত্যিকার অর্থে কবিতা লিখতে শুরু করলাম তখন ছোটবেলার সেই একটির বদলে দুটি পাখি করবার মতো অমন সহজ ও দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো না কিছুই। দেখতে পেলাম আমার চারপাশে চূর্ণিত দর্পণখণ্ডের মতো বাস্তব। আমার সেই প্রথম যৌবনে তখন না সম্ভব হলো বাস্তবকে তার সম্পূর্ণতায় ও সত্যরূপে অবলোকন করা; না সক্ষম হলাম টুকরোগুলোকে অগত্যা এক প্রাঞ্জল বিন্যাসে সাজিয়ে নিতে। বাস্তবের তীক্ষ্ণধার টুকরোগুলোকে আমি দু'হাতে কুড়োতে লাগলাম; মুঠো করে ধরে রাখতে চাইলাম, আমার হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠলো; চিৎকার করে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিতে হলো;— অনবরত চলতে থাকলো এই ক্রিয়া : বাস্তবকে অবিরাম একই সঙ্গে কুড়িয়ে তোলা ও ছুড়ে ফেলা।

এই ক্রিয়াটি লক্ষ করা যাবে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬-র ভেতরে লেখা কবিতা নিয়ে আমার প্রথম দুটি কবিতার বই *একদা এক রাজ্যে ও বিরতিহীন উৎসব*-এর অধিকাংশ রচনায়। এবং আরো খানিকটা এগিয়ে এখানেই বলে নিতে পারি, আমার ভেতরে এই যে কাজটি চলছিলো তা অগ্রসর হচ্ছিলো আর মাত্র কয়েক বছর পরেই লেখা *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-র দিকে। ছোট ছোট কবিতায় যা ও যাকে আমি বুঝে নেবার চেষ্টা করছিলাম দশ-বারো বছর সময় নিয়ে, এখন আমি জানি আসলে তা একটি দীর্ঘ কবিতার শরীরের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। এ যেন একরাশ চিত্রখণ্ড রচনা করা যাচ্ছে, তারপর সে সব নিয়ে নির্মাণ করা যাচ্ছে বড় আকারের একটি মোজাইক। কিম্বা অন্যভাবেও বলতে পারি— *একদা এক রাজ্যে* ও *বিরতিহীন উৎসব*-এর সারাৎসার নিয়েই রচিত হয় *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*।

১৯৬৯ সালে লেখা প্রায় আটশো পঙ্‌ক্তি দীর্ঘ *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য় শেষ পর্যন্ত আমি বাস্তবের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোকে মেলাতে পেরেছিলাম বড় মাপের জমিতে ও আমার দেশ-কাল-অস্তিত্ব ভাবনায়। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পরে এত দীর্ঘ কবিতা যে সেই প্রথম, এক অণুমহাকাব্যেরই সাধন যে সমসময়ের বাংলা সাহিত্যে খণ্ডকবিতার দোর্দণ্ড রাজত্বকালে ছিলো আমার প্রথম,

মাইকেলের উদাহরণ সত্ত্বেও আবার প্রায় সেই অভ্যস্ত কোমলে ফিরে যাওয়া বাংলা কবিতার প্রধান বাহন চোদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্তে যে গদ্যস্পন্দনের নতুন এক মেরুদণ্ড প্রয়োগ করা গিয়েছিলো এ কবিতায়— এ সব আলাদা করে আঙ্গিকের বিষয় বলে দেখলে ভুল হবে, এ ছিল আমারই অনুভবের ও বক্তব্যের তাড়নায় উঠে আসা অনিবার্য এক স্বর ও শরীর।

কবিতা কানে শোনবার জিনিশ। *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* লিখে ফেলবার পর ও ছাপবার আগে প্রথম পড়ে শোনাই যখন কবি শহীদ কাদরিকে রমনা উদ্যানের রেস্তোরাঁয় এক দুপুরবেলায়, তখন এ কাব্যের এই বেধ ও বিস্তার আমি নিজেও ঠিক অনুভব করি নি, করি নি সম্ভবত রচনার ঘোর তখনো আমার সম্পূর্ণ কাটে নি বলে; করি, প্রায় তিরিশ বছর পরে, যখন বন্ধু মফিদুল হকের প্রস্তাবে এ কাব্যটি আমি বাংলা নতুন বৎসরের প্রাক্‌সন্ধ্যায় শ্রোতাসমক্ষে পাঠ করি সেগুনবাগানে মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘরে। আমার যে-কোনো রচনাই অচিরে পরিণত হয় আমার বাইরের বস্তুতে। অনেক সময় আমি আমার পুরনো লেখাও নিজের বলে হঠাৎ চিনে উঠতে পারি না। আমি একটা কাজ পারি, আর তা হচ্ছে নিজের রচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দেখতে। সেই আত্মদূরত্ব থেকে বলতে পারি *একদা এক রাজ্যে* ও *বিরতিহীন উৎসব*-এর ভেতর দিয়ে *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য় এসে আমার কবিতা একটি পর্যায় সমাপ্ত করে এনেছিলো। এর পর যখন আমাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে হয়েছিলো, ততদিনে বাংলাদেশ গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে হাঁটছে।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকে, আমার কবিতা লেখার শুরুতে, সেই যে বাস্তবতাকে আমি চূর্ণিত, ভাঙা আয়নার টুকরোর মতো কৌণিক ও তীক্ষ্ণধার দেখেছি, কুড়িয়েছি, মুঠো করেছি ও ফেলে দিয়েছি; সেই যে আমি সে সকল বলবার জন্যে তখনই আমার কবিতার কলমে দেখতে পাচ্ছি গদ্যধারা; সে ছিলো কেমন— সেই বাস্তবতা ?

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। কুড়িগ্রামে আমার সকল বন্ধুই ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের, তাদের প্রায় সবাই রাতারাতি ভারতে চলে গেলো। ১৯৪৮ সালে বালক আমি আক্ষরিক অর্থে একা এলাম ঢাকায়। ঢাকায় লক্ষ্মীবাজারে তখনো হিন্দু সম্প্রদায়েরই বাস, তাদের সঙ্গে আমার একটা স্নেহবন্ধন গড়ে উঠছিলো, কিন্তু হঠাৎ ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো ঢাকায়। তারপর— হিন্দুদের দেশত্যাগ; সীমান্তের ওপার থেকে আসা নতুন অচেনা মুখের প্রতিদিন দেখা; ব্যক্তিগত জীবনে আমি ভীষণ একা; ইশকুল শেষে আমি পথে পথে হাঁটি, নদীতীরে বসি, নৌকোয় দূর দূর গাঁয়ে চলে যাই; রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন; রাজপথে গুলি ও হত্যা; ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়; বাঙালির বিজয় হলো ক্ষণস্থায়ী; পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন জারি হলো পূর্ব বাংলায়; ব্যক্তিগত পর্যায়ে বারবার সম্পর্ক স্থাপন ও ভাঙন; পিতার মৃত্যু; পিতার বৃহৎ পরিবারের হাল আমাকে ধরতে হলো অকালে। আর এ সবের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে

আমি দেখছি আমাকে— ভাঙছি, গড়ছি, আবার ভাঙছি, আবার গড়ছি। আমি সমস্ত কিছুর ভেতরেই কিন্তু একই সঙ্গে সমস্ত কিছুর বাইরেও যেন আমি। দৃষ্টি অন্ধ করে দেয় কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া এক সৌন্দর্য, কিন্তু আমাকে পথ হাঁটতে হয় কুৎসিত মাড়িয়ে। আমি দেখতে চাই প্রতিদিনের জীবন থেকে মানুষেরা উত্থিত, কিন্তু দেখতে পাই প্রতিদিনের ভেতরে আশাহীনভাবে তারা প্রোথিত।

আমার কবিতায় যদি একটি চরিত্রকে আমি নির্মাণ করে থাকি তবে সে এই।

কবিতার সাঁটলিপি

সাঁটলিপিতেই কাজ করে কবিতা। উল্লম্ফনে সে চলে। আপাতদৃষ্টে যুক্তিক্রম, ভাষাক্রম বোঝা যায় না— এমন মনে হয়, নেইই বা; কিন্তু এভাবেই হয়ে ওঠে কবিতা। কবিতার ভেতরে যুক্তিক্রম সবচেয়ে সমর্থ ও গাণিতিক, কিন্তু পেশি ও বিজ্ঞান দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যাবে না— জীবনানন্দ যাকে বলেন কল্পনা-প্রতিভা, সেই ক্ষমতাবলেই কেবল একে পাবার।

এই সূত্রে আমার আঠারো বছর বয়সে একটি দিনের কথা এখন মনে করছি। এবং ওইদিনে লেখা একটি কবিতার কথা। ওই দিনটিতে আমি বিকেলে রাস্তায় নেমেই হঠাৎ হাওয়ার তোড়ের ভেতরে পড়ে গিয়েছিলাম; সেই হাওয়া যেন শহরটারই মুখাবয়ব বদলে দিয়েছিল ক্ষণকালের জন্যে। তারপর হাওয়া গেলো থেমে, কিন্তু শহর তার নতুন মুখ নিয়ে বন্ধুর মতো নেচে নেচে চললো আমার সঙ্গে। আমার চারদিকে প্রতিদিনের জীবন ও সেই জীবনের ভেতরে প্রোথিত মানুষ— আমি যে-বদল মানুষের ভেতরে দেখতে চাই কিন্তু দেখতে পাই না— সেই বদল আমি যেন হঠাৎ আমার ভেতরে প্রবল অনুভব করে উঠেছি ওই মুহূর্তে। ভেবেছি, তবে আর কিছু না হোক, এই মুহূর্তটিকেই ছেনেছুনে দেখে নিই, যদি এখন মরে যেতেও হয় তো যাই, এই মৃত্যুও আমার জন্যে নষ্ট বাস্তবে বেঁচে থাকার চেয়েও ভালো। এই কথাগুলো বলবার জন্যে প্রায় একটানেই লিখে ফেলি পরপর দুটি কবিতা, একই নামে : কি মুহূর্ত। এ কবিতার প্রথম পর্বটি একবার পড়ে নেয়া যাক।

বাতাসের
অদৃশ্য সবুজ ঘোড়া লাফিয়ে উঠছে তার বর্ণহীন কোলে।
আর চাদরের মতো ফিনফিনে কাঁপছে নীল শহর।
ফুলে উঠছে চাঁদ
রক্তিম নিষ্ঠুর আভায় কুমারী
গর্ভের মতো প্রতিটি মুহূর্তে। বসে থাকা দায়।

এ হলো ঈশ্বর,
এ হলো এমন কিছু যা কয়েকটা চোখের 'পরে শুয়ে থাকে—
একে রাখবে না—
একে থাকবে না সুটকেসে,
শেল্‌ফে,
রান্নার আগুনে। কেবলি
ফুলে উঠবে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো আমাকে ডিঙিয়ে—
কেবলি ফুলে উঠবে—
থাকবে—
শাদা শার্টের কলারে, কলারের নীচে শাদা স্বচ্ছ শরীরে।
যদি ওরা পারে,
বাজাক না ছেলেগুলো ভেঁপু,
বউগুলো কাটুক না আনাজ,
বেড়ালটা নাচুক দেয়ালে।
এ হলো ঈশ্বর, একে থাকবে না।

একে রাখবে না, অথচ কয়েকটা চোখে
আমরা মরে যেতেও পারি।
আমরা যেতেও পারি।
সিঁড়ির শেষ ধাপে
কতকগুলো লাফানো সবুজ এই আঙুলের দীর্ঘ দাঁতে চিবিয়ে
মরে
কিংবা মরে
কিংবা
মরে।

কবিতার প্রথম স্তবকে প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তিতেই সেই যে হঠাৎ বাতাস, আর সেই বাতাসটিকে আমি যে সবুজ ঘোড়ার মতো দেখে উঠলাম, সে লাফিয়ে উঠলো আমার নয় 'তার বর্ণহীন কোলে'। তার ? সে কার ? এর স্পষ্ট নির্দেশ আমি এ কবিতার কোথাও দিই নি, কারণ, পুরো কবিতাটি পড়ে যাবার পর আমরা জেনে যাবো যার কোলে এ বাতাস লাফিয়ে উঠেছে সে বা তারা হচ্ছে প্রাত্যহিকে বাঁধা মানুষ। আর এদেরই সংকেত আমরা পাবো দ্বিতীয় স্তবকে। ইতোমধ্যে, শহরটিকে দেখালো নীল রঞ্জিত, 'কেঁপে উঠলো' বলা যেতো, কিন্তু সে কথা ডিঙিয়ে বলে ফেললাম 'কাঁপছে'— 'কাঁপছে সে চাদরের মতো'— কারণ কাঁপনটা চলেই চলেছে। এদিকে, শহরের ওপর নীল রঙটি চাপিয়ে দেবার যুক্তি— মৃত্যুর রঙ নীল বটে; এবং ওই রঙ চাপানো যে

আদৌ রোমান্টিকতা নয়, সেই কথাটি জানান দেবার জন্যে অপরাহ্নের চাঁদ প্রসঙ্গে সংক্ষোভ ও ধর্ষণের সংকেত আনা হয়েছে 'কুমারী গর্ভের' কথা বলে।

এই যখন চিত্র, তখন 'বসে থাকা দায়'— বস্তুত আমারই বসে থাকা দায়; আমি এই সবুজ ঘোড়ার মতো লাফিয়ে ওঠা মুহূর্তকে অতঃপর দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতেই বলছি : মুহূর্তটি হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বরের যে কল্পনা মানবের পুরানে— তিনি সৃষ্টিশীল, অন্ধকারে তিনি আলোর জন্ম দেন, তেমনই এ মুহূর্ত; কিন্তু এর ভেতর-চিত্রটি সবাই দেখতে পায় না, কেউ কেউ পায়; কিন্তু যারাও বা দেখতে পায় তাদেরও চোখে এ চিত্রটি শুয়েই থাকে, উত্থিত জাগ্রত সে নয়। এবং এ কারণেই এই সংখ্যালঘু ক'জনেরও পরিণামে আছে মৃত্যুই, এই কথাটিই আমি বলতে চেয়েছি কবিতাটির তৃতীয় তথা শেষ স্তবকে।

এখন এই দ্বিতীয় স্তবকে বলা হচ্ছে, এই সৃষ্টিশীল ঈশ্বরতুল্য মুহূর্তকে তোমরা রাখবে না। সাঁটলিপির দ্রুততায় বলে নেয়া হচ্ছে— একে তোমরা সুটকেসে বন্দি করে রাখলেও সুটকেসের ভেতরে সে থাকবে না। শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখবে ? থাকবে না। রান্নার আগুনেও থাকবে না। অর্থাৎ প্রাত্যহিকতার ভেতরে একে রাখা যাবে না। আর এদিকে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে, আমার যে শার্টে নেই মালিন্যের চিহ্নমাত্র, আমার শার্ট শাদা, এবং আমার অভ্যন্তরে নেই কোনো মালিন্য, আমার শাদা স্বচ্ছ শরীর— আমি নিশ্চিত, এই আমারই কাছে ঈশ্বরতুল্য মুহূর্তটি ফুলে ফুলে উঠবে তার কেশরে, এবং থাকবে, থেকে যাবে। এই সংকেতটি ধরিয়ে দিয়ে এখন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছি :

যদি ওরা পারে,
বাজাক না ছেলেগুলো ভেঁপু,
বউগুলো কাটুক না আনাজ,
বেড়ালটা নাচুক দেয়ালে।
এ হলো ঈশ্বর, একে থাকবে না।

বলবার কথাটি তবে এখানে এই যে, প্রাত্যহিকের ভেতরে ওরা করুক যা করবার, কিন্তু এই যে মুহূর্ত একে তারা ধরে রাখতে চাইলেও এ থাকবে না, তাই সাঁটলিপির উল্লম্ফনে বলা— 'একে থাকবে না।'

এবার কবিতাটিকে গুটিয়ে আনবার পালা; তৃতীয় তথা শেষ স্তবকে তাই আমাকে বলতে হলো : এই মুহূর্তটিকে কেউ ধরে রাখবে না, কেউ একে নিজের ভেতরে এনে রাখবে না; আর এদিকে আমাদের যে কয়েকটি চোখে— সংখ্যালঘু কতিপয়ের চোখে যে ঈশ্বরতুল্য সৃষ্টিশীল মুহূর্তটির চিত্র শুয়ে ছিলো, তা শায়িত বলেই আমরা মৃত্যুর সম্ভাবনার অন্তর্গত বটে; 'আমরা মরে যেতেও পারি' যদি না একে ব্যবহার করি; এবং কীভাবে ?— সে এইভাবে যে, কতকগুলো লাফানো সবুজ—

এখন ঘোড়াটিকে আর আনবার দরকার নেই— শুধু সবুজ রঙ তথা জীবনের রঙটিই যথেষ্ট— যদি এই চঞ্চল ও সৃষ্টিশীল মুহূর্তগুলোকে ভেতরে ধারণ না করে কেবলি আমাদের দীর্ঘ আঙুলে পিষ্ট করি, এমত যে আঙুলে আছে দাঁত ও সেই দাঁতে যদি কেবলি চিবোই, তবে মৃত্যুই হবে আমাদের পরিণতি; এবং তাই কবিতার শেষভাগে, একই কথার তিনবার উচ্চারণে যে চূড়ান্ত কিছু বলতে আমরা অভ্যস্ত, মৃত্যুর কথা একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার বলি।

অবচেতন থেকেও উঠে আসতে পারে কবিতা

কবিতাটি কী হবে— অর্থাৎ, এ কবিতায় কী বলবো, আর যা একই সঙ্গে করোটিতে আসবার কথা— এ কবিতার চাল, লয় আর ছন্দটাই বা কেমন হবে, এ সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা না করেই লিখতে বসে যাওয়া, এমন কাণ্ড দীর্ঘ আমার লেখার ইতিহাসে খুব কমই হয়েছে; অথচ, এভাবেই আমি একটি কবিতা লিখে উঠেছি— *নৈশভোজে রক্তপাত*। আমার অভ্যেস, রচনার আগেই একটি কবিতাকে আমি দেখতে পাই, দেখতে পাই তার সমগ্র সংকেতে ও সংকল্পে; কবিতাটি কত দীর্ঘ হবে, তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, এবং বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি হবে কেমন ও কোন্ ও কতটা কৌণিক, এ আমি জেনে যাই প্রথম অক্ষর লিখনেরও পূর্বে। কিন্তু এই যে কবিতাটি লিখে ফেলা গিয়েছে, যা সন্দেহ করা যেতো দৈবের বশেই লিখিত, কিন্তু দৈব বা স্বভাব-কবিত্বে অবিশ্বাসী আমি, এ হলো কেমন করে ? তবে, বুঝি, কবিতাটির রচনা প্রক্রিয়ার দিকে তাকাতে হয়। তার আগে একবার দেখে নিই কবিতাটিকেই।

রাতের এ রেস্তোরাঁয় একটি বেড়াল— চোখ তার
ফিরোজা পাথর; পৃথিবীর সবটুকু অন্ধকার
তসরের মতো টেনে বসে ছিল। একটি টেবিলে
ঘন নীল ন্যাপকিন কোলে পেতে দুই ব্যক্তি মিলে,
সামুদ্রিক সেদ্ধ মাছ থেকে কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে,
পাল্লা দিয়ে বলছিল কে কোথায় গিয়েছে বেড়াতে।

এ যদি সিলেট বলে, ও বলে সুন্দরবন। নামে
যদি জ্যোৎস্নায় হরিণ, পাহাড়েরও স্তন তবে ঘামে।
নাভি ফেটে যায় যদি গর্ভচাপে, বেরোয় প্রপাত—
হরিণের পালে পড়ে ডোরাকাটা বাঘ অকস্মাৎ।

বেড়াল অপেক্ষা করে, ভাগ্যে তার জুটবে কখন
কাঁটা কান্‌কো— ধৈর্যসীমা আছে তারও। হঠাৎ তখন

চোখের পলকে বাতি নিভে যায় বিদ্যুত বিপাকে।
'মোম আনো, মোম' কেউ ডেকে ওঠে ভুতুড়ে গলায়।
খাদ্য ও খাদক বসে ঘষে ঘষে ভুষোকালি মাখে।
ছুরি ডিশ পোর্সিলিন ভেঙে পড়ে ঘোর স্তব্ধতায়।
ভ্রমণ যে এতক্ষণ ছিল শুধু কথার চাতুরি—
সে কথা বেড়াল জানে, জেনেছিল টেবিলের ছুরি।

বেড়ালটা ডেকে ওঠে, শব্দ ওঠে শুকনো পাতায়,
সমুদ্র আছাড় খায়, নুন ওঠে তখন মাথায়।
তখন ছুরিতে হাত কেটে ফ্যালে— কে কার সঠিক?
হঠাৎ কে হয়ে ওঠে নৈশভোজে ক্রুদ্ধ নাগরিক?
অন্ধকার হয়ে ওঠে কার কাছে আলোর অধিক?

একজন কবি ছিল। অন্যজন কবিতা ক্রিটিক।

কিছুদিন থেকে মনের মধ্যে একটা ছবি বহন করে বেড়াচ্ছি : একদিন একটি রেস্তোরাঁয়, সন্ধেবেলা, কফি খাবার জন্যে কাচের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি এত বড় একটা ঘরে দূরের টেবিলে দুটি মাত্র লোক, তৃতীয় কোনো খদ্দের নেই, মেঝের এক কোণে কালো একটি বেড়াল বসে আছে চোখ বুঁজে, রেস্তোরাঁটি পরিপাটি সাজানো, তাই এর নির্জনতাটুকু বেশ ধারালো— খুব গভীর দাগে ছবিটা আমার ভেতরে আঁকা হয়ে গেলো তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু কী কাজে লাগবে এই ছবিটি, আমি তখনই বুঝে উঠি না। কিন্তু ছবিটা আমাকে ছাড়ে না, দিনের পর দিন আমি থেকে থেকেই ছবিটার সমুখে হঠাৎ পড়ে যাই, বেড়ালটা চোখ বুঁজে থাকে, কখনো বা একবার আলস্যে চোখ খুলে আমাকে দেখে নেয়। একদিন এরই হাত থেকে নিস্তার পেতে— আমি যে অস্ত্র ব্যবহার জানি— ভাবি শব্দেই এই ছবিটিকে লিখে রাখি, তবেই এ আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে, আর আমাকে তাড়া করবে না।

ছিল সন্ধেবেলা, কলম হাতে নিতেই যেন রাত ঘনিয়ে এলো, লিখলাম— *রাতের এ রেস্তোরাঁয় একটি বেড়াল;* একই টানে বেড়ালের চোখটিও দেখতে পেলাম— *চোখ তার ফিরোজা পাথর;* এবং ওইযে তার কালো রঙ, স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাইরে যে-রাতের অন্ধকার আর ভেতরে যে-আলো সেই আলোর ভেতরে অন্ধকারটিকে সে যেন টেনে ধরে বসে আছে; লেখা যাক তবে— *পৃথিবীর সবটুকু অন্ধকার / রেশমের মতো টেনে বসে ছিল।* এটুকু লিখে ফেলবার পর আবিষ্কার করলাম, ব্যাপারটি পয়ার হয়ে

যাচ্ছে— আঠারো মাত্রার, এবং মিল আসছে ক-ক জোড়ে জোড়ে 'চোখ তার' 'অন্ধকার' এই বিন্যাসে। কিন্তু 'রেশম' শব্দটি মনে করিয়ে দিলো জীবনানন্দকে, অতএব ওটি কেটে লিখলাম 'সিল্‌ক', কিন্তু তৃপ্তিকর মনে হলো না, কেটে লিখলাম 'তসর'— ধ্বনিটা তৎক্ষণাৎ চমৎকার বেজে উঠলো, খসখস একটা শব্দ যেন ধরা গেলো 'তসরে'— হলো— *তসরের মতো টেনে বসে ছিল।*

এখন আমাকে পেয়ে বসলো ছবিটা; একে যদি করোটি থেকে নিষ্ক্রান্ত করতেই হয়— এখনো জানি না একটি কবিতারই দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি— তাহলে লোক দুটিকেও অক্ষরে ফেলে বিদায় দিতে হয়। লিখলাম— *একটি টেবিলে;* দূরের টেবিলে লেখা যেতো আমার স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, কিন্তু দূর যে কার থেকে দূর ?— কিসে থেকে দূর ?— আমি নিজে তো এ ছবিতে আসতে চাই না, তাই একটি টেবিল-ই লেখা হলো, এবং লোক দুটি কী করছে ? তারা খাচ্ছে। কী খাচ্ছে ? বেড়ালের অনুষঙ্গে মাছের কথা এসে যায়— তারা মাছ খাচ্ছে। যে রেস্তোরাঁয় আমি গিয়েছিলাম সেখানে ইয়োরোপীয় ধরনের রান্না হয়, সামুদ্রিক মাছ তারা ব্যবহার করে, অতএব ভাবা গেলো যে তারা সেদ্ধ মাছ কাঁটা দিয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। বেড়ালের চোখের রঙ ছিলো ফিরোজা, তার শরীর ছিলো কালো, রঙের খেলায় চিত্রকরের মতো আমার চোখে একটা আত্মীয় রঙ উঠে এলো— নীল; লিখলাম— *একটি টেবিলে / ঘন নীল ন্যাপকিন কোলে পেতে দুই ব্যক্তি মিলে*— খাচ্ছিল ?— অবশ্যই তারা খাচ্ছিল, কিন্তু তা বলবার দরকার আছে কী ? চিত্র আর মিলের তাড়নায় কবিতার আবহের ভেতরে আমি এখন 'খাচ্ছিল' এড়িয়ে চলে যাই, যেতে চাই তাদের মানস-ভেতরে। আমি তো সেদিন সেই রেস্তোরাঁয় দেখেছি লোক দুটিকে কথা বলতে; কী তারা বলছিলো? স্মরণ হয়, দূর থেকে তাদের কথা বলবার ধরনে মনে হচ্ছিল চাপান-উতোরের একটা ব্যাপার চলছে; কী বিষয়ে চাপান-উতোরটি হতে পারে? সমাধান, যদি একে সমাধান বলা যায়, এনে দিলো এই পঙ্‌ক্তিটি— *সামুদ্রিক সেদ্ধ মাছ থেকে কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে;* 'ছাড়াতে'র জোড়ে ক-ক-এর মিল টেনে আনা গেলো 'বেড়াতে', লেখা গেলো— *পাল্লা দিয়ে বলছিলো কে কোথায় গিয়েছে বেড়াতে।*

এতদূর লিখে ফেলবার পর চুম্বকের টান অনুভব করি; খাতার দিকে তাকিয়ে দেখি ছ'টি পঙ্‌ক্তি লেখা হয়ে গেছে; পয়ার হয়েছে আঠারো মাত্রার; ক-ক-এর মিল বাজছে; নাটকীয় একটি পরিস্থিতির সংকেত অনুভব করা যাচ্ছে;— তবে কি এখানেই একে ছেড়ে দেব ? ফেলে রাখবো ? দেখাই যাক না, বেড়ানোর গল্পই যদি ওরা করছে তো ওদের চাপান-উতোরটা হতে পারে কোন কথা প্রতি-কথার টানে ? আবছা একটা ধারণাও কাজ করে স্তবক বিষয়ে; প্রথম স্তবক যদি ছ' পঙ্‌ক্তিতে হয়েছে, দ্বিতীয়টিও ছ' পঙ্‌ক্তিতেই ধরা যায় কিনা দেখা যাক। এবার কবিতা শুধু নয়, গল্পেরও যন্ত্র নড়ে ওঠে। একজনকে পাঠাই সুন্দরবনে, আরেকজনকে সিলেটে; তরতর করে দ্বিতীয় স্তবকের চারটি পঙ্‌ক্তি লিখে ফেলি; নিজের দেখা সিলেটের পাহাড় ফেটে জলধারা আর সুন্দরবনে হরিণের পাল ওদের ওপর আরোপ করি। এখনো আমি মিলের টানে

এগিয়ে যাচ্ছি, কবিতা লিখছি কিনা এখনো জানি না, *বেরোয় প্রপাত* লিখে প্রপাতের সঙ্গে মিল দিতে 'অকস্মাৎ' নড়াচড়া করে ওঠে, হরিণের অনুষঙ্গে বাঘের কথা খেলা করে, তবে হরিণের পালে বাঘই পড়ুক না কেন অকস্মাৎ!— *হরিণের পালে পড়ে বাঘ অকস্মাৎ।* কিন্তু আঠারো মাত্রার পয়ার, কম পড়ছে চার মাত্রা, অতএব একটা বিশেষণ দিই 'ডোরা কাটা'। বাঘ ডোরা কাটাই হয়, বিশেষণটি বলছে না নতুন কিছু, কিন্তু যুক্তি পেলাম এইতে যে রাতের জ্যোৎস্নার আলো আঁধারির ভেতরে 'ডোরাকাটা' কথাটা 'অকস্মাৎ'-এর সহযোগে বিদ্যুত চমকের মতো একটা ব্যাপার তৈরি করছে।

হোক তবে তাই। কিন্তু বেড়ালটা ? মাছের গন্ধে সে কি আছে স্থির ? তার কথা না লিখলে নয়; বেড়াল দিয়েই তো ছবিটার শুরু। লিখে ফেলা গেলো, *বেড়াল অপেক্ষা করে ভাগ্যে তার জুটবে কখন/ কাঁটা কানকো— ধৈর্যসীমা আছে তারও।* তারপর ? তারপর এখানেই থামা যেতো; ছবিটা ধরবার কথা ছিলো শব্দে, ধরেছি এবং ধরতে ধরতে একটা নাটকও তৈরি করে ফেলেছি। স্তবকও ছ' পঙ্‌ক্তিতেই শেষ করা গেছে, যদিও শেষ পঙ্‌ক্তিতে ছ'মাত্রা কম পড়ছে, ওটুকু সেরে নেয়া খুব কষ্টকর হবে না। কিন্তু তারপর ? এবার উঠে যাবো কলম বন্ধ করে ? ভেতরটা না-না করে ওঠে। লেখা শুধু লেখা তো নয়, কখনো তা খেলাও বটে— স্কোয়াশের চত্বরে দেয়ালে বল পাঠিয়ে বল পেটানোর মতো, বল একবার ফিরে এলে র‍্যাকেট সহ হাত উঠে আসবেই ফিরে চাপ মারবার মজায়। তাহলে দেখাই যাক না নাটকের ওপর আমিই বা কোন নাটকীয়তার চাপান দিতে পারি। যখন লিখছিলাম, সে সময়টা বিদ্যুত চলে যাচ্ছিল প্রায় প্রতিদিন; তবে এখানেও বিদ্যুত চলে যাক! গেলো বিদ্যুত আমার করোটিতে; এবং অন্ধকারটা ঝাঁপিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিহরণ হলো স্মরণ করে যে, আমরা আলোতে এক প্রকার, অন্ধকারে আরেক প্রকার; শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও, আলোতে আমরা যা আচ্ছাদিত করে রাখি, অন্ধকার এসে এক টানে তা উন্মুক্ত করে দিয়ে যায়। আমি লিখে যাই, *হঠাৎ তখন / চোখের পলকে বাতি নিভে যায় বিদ্যুত বিপাকে,* এবং লিখতে লিখতেই আমি বিপর্যয়টিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সিদ্ধান্ত নিই যে ক-ক মিল এই মুহূর্তের জন্যে আর নয়; মিলটিকেও নড়িয়ে দেয়া চাই; ক-খ-ক-খ মিল হোক তবে; তৃতীয় স্তবকের প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তির মিল পেলো সেই বিন্যাস।

ততক্ষণে দারুণ এক অস্থিরতা আমার ভেতরের সব বৃক্ষ দোলাতে শুরু করেছে। আমি টের পাই— এ শুধু একটা ছবি ধরে রাখা নয়, আমার একটা কথা আছে, সেই কথাটি বেরিয়ে আসবার পথ সন্ধান করছে এই ছবিটি মত্ত মাতাল হয়ে। কিছুদিন থেকে আমি বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম যে, কবিতায় আমি কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেছি যা অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচক ও সম্পাদকের আচ্ছাদিত দৃষ্টি এবং জনরবক্লিষ্ট পাঠকের দরুণ উপেক্ষা পেয়েছে; এ আমার ক্ষতি নয়, এ আমাদের সাহিত্য সংসারেরই ক্ষতি, কিন্তু এ কথা তো আমার বলবার নয়, আমি তো জানিই আমি কী এবং কতটুকু; তবু কি সময় হয় নি একবার এটি বলে ফেলবার ?

কেমন হয় যদি এই লোক দুটি, যারা রেস্তোরাঁয় বসে আহার করছে— যেমন আমি অনেক সাহিত্য-মূর্খের সঙ্গে করেছি, এবং এখনো করি, নিজের ভেতরটাকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে, সুশীল সামাজিকের অভিনয় করে— কী হয় এখন এদের একজনকে কবি আরেকজনকে সমালোচক কল্পনা করলে ?

এতক্ষণে আমি একটি কাজ পেয়ে যাই; কবিতাটিকে আমি কল্পনার ভেতরে প্রত্যক্ষ করে উঠি এবং জেনে যাই যে, যা ছিলো আমার ওপরস্তরে অজানা, আমার ভেতরস্তরে তা পুরো একটা চেহারা নিয়েই তৈরি ছিলো প্রকাশ্যে দেখা দেবার জন্যে।

আমি লোক দুটির বেড়ানোর গল্পকে অভিনয় বলে দেখি; বিদ্যুত চলে যাওয়া, অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়া, বেড়ালের টেবিলে লাফ ও মাছের প্রতি থাবা বিস্তারে ছুরি ডিশ পোর্সিলিনের ঝনঝন শব্দ, এদের সাহায্যে ওদের অভিনয়টা ভেঙে দিই। হঠাৎ উন্মোচিত ভেতরের জগতটাকে ধরবার জন্যে আমি বেড়ালের ডাক সৃষ্টি করি, বাঘের কথা সরাসরি উল্লেখ না করে শুকনো পাতার ওপরে বাঘের পদচারণার শব্দ শোনাই, সামুদ্রিক মাছটিও আমাকে সাহায্য করে। সমুদ্র, সৃষ্টির সূচনা যে অনন্ত জলরাশিতে, সেই জলটিকে আমি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ স্ফীত করে তুলি; সমুদ্রের লবণ মাখিয়ে আমি ওদের একজনার চুল বিদ্রোহী করে তুলি। সেই একজনাটি কে ? কবি ? না, সমালোচক ?

কবিতায় আমরা কাজ করি সংকেতে ও বিদ্যুতে; তাই উত্তরটা হলো এ রকম— *একজন কবি ছিল। অন্যজন কবিতা ক্রিটিক।* সমালোচক না বলে ক্রিটিক লিখলাম 'সঠিক' 'অধিক' 'নাগরিক'-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্যে নয়, মিলটা সুখ-আকস্মিক। 'ক্রিটিক' শব্দটি বাঙালিজনের বাগ্‌ধারায় যে তিরস্কার ও সমালোচনা বহন করে, ফলে এটি আর ইংরেজি শব্দ থাকে না, বাংলা শব্দই হয়ে যায়— ক্রিটিকের সেই অভিধায় শব্দটি আমি ব্যবহার করি।

এতক্ষণে আমি জানি, কবিতাটি আমার ভেতরেই ছিলো, ভেতরেই তার বীজ থেকে লতার জন্ম হয়েছিল, চাইছিলো একটা অবলম্বন; হঠাৎ দেখা রেস্তোরাঁর নির্জনতা, বেড়াল ও লোক দুটি ছিলো সেই অবলম্বনেরই বাঁশ বাখারি ও চালা।

কম্পিউটার যখন যুগ্মকবি

কবিতা লিখি, যেমন আমার অভ্যেস— প্রথমে খাতার পাতায় কলমে, তারপর কম্পিউটারে তাকে তুলি। কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করি কবিতাটি। একদিন এই রকমেই একটি কবিতাকে কম্পিউটারে আমি লিখে উঠেছিলাম। তখনো আমি এ যন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম-যোগ্যতার সবটুকু জেনে উঠি নি। নিতান্ত খেয়ালবশেই পুরো কবিতাটিকে আমি পর্দায় হাইলাইট করে টিপে দিই একটি বোতাম। এই বোতামটির কাজ হচ্ছে

অক্ষরের আদ্যাক্ষর বুঝে রচনার আগাগোড়া শব্দসকল চোখের নিমেষে নতুন করে সাজিয়ে ফেলা। অবাক হয়ে দেখি বোতাম টিপতেই ঘটে যায় এক ইন্দ্রজাল। দেখি, যে-কবিতাটি আমি লিখেছি তার একটি ভিন্নরূপ দাঁড়িয়ে গেছে। মূল কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা এবং সেটি প্রথমে ছিলো এই :

এই চৈত্রই ছিলো তবে সবচেয়ে প্রশস্তকাল ? একজন ও আমাদের জন্যে এই বৃষ্টিহীন গ্রাম্যচিত্রে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়েই ছিল তবে পথ ? এইসব হা-খোলা রক্তাক্ত গহ্বর প্রকাশিত প্রান্তরের ওপর দিয়েই তবে ধরা-যায়-না যে অনবরত দূরে সরে থাকা দিগন্ত, সেই দিগন্তের দিকেই আমাদের তবে শেষ উল্লম্ফন ?

আমরা প্রস্তুত ছিলাম— এমত বলা যাবে না; আবার যে একেবারে প্রস্তুতিহীন, এখন, পেছন ফিরে দেখি, তাও ঠিক নয়। এ এক প্রকার প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার ভেতর, ছায়া এবং আলোর মধ্যবর্তীস্থানে, জল এবং স্থলের ভেজা চুম্বনের দাগে, চিৎকার ও স্তব্ধতার অন্তবর্তী গর্ভাশয়ে— আমরা বাস করছিলাম অনেকদিন।

অনেকদিন; সে বড় দীর্ঘদিন; কিন্তু দীর্ঘ যখন বলি তখন হ্রস্বের ধারণাও তো ছিলোই; হ্রস্বতার ভেতর বেড়ে ওঠা রাষ্ট্র এবং গোলাপবাগানে, খর্বতার ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মাছের ঝাঁকে, অবনতের ভেতরে পা ছড়িয়ে বসে থাকা দুধখোলা রমণীদের যৌথ শীর্ণতায়— আমরা বড় বেশি মাতাল হয়ে যেতে যেতে এক সময় পেয়ে গিয়েছিলাম বিজ্ঞানের সকালবেলার এক টুকরো আলো, যেন আমাদের জননীর বুক ঢাকবার একফালি তেনা, ইলিশের জন্যে বেরিয়ে পড়বার নৌকো এবং জাল, রাষ্ট্রঘাতককে চাবকাবার জন্যে শংকর মাছের লেজ, আর গোলাপ থেকে আতর নিংড়ে নেবার জন্যে পেষণকল; সেই তেনা, নৌকো, জাল, শংকরের লেজ আর পেষণকলই ইতিহাসের দীর্ঘতার দিকে ছুড়ে দেয় আমাদের। এ যদি প্রস্তুতি হয়, তবে একে প্রস্তুতি বলেই গ্রহন কোরো।

অতঃপর একে একে বিদায় নিতে লাগলো আমাদের মধ্যে যারা করছিলো ইতঃস্তত, যারা করছিলো মগজ ও চিত্রকল্প ঋণ এবং যাদের শব্দের আঠায় জড়িয়ে যাচ্ছিলো অধর এবং ওষ্ঠ। কেবল তারাই হচ্ছিলো অগ্রসর যাদের পরণে ছিলো না একগজও সুতো, কিন্তু লজ্জিত ছিলো না নগ্নতায়, যাদের ভিক্ষাপাত্রে বারবার উড়ে এসে বসছিলো প্রজাপতি, জননীরা বিদায় নেবার পরও যারা তাঁদের ছায়াকে সঙ্গে রেখে হাঁটছিলো বদ্বীপের প্রসিদ্ধ এবং অখ্যাত সব জনপদের ভেতর দিয়ে সোনালি খড় ছাওয়া একটি কুটিরের দিকে।

হঠাৎ আকাশ বমন করে দিলো অন্ধকার; বৃষ্টি হবার কথা ছিলো; হঠাৎ সারস উড়ে গেলো ফিরে ফের; এখানেই তাদের বাসা করবার কথা ছিলো; আমরা তাকিয়ে দেখলাম আমাদের নিজেদেরই দিকে - এবং আমাদেরই ভেতর থেকে একজন আর নেই যে-ছিলো নৌকোর গলুইয়ের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে তীরের দিকে চোখ রেখে।

একজন ? এমনও একজন হয় কেউ কেউ, ইতিহাসে, হাজার বছরে, একজন, যার মধ্যে শতকোটির হয় সংকুলান। প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার মধ্যে তাকে আমরা সংবশে ও সস্বপ্নে দাউ দাউ পুড়তে দেখেছি, কিম্বা পুড়িয়েছি আমরাই বস্তুত; আর আমরা এখন সেই আগুনেই হাত সেঁকে নেবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছি প্রতিযোগিতায়, কিন্তু আমরা কি জানি, এই আগুনেও আমাদের হাত, এই হাত, এইসব হাত কী হিম ও বরফ ?

এই কবিতাটিকেই কম্পিউটার তার নিজের বিজ্ঞানবুদ্ধিতে শব্দ সাজিয়ে নতুন করে লিখলো এই :

ইলিশের জন্যে বেরিয়ে পড়বার নৌকো এবং জাল, রাষ্ট্রঘাতককে চাবকাবার জন্যে শংকর মাছের লেজ, আর গোলাপ থেকে আতর নিংড়ে নেবার জন্যে পেষণকল; এ এক প্রকার প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার ভেতর, ছায়া এবং আলোর মধ্যবর্তীস্থানে, এই চৈত্রই ছিলো তবে সবচেয়ে প্রশস্তকাল ? এইসব হা-খোলা রক্তাক্ত গহ্বর প্রকাশিত প্রান্তরের ওপর দিয়েই তবে ধরা-যায়-না যে অনবরত দূরে সরে থাকা দিগন্ত, সেই দিগন্তের দিকেই আমাদের তবে শেষ উল্লম্ফন ?

একজন ও আমাদের জন্যে এই বৃষ্টিহীন গ্রাম্যচিত্রে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়েই ছিলো তবে পথ ? একজন ? এমনও একজন হয় কেউ কেউ, ইতিহাসে, হাজার বছরে, একজন, যার মধ্যে শতকোটির হয় সংকুলান। প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার মধ্যে তাকে আমরা অতঃপর একে একে বিদায় নিতে লাগলো আমাদের মধ্যে যারা করছিলো ইতঃস্তত, যারা করছিলো মগজ ও চিত্রকল্প ঋণ এবং যাদের শব্দের আঠায় জড়িয়ে যাচ্ছিলো অধর এবং ওষ্ঠ। আবার যে একেবারে প্রস্তুতিহীন, এখন, পেছন ফিরে দেখি, তাও ঠিক নয়।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম আমাদের নিজেদেরই দিকে — এবং আমাদেরই ভেতর থেকে একজন আর নেই যে-ছিলো নৌকোর গলুইয়ের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে তীরের দিকে চোখ রেখে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম — এমত বলা যাবে না; আমরা বড় বেশি মাতাল হয়ে যেতে যেতে এক সময় পেয়ে গিয়েছিলাম বিজ্ঞানের সকালবেলার এক টুকরো আলো, যেন আমাদের জননীর বুক ঢাকবার একফালি তেনা, অবনতের ভেতরে পা ছড়িয়ে বসে থাকা দুধখোলা রমণীদের যৌথ শীর্ণতায় — অনেকদিন; সে বড় দীর্ঘদিন; কিন্তু দীর্ঘ যখন বলি তখন হ্রস্বের ধারণাও তো ছিলোই; হ্রস্বতার ভেতর বেড়ে ওঠা রাষ্ট্র এবং গোলাপবাগানে, খর্বতার ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মাছের ঝাঁকে, কিন্তু আমরা কি জানি, এই আগুনেও আমাদের হাত, এই হাত, এইসব হাত কী হিম ও বরফ ?

কেবল তারাই হচ্ছিলো অগ্রসর যাদের পরণে ছিলো না একগজও সুতো, কিন্তু লজ্জিত ছিলো না নগ্নতায়, যাদের ভিক্ষাপাত্রে বারবার উড়ে এসে বসছিলো প্রজাপতি,

সেই তেনা, নৌকো, জাল, শংকরের লেজ আর পেষণকলই ইতিহাসের দীর্ঘতার দিকে ছুড়ে দেয় আমাদের। এ যদি প্রস্তুতি হয়, তবে একে প্রস্তুতি বলেই গ্রহণ কোরো।

সংবশে ও সস্বপ্নে দাউ দাউ পুড়তে দেখেছি, কিম্বা পুড়িয়েছি আমরাই বস্তুত; আর আমরা এখন সেই আগুনেই হাত সেঁকে নেবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছি প্রতিযোগিতায়, হঠাৎ আকাশ বমন করে দিলো অন্ধকার; বৃষ্টি হবার কথা ছিলো; হঠাৎ সারস উড়ে গেলো ফিরে ফের; এখানেই তাদের বাসা করবার কথা ছিলো; জননীরা বিদায় নেবার পরও যারা তাঁদের ছায়াকে সঙ্গে রেখে হাঁটছিলো বদ্বীপের প্রসিদ্ধ এবং অখ্যাত সব জনপদের ভেতর দিয়ে সোনালি খড় ছাওয়া একটি কুটিরের দিকে।

জল এবং স্থলের ভেজা চুম্বনের দাগে, চিৎকার ও স্তব্ধতার অন্তবর্তী গর্ভাশয়ে— আমরা বাস করছিলাম অনেকদিন।

কম্পিউটারের এই রচনা, আমারই প্রত্যক্ষ রচনাকে বদলে দিয়ে। আমি এক নতুন ধরনের সৃষ্টিশীলতার সন্ধান যেন পেলাম এবং আরো একবার চাপ দিলাম ওই একই বোতামে। তৎক্ষণাৎ আমার কম্পিউটার আমারই নির্দেশে আরো একটি রূপ রচনা করলো এই :

ইলিশের জন্যে বেরিয়ে পড়বার নৌকো— এ এক প্রকার প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার ভেতর, এ যদি প্রস্তুতি হয়, তবে একে প্রস্তুতি বলেই গ্রহণ কোরো। এই এবং আমাদেরই ভেতর থেকে একজন আর নেই যে-ছিলো নৌকোর গলুইয়ের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে তীরের দিকে চোখ রেখে।

এবং অখ্যাত সব জনপদের ভেতর দিয়ে সোনালি খড় ছাওয়া একটি কুটিরের দিকে। এবং জাল। এমনও একজন হয় কেউ কেউ, ইতিহাসে, হাজার বছরে, একজন, যার মধ্যে শতকোটির হয় সংকুলান। একজন ও আমাদের জন্যে এই বৃষ্টিহীন গ্রাম্যচিত্রে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়েই ছিলো তবে পথ? একজন?

আবার যে একেবারে প্রস্তুতিহীন, এখন, পেছন ফিরে দেখি, তাও ঠিক নয়। আমরা তাকিয়ে দেখলাম আমাদের নিজেদেরই দিকে—আমরা প্রস্তুত ছিলাম— এমত বলা যাবে না; আমরা বড় বেশি মাতাল হয়ে যেতে যেতে এক সময় পেয়ে গিয়েছিলাম বিজ্ঞানের সকালবেলার এক টুকরো আলো, আর আমরা এখন সেই আগুনেই হাত সেঁকে নেবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছি প্রতিযোগিতায়।

হঠাৎ আকাশ বমন করে দিলো অন্ধকার; বৃষ্টি হবার কথা ছিলো; অবনতের ভেতরে পা ছড়িয়ে বসে থাকা দুধখোলা রমণীদের যৌথ শীর্ণতায়— অনেকদিন; কিন্তু আমরা কি জানি, এই আগুনেও আমাদের হাত, এই হাত, এইসব হাত কী হিম ও বরফ?

প্রস্তুতি ও প্রস্তুতিহীনতার মধ্যে আমরা অতঃপর; একে একে বিদায় নিতে লাগলো আমাদের মধ্যে যারা করছিলো ইতঃস্তত, যারা করছিলো মগজ ও চিত্রকল্প ঋণ এবং যাদের শব্দের আঠায় জড়িয়ে যাচ্ছিল অধর এবং ওষ্ঠ।

রাষ্ট্রঘাতককে চাবকাবার জন্যে শংকর মাছের লেজ, আর গোলাপ থেকে আতর নিংড়ে নেবার জন্যে পেষণকল; যেন আমাদের জননীর বুক ঢাকবার একফালি তেনা, কেবল তারাই হচ্ছিলো অগ্রসর যাদের পরণে ছিলো না একগজও সুতো, কিন্তু লজ্জিত ছিলো না নগ্নতায়, যাদের ভিক্ষাপাত্রে বারবার উড়ে এসে বসছিলো প্রজাপতি,

সে বড় দীর্ঘদিন; কিন্তু দীর্ঘ যখন বলি তখন হ্রস্বের ধারণাও তো ছিলোই; হ্রস্বতার ভেতর বেড়ে ওঠা রাষ্ট্র এবং গোলাপবাগানে, খর্বতার ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মাছের ঝাঁকে, সেই তেনা, নৌকো, জাল, শংকরের লেজ আর পেষণকলই ইতিহাসের দীর্ঘতার দিকে ছুড়ে দেয় আমাদের।

তাকে সংবশে ও সস্বপ্নে দাউ দাউ পুড়তে দেখেছি, কিম্বা পুড়িয়েছি আমরাই বস্তুত; হঠাৎ সারস উড়ে গেলো ফিরে ফের; এখানেই তাদের বাসা করবার কথা ছিলো; জননীরা বিদায় নেবার পরও যারা তাঁদের ছায়াকে সঙ্গে রেখে হাঁটছিলো বদ্বীপের প্রসিদ্ধ ছায়া এবং আলোর মধ্যবর্তীস্থানে, জল এবং স্থলের ভেজা চুম্বনের দাগে, চিৎকার ও স্তব্ধতার অন্তবর্তী গর্ভাশয়ে— আমরা বাস করছিলাম অনেকদিন।

চৈত্রই ছিলো তবে সবচেয়ে প্রশস্তকাল ? এইসব হা-খোলা রক্তাক্ত গহ্বর প্রকাশিত প্রান্তরের ওপর দিয়েই তবে ধরা-যায়-না যে অনবরত দূরে সরে থাকা দিগন্ত, সেই দিগন্তের দিকেই আমাদের তবে শেষ উল্লম্ফন ?

তিনটি রচনাই বারবার পাঠ করে দেখতে পেলাম, আমার কাছে তিনটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রহণযোগ্য কবিতা। প্রথমটির রচয়িতা আমি এবং অপর দুটির রচয়িতা আমি একা নই, আমি এবং আমার যন্ত্র। এমন একটি সময় হয়তো কবির আয়ত্বে এখনই এসে গেছে অথবা আসা সম্ভব যখন কবিতা লিখবে একা কবি নয়, কবি ও তার কম্পিউটার— যুগলে। আমি এখন বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ যে, কবি ও যন্ত্রের এই যুগল-সৃষ্টিশীলতা একদিন না একদিন কবিতা লেখার মাননীয় একটি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে।

কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে ছবিতা

হয়, এটা হয়, অনেকের হাতেই হয়েছে— কবিতার পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান একটি ছবি আঁকা। ফরাসি কবি অ্যাপোলিয়েনর একসময় মেতে উঠেছিলেন এ ধরনের কবিতা লেখায়। এর একটা নামও দেয়া যেতে পারে কবিতা আর ছবি মিলিয়ে— ছবিতা! অ্যাপোলিয়েনরের একটা নমুনা হাজির করি; তাঁর বৃষ্টি পড়ছে ছবিতার কিছুটা বাংলায় লিখে/এঁকে দেখাই :

বৃ তু
ষ্টি মি
প ও
ড় বৃ
ছে ষ্টি
যে র
ন ম
না ত
রী ঝ
দে রে
র যা
ক ছ
ষ্ঠ জী
স্ব ব
র নে
স্মৃ র
তি বি
র ন্দু
ভে বি
ত ন্দু
রে আ
শ্চ
র্য
সা
ক্ষা
ত

মুক্তিযুদ্ধের সময় কবিতার এই দৃশ্যরূপ রচনা আমার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো; কবিতায় শুধু বক্তব্যই নয়, বক্তব্যের একটা ছবিও তার অক্ষরগুলোয় ধরে

উঠে আমি তখন মুক্তি পেতাম আমার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে। তখন যে ক'টি ছবি/কবিতা লিখেছিলাম তার তিনটি আমার প্রতিধ্বনিগণ বইয়ে আছে; তার মধ্যে গেরিলা কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের ওপর কবিতার একাধিক সংকলনে স্থান পেয়েছে। পিস্তল নিয়ে যে কবিতাটি তখন লিখেছিলাম পিস্তলেরই আকারে, সেইটে এখানে দেখানো যেতে পারে :

এই এক
সংক্ষিপ্ত সরল নল ইস্পাতের জ্বলজ্বল করে
বস্তুত যা কিছু দেখি
এশিয়ায় আফ্রিকায়
অদ্ভুত ম্যাজিকে
যেন হয়ে যায়
পিস্তল পিস্তল

তারপর বহুদিন আর এদিকে চোখ ফেরাই নি। কবিতার জন্যে ছবির আকার রচনা করাটাও একেবারেই জরুরি মনে হয় নি— কেবল কিছুকাল খেলাচ্ছলেই কয়েকটি লিখেছিলাম/এঁকেছিলাম, ভোরের কাগজ পত্রে প্রকাশও করেছিলাম বটে কিন্তু সংকলিত করবার তো নয়ই, সংরক্ষণ করবারও ইচ্ছে হয় নি আমার। কেন হয় নি ? এটি বুঝে দেখবার জন্যে একদিন নিজেই নিজের একটি নোট নিয়ে বসি। সেই নোটে দেখি আমি একটি দীর্ঘ কবিতার কথা ভাবছিলাম।

কবিতাটিতে বাংলার দূর অতীতের সকল উপকথা, ইতিহাস, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছিলাম আমাদের এই বর্তমান। তারপর একদিন এর একটি বীজ এসে পড়েছিলো আমার করোটির ভেতরে— বীজটি এমত : উপকথার সকল উজ্জ্বল রঙে শোভিত লিপ্ত রাজা মহিপালের রাজধানী, আর সেই রাজধানীর অদূরেই, এক খরস্রোতা নদীর ওপারেই দৃশ্যমান এক লোকশূন্য উৎসন্ন দুর্ভিক্ষের গ্রাম, গ্রামটিতে অশথ গাছের তলায় অনাহারী মানুষেরা বসে আছে; এইই, এবং এর বেশি কিছু ছিলো না বীজটিতে; কিন্তু এ নিয়ে কবিতা হয় না, এখনো হয় না— কেবল চিত্রই যথেষ্ট নয় কোনো কবিতার জন্যে, চিত্রের ভেতরে গতি চাই, যে-কোনো কবিতারই আবশ্যিক একটি উপাদান হচ্ছে এই গতি, যে-গতি অনবরত চলাচল করে সময়ের ত্রিকাল ধারনার ভেতরে; অতঃপর বহুদিন ঘুমিয়ে থাকে আমার ভেতরে ওই বীজটি; ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু আমাকে বিচলিত করে রাখে প্রতিটি মুহূর্ত; আমি যা কিছুই করি না কেন, যা কিছুই লিখি না কেন, সকল কাজ ও লেখার ভেতরে ওই চিত্রটি আমাকে অনবরত পাশ ফেরাতে থাকে, আমার ভেতরে চাপ অনুভব করি, সে চাপ হয় নির্গমনের।

তারপর একদিন বসে যাই কলম নিয়ে; বেরিয়ে আসে প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, সে এই রকম :

চারদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে;
শাঁখের শব্দের মতো করাত নিয়ত,
প্রান্তরে মিছিল নামে ছেঁড়া চট— অদ্ভুত সন্ন্যাসীদল
বুড়ো এক অশথের তলে ডেরা নেয়,
অকস্মাৎ তাড়িত জলের ছিটে;
পৃথিবীর গর্ভথলি শিহরায়, নক্ষত্রের শিষ।

দীর্ঘ একটি বৎসর কেটে যায়; ওই ছ'টি পঙ্‌ক্তি পড়ে থাকে; আমি অগ্রসর হতে পারি না। তারপর একদিন ময়নামতির শালবনে বিহারের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলাম; বিদ্যুতচমকের মতো আমার সমুখে ঝলসে ওঠে এক দৃশ্য : রাজা মহিপাল যেনবা ভোরে স্নান শেষে কৌশিক বস্ত্র পরিধান করে প্রজাদের দর্শন দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সমুখে কৃশদেহ এক ব্যক্তি— অনেকটা গ্রীক নাটকের কোরাস নেতার মতো— নিবেদন করছে প্রজাসকলের পীড়ন-কথা। সে নিবেদন করছে, কিন্তু যেমন উদ্ধত নয় তার ভঙ্গি তেমনি নয় বিনীত; রাজাকে সে সম্বোধন করছে রাজা হিসেবে নয়, পদধূলি চুম্বন করে নয়, মেরুদণ্ড সোজা করে, মাটির অন্তঃস্থলের কণ্ঠ হিসেবে, রাজাকে এই মাটির সেবক-প্রধান হিসেবে 'মহাশয়' বলে। দ্রুত আমার অতিথিশালায় ফিরে এসে তখন লিখে ফেলি সেই বৎসরকাল আগে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলোর অবলম্বনে :

মহাশয়, সে রাতে নক্ষত্র ছিল, চাঁদ ছিল সাপের ঝাঁপিতে।
ব্রহ্মপুত্রজলে নেমে আপনি তখন,
স্নান করছেন;
চারদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে;
শাঁখের শব্দের মতো করাত নিয়ত;
এদিকে প্রত্যহ আমরা পিতা ও মাতাকে
শ্মশানের চিতায় তুলছি আর কবরে নামাচ্ছি;
আপনার রাজত্ব থেকে বিদ্যালয়, কৃষি উঠে গেছে;
ভাতের সে কেমন ঘ্রাণ একেবারে ভুলে
প্রান্তরে মিছিল নামে ছেঁড়া চট— অদ্ভুত সন্ন্যাসীদল,
বুড়ো এক অশথের তলে ডেরা নেয়,
শতাব্দীর ছাইগাদা ও বিষ্ঠায় জড়াজড়ি করে;
পৃথিবীর গর্ভথলি শিহরায়, নক্ষত্রের শিষ।

এবার মনে হয়, কবিতার বীজটি বৃক্ষে পরিণত হবার জন্যে এখন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। দৈব প্রেরণায় আমি বিশ্বাসী নই; আমাদের ভেতর থেকে, চেতনার গভীর স্তর থেকে, অতীতের চিন্তা-অবলেপগুলোই উঠে আসে বস্তুত, যা আমরা দৈবের দান বলে ভুল করে থাকি। পরদিনই এ কবিতার এখনো না-লেখা প্রথম স্তবকটি আমি করোটির ভেতরে প্রত্যক্ষ করে উঠি আক্ষরিক অর্থেই পাশ থেকে তীর্য্যক চোখে দেখা এক স্বর্ণকলসের আকারে। কেন ? আমি আমার সেই কবিতা/ছবি লেখার কথা স্মরণ করে উঠি এবং নিরীক্ষার ঝোঁকেই ভাবি— দেখাই যাক না, অক্ষর ও পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের ফলে সৃষ্ট স্বর্ণকলসের ওই আকারটিই আমাকে সাহায্য করে কিনা সময়ের অতীত ও বর্তমানের রূপাভাস নির্মাণে। অচিরে আমি লিখে ফেলি :

মহাশয়, সে রাতে নক্ষত্র ছিল,
চাঁদ ছিল সাপের ঝাঁপিতে।
ব্রহ্মপুত্রজলে নেমে
আপনি তখন,
স্নান করছেন;
চারদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে;
শাঁখের শব্দের মতো করাত নিয়ত;
এদিকে প্রত্যহ আমরা পিতা ও মাতাকে
শ্মশানের চিতায় তুলছি আর কবরে নামাচ্ছি;
আপনার রাজত্ব থেকে বিদ্যালয়, কৃষি উঠে গেছে;
ভাতের সে কেমন ঘ্রাণ আমরা তো একেবারে ভুলে
চোখের গোটার মতো ঘাসবীজ দাঁতে কেটে কেটে,
চাল থেকে পচাখড় গবাদি পশুকে পেড়ে টেনে ছিঁড়ে
খাইয়ে খাইয়ে, তারা কি মানুষ তাই নির্বিবাদে খাবে ?
হাম্বারব করে ওঠে; অবশেষে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে নামি,
প্রান্তরে মিছিল নামে ছেঁড়া চট— অদ্ভুত সন্ন্যাসীদল,
কেউ কেউ উলঙ্গ বটে, নিজগুণে ক্ষমা করবেন,
আপনার প্রসিদ্ধ নগর থেকে ঠিক বাইরেই
বুড়ো এক অশত্থের তলে ডেরা নেয়,
শতাব্দীর ছাইগাদা ও বিষ্ঠায়
জড়াজড়ি করে;
অকস্মাৎ তাড়িত জলের ছিটে;
পৃথিবীর গর্ভথলি শিহরায়, নক্ষত্রের শিস।

এবং ওই একই টানে লিখে ফেলি দ্বিতীয় স্তবকটি— এবার আর স্বর্ণকলসের আকারে নয়, স্বর্ণ পিলসুজ হয়ে ওঠে সে :

অদূরেই শেয়াল দু'চোখে জ্বেলে বণিকের নৌকোর লণ্ঠন
রাজত্বের গূঢ়দেশে অন্ধকারে ছিল হামা দিয়ে;
শীর্ণস্তন খসে পড়ে সেই দণ্ডে, মহাশয়,
আমাদের সন্তানের মুখ থেকে,
হিসহিস শব্দে ভরে যায়—
অতিদ্রুত ভরে যায়—
সকল সড়ক,
অট্টালিকা,
গোলা
আপনি তার
কিছুই কি অবগত
নন ? এ কেমন করে হয় ?
আমরা তো আপনারই প্রজাকুল।
আপনার ক্ষেতে শষ্য করে থাকি বটে,
মাঝে মাঝে যুদ্ধেও যেতে হয় আপনার হুকুমে,
আসলে হুকুম ভিন্ন আপনার রাজত্বে কি কিছু হয়ে থাকে ?
আমরাও ধরে নিই, এই জেগে ওঠা হয় আপনারই ইঙ্গিতে আসলে।

কিন্তু অবিলম্বে আমারই চোখে ও মননে কি কৃত্রিমই না দেখায় এই স্তবক দুটি। কবিতা শব্দ নিয়েই— শব্দই তার চিত্র, তার গতি, তার সঙ্গীত। সেই শব্দেই যদি বলা না গেলো, তবে বাইরের একটা ছবির আকার দিয়ে কি পূরণ করা যাবে গতি সঙ্গীত ও চিত্রের ফাঁক ? স্মরণ করে উঠি একাত্তর সালের কথা। তখন যে পিস্তল, মাছ আর গেরিলার দৃশ্যরূপ রচনা করেছিলাম কবিতার অক্ষরের শরীরে, সে ছিলো এমন একটা সময় যখন আক্ষরিক অর্থেই আমি ছিলাম ভাষাহারা। সেই কালে হয়তো বা যথার্থই ছিলো কবিতার অক্ষরে ছবিকেও ধরা; কিন্তু সে তো এক অস্বাভাবিক সময়ের ইতিহাস, গণহত্যার ঘোর আতংকিত সময়ের কলম তখন। অস্বাভাবিক অবস্থাই জন্ম দিতে পারে কবিতা/ছবি অর্থাৎ ছবিতা। প্রেমের মুহূর্তে মানুষ যে ফুলের আকারে লিখে দেয় আমি তোমাকে ভালোবাসি, এক অর্থে সেও তো স্বাভাবিকতার উর্ধ্বেই এক পরিস্থিতি।

অতএব আমার এ জায়মান কবিতাটিকে আমি লাশকাটাঘরে ফেলে রাখি। এ নিয়ে আমার আর অগ্রসর হওয়াটা বাতুলতাই মনে হয়েছে।

একদা এক রাজ্যে এবং গদ্যছন্দ

তেইশ বছর বয়সে লেখা আমার এই কবিতা— 'একদা এক রাজ্যে'— এই নামটি বহন করেই প্রকাশিত হয়েছিলো আমার প্রথম কবিতার বই; আজ পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পাই— এই রচনাটি থেকেই শোনা যাচ্ছে কবিতায় আমার নিজস্ব কণ্ঠের প্রথম উচ্চারণ; নিজস্ব— এর বক্তব্যে ও অস্তিত্ব অবস্থানে; নিজস্ব– এর চিত্রকল্প বিন্যাস পদ্ধতি ও গদ্যছন্দ প্রয়োগে। কবিতাটি প্রথমেই পড়ে নেয়া যাক।

ওটা ছিল পার্কে যাবার রাস্তা; আর
যা আমাকে পেয়ে বসেছিল তা রোদন;
তুমি মনে করো, যদি মনে থাকে, সেই ছেলে তিনটের কথা
উলঙ্গ, উৎসর্গ ধুলায় যারা জননীর, যারা
তখন হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল আমার তিনটে পয়সার জন্যে;
আমি তখন প্যান্টের পকেটে হাত রেখে
— যা বলতে পারিনি—
বানাতে পারছি না কান্নার বিরোধী বর্ম;
বাতাসে ফুলে উঠছে ফুসফুস,
আমি সেই বাদাম তোলা জাহাজের মতো অচেনা সমুদ্রে;
তুমি ওভাবেই পছন্দ করলে বিদায়।

সিঁড়ির শেষধাপে যদি দাঁড়াতে, দাঁড়াতে পারতে;
আর তোমার পেছনে থাকত সূর্য, সূর্যের আভা, সে আভায়
যদি শিথিল হয়ে আসত ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ধুলোয় দীর্ঘ থামগুলো;
জ্বলতো, পুড়তো ছাইদানে ধূপ;
সঞ্চিত হতো রাত;
ছড়াতো, ছড়িয়ে পড়তো, তোমার মুখের মতো তাল তাল সৌরভ;
ওদিকে রাত্রি তার কনকনে হাওয়ায় চিৎকার করে বলত—
'এসো এই কবোষ্ণ গর্তে';
কিন্তু আমরা সৃষ্টি করি আমাদের মৃত্যুকে
আর জীবনকে ফেলে রাখি বিপজ্জনক বাতাসে;
তোমার বিদায় ছিল এ ভাবেই।

তখন কি জানি কিসের জীবন্ত উল্লাসে জেগে উঠতে চেয়েছিল
জানালায় জনকের মুখ।
— দরোজায় নিঃশব্দ টোকা— দেখলাম
দেয়ালে আলো দিচ্ছে তাঁর হাতের সাঁড়াশি
যেন একটা মাছ।

দাঁতটা তুলতে হবে— ব্যথা করবে না—
না— না—
গরমের সকালে আমি চোখ বুঁজে অপেক্ষায় কাঁপছি
বারান্দায়, কাল রাতেও অন্ধকারে
যেখানে নড়ে উঠেছে স্বপ্নের ঘোড়া।

সরে দাঁড়ায়নি দেয়াল,
আমার পিঠের সঙ্গে হয়ে উঠেছে শরীর;
তোমার পেছনে ছিল দালান, দ্রুত মোটর,
স্টেডিয়ামের মোড়। বিজ্ঞাপন বাতির নৃত্যে
তোমার পাথরের মুখ আরেকটি অবশ্য অংশ—
আমি কি দেখেছি তোমাকে তোমার বিদায়ে?
প্রতিহত তীব্র ধ্বনির মতো একটা জগৎ ছিল
যা গেছে;
জেগে উঠবো, আবার, এভাবে, তোমাকে বিদায় দিতে
একদা এক রাজ্যে ॥

কবিতাটি প্রেম বিষয়ক হলেও, নারী এখানে নারী শুধু নয়; আমাদের যা কিছু সম্পূর্ণ করে তোলে, উন্নত করে তোলে, অগ্রসর করিয়ে দেয়, সব ও সব কিছুই সে। এর রচনাকাল যদি স্মরণে রাখি, তাহলে দেখবো সে ছিলো এমন এক সময়– ১৯৫৮— যখন আমরা এই ভূমিতে ক্রমাগত পিষ্ট হতে হতে এক বিকট গহ্বরে পতিত হয়েছি; আমাদের সমস্ত শ্রেয়োবোধ ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে; আমি অসহায় বোধ করছি, নষ্টে আমি নিক্ষিপ্ত হচ্ছি, অশ্রু আমাকে প্লাবিত করছে, আমি জানছি যে আমি ভেঙে ও ভেসে যাবো। কিন্তু না, এটিই শেষ কথা নয়; আমি রক্তবীজ পাখির মতো আবার জেগে উঠবো ভস্ম থেকে, আবার জন্ম নেবো, এবং আবার হারাবো, আবার হবো, ও আবার পরিণত হবো ভস্মে– চক্রাকারে আমি ফিরে ফিরে আসবো। এই কথাটি *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-তেও বলা গিয়েছিলো আরো এক দশক পরে, আরো পতন ও বিধ্বংস দেখে ওঠার পর।

কিন্তু এ কবিতায় এ সকল কথা বলা হয়েছে একটি ভালোবাসার গল্পে; সেই ভালোবাসা অকস্মাৎ প্রত্যাখ্যাত ও বিনষ্ট; কিন্তু তাতে শোক নেই, কারণ আমি জানছি ওই বিদায় ও বিচ্ছেদকালেই যে, আবার আমি ফিরে আসবো, আবার ভালোবাসা হবে, আবার আমি অশ্রুতে প্লাবিত হবো, এবং আবারো আমি ভালোবাসবো, হোক তা কেবলই বিদায় দিতে। লক্ষ করা যাবে, বিচ্ছেদ ও শোকের মুহূর্ত স্থাপনাতে এ কবিতার বক্তা দাঁড়িয়ে আছে তার ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে; উচ্চারণে খেদ আছে, ভেঙে পড়া নেই; এতটাই সে নিজের পায়ের ওপরে যে, তার এই বলে ওঠা স্পষ্ট কণ্ঠে, *জেগে উঠবো, আবার, এভাবে, তোমাকে বিদায় দিতে / একদা এক রাজ্যে*; দৃষ্টি তার

অশ্রুআবিল, কিন্তু এতটা নয় যে পরিপার্শ্ব চোখে পড়ছে না তার, বরং অধিকই চোখে পড়ছে— ভিকিরি বালকদল, দালান, মোটর।

কবিতাটি এখন যখন আবার আমি পড়ি, আবিষ্কার করি— প্রেমের ও জীবনের প্রতি এই দৃষ্টি ও অনুভব আমি অন্য কোনো কবিতায় পাই নি বলেই কবিতাটি লিখে ফেলি। যদি কারো চোখে পড়ে না থাকে তো, অগত্যা আমাকেই বলে দিতে হয় যে, বাংলা কবিতায় প্রেমের প্রতি এই বিশেষ কোণ থেকে দৃষ্টিপাত এর আগে দুর্লক্ষ— এমনকি, রবীন্দ্রনাথের 'মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে' সত্ত্বেও। আমার এ বিশ্বাসের কথা বহুবারই বলেছি, যে, একজন তখনই লেখেন যখন তিনি দেখতে পান তাঁর বলবার কথাটি কোথাও তিনি এমত আর খুঁজে পাচ্ছেন না।

কবিতাটিতে চারটি চিত্র স্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু থাকে নি শারীরিক অর্থে কেবলি তারা চিত্র, দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণনার পাশাপাশি বা পরেপরেই খুব সচেতনভাবে আনা হয়েছে ভেতর-ভূগোল; যেমন, প্রথম দুটি স্তবকেই— পার্কের দিকে চলে যাবার কথা বলেই রোদনের কথা বলা, এবং দুটিকে মিলিয়ে দেয়া 'ছিল' শব্দটি দিয়ে— 'ওটা ছিল পার্কে যাবার রাস্তা; আর / যা আমাকে পেয়ে বসেছিল তা রোদন'; কিম্বা দ্বিতীয় স্তবকে 'জ্বলতো, পুড়তো ছাইদানে ধূপ'-এর পরেপরেই 'ছড়াতো, ছড়িয়ে পড়তো, তোমার মুখের মতো তাল তাল সৌরভ' এবং এভাবে ধূপ ও মুখ, ধোঁয়া ও মুখাকৃতির বদল-প্রতিবদল; তৃতীয় স্তবকে দৃষ্টিগ্রাহ্য দাঁত তোলা সাঁড়াশি থেকে বারান্দার দেয়ালে প্রতিসরিত আলোর ভেতরে মাছ কল্পনা, এবং সেই বারান্দায় স্বপ্নে দেখা ঘোড়াকে ফিরে আনা; বা, শেষ স্তবকে বিদায়ের রঙ্গমঞ্চটি বর্ণনা করতে করতে প্রশ্ন করে ওঠা, 'আমি কি দেখেছি তোমাকে, তোমার বিদায়ে ?' আর তৎক্ষণাৎ বলে ফেলা, যে-জগতে আমি তোমাকে পেয়েছিলাম সে ছিলো 'প্রতিহত তীব্র ধ্বনির মতো একটা জগৎ', এবং এই 'প্রতিহত' এই 'তীব্র' এই দুটি বিশেষণে প্রস্তাবিত হলো যে-অনুভব তা কবিতাটির শেষ পর্যায়ে, দৃষ্টির সীমানা ত্যাগ করে শ্রুতির জগতে দৌড়ে গেলো, জগতটাকে— যে জগতে এই নাটক অভিনীত হলো ও বারবার অভিনীত হবে— শেষ পর্যন্ত একটা 'ধ্বনি' স্বরূপে ধরা হলো; হয়তো এই ধ্বনির ভেতরে আমরা শুনলেও শুনতে পাবো সৃষ্টির প্রথম ওঁংকার।

আমার আরো একটি কাজ শুরু হয়েছিলো এই কবিতায়— কবিতার ছন্দ হিসেবে আমি গদ্যস্পন্দনকে খুব সচেতনভাবে গ্রহণ করতে শুরু করি এই কবিতাটি থেকে। আমার কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানবেন, আমার কবিতা লেখার শুরু থেকেই যা কিছু বলবার কথা তার বিশেষ ভাব-অবস্থান বিচারে 'গদ্য'কে প্রধান একটি ছন্দ হিসেবে নির্ণয় করে নিয়েছি— এমনকি পয়ারে লিখলেও, এমনকি *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-র প্রাচীন প্রথাসম্মত চোদ্দমাত্রার পয়ারেও আমি গদ্যস্পন্দনই ধরতে চেয়েছি; বা কখনো কখনো, যদিও আমার এ সকল কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়, স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের ছন্দেও গদ্যস্পন্দনই ছিলো আমার অভিষ্ট।

যত কবিতা এ যাবত আমি লিখেছি, ফিরে তাকিয়ে দেখি তার অনেকগুলোই 'গদ্য'-এ লেখা, এ গদ্য আমার গল্প-উপন্যাস বা নিবন্ধের গদ্য নয়, এ কবিতার গদ্য;

কবিতার প্রতিমায় আমি গদ্যেরই ওষ্ঠ্য রচনা করেছি। ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, *প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা— গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।*

কিন্তু গদ্যের প্রতি আমার এই পক্ষপাত এসেছে রবীন্দ্রনাথের মসলিন-বয়ন, বুদ্ধদেব বসুর শৌখিন পর্যটন, বা সমর সেনের ভাঙনবোধের অনুসৃতি বা অনুকৃতি হয়ে নয়; এসেছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে অভিজ্ঞতার ভেতরে আমি বর্ধিত তারই সংক্ষোভ ও স্বপ্নভঙ্গের রূঢ় বাদনধ্বনির 'ছন্দ' হিসেবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নিতে পারি : একজন কবিতা লিখতে পারেন কিন্তু তিনি 'কবি' নন যদি না তাঁর কবিতায় তাঁর কালের 'ধ্বনি' থেকে নিষ্কষিত 'ছন্দ'টি আমরা শুনতে পাই।

কিন্তু অসুবিধের একটা দিক হচ্ছে, কবিতার পাঠক ও আবৃত্তিকারেরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন প্রচলিত ছন্দ-স্পন্দনে, এবং আরো, তাঁরা প্রথাবিহিত চিত্রকল্প রূপকল্পের প্রতিও পক্ষপাতী থাকেন— কারণ, এ সবই 'সহজে বোঝা যায় ও বোঝানো যায়'। আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, *অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য— কোনখানে তাদের মূলগত মিল ? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়ের সাধনার লক্ষ্য।... গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।... পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা।*

কয়েকটি খসড়ার পর একটি কবিতা

আমার কবিতায় বারবার প্রত্যাবর্তনকারী একটি প্রতীক হচ্ছে 'কবি-কবিতা'। এ প্রতীক সচেতনভাবে প্রথম এসেছিলো, অথবা আমিই লিখতে লিখতে, ভাঙাচোরাভাবে ব্যবহার করতে করতে, এর পূর্ণ শরীর ও উপস্থিতি সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়েছিলাম *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* লিখে ফেলবার পর। ওই বৈশাখের তিরিশ বছর পরেও 'কবি-কবিতা' প্রতীকটি কীভাবে আমাকে দিয়ে এখনো লিখিয়ে নেয় তার একটা বিবরণ দেয়া যাক।

আমার অভ্যেস কবিতা লেখার সেই প্রথম দিনটি থেকে— অনবরত কাগজে টুকে রাখি হঠাৎ পাওয়া কোনো ছবি, পঙ্‌ক্তি, শব্দ, শব্দ-জোড়; পরে সেইসব নিয়ে বসি, ভাবি, আপাত বিচ্ছিন্নের ভেতরে একটা ভাব সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করি। কখনো একটি কবিতা বেরিয়ে আসে, কখনো কাটাকুটিই সার হয়। সেদিন হঠাৎ ওই রকম একটি পঙ্‌ক্তি চোখে পড়লো, খাতার এক কোণে, অন্তত বছর দশেক আগে টুকে রেখেছিলাম : *ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে মুমূর্ষু এক চাঁদ।* বাক্যটি সম্পূর্ণ, চিত্রটি স্পষ্ট, এবং এর ভেতরে ছন্দটাও কানে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে; এই ছন্দ ধরেই লিখে ফেলা যায় পরপর কিছু পঙ্‌ক্তি, কিন্তু সে লেখার ভেতর দিয়ে আমার বলবার কথাটা কী— সেটা কিন্তু এখনো একেবারেই কল্পনা করতে পারছি না।

বাক্যটি নিয়ে বসি; বারবার জিহ্বায় উচ্চারণ করি, দোলা অনুভব করি, ছন্দের কম্পনে একটা ঘোর তৈরি হয়; সেই ঘোরের ভেতরে আবিষ্কার করি, বাক্যটি এতটাই সম্পূর্ণ যে এই এক পঙ্‌ক্তিতেই এটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে টান দিচ্ছে না পরের পঙ্‌ক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। মুহূর্তে বদলে দিই প্রথম তিনটি শব্দ, লিখি : *নদীর বুকে আছাড় খায় মুমূর্ষু এক চাঁদ।*

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি দরোজা খুলে যায়; নদীর বুকে মুমূর্ষু চাঁদ আছাড় খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছলকে ওঠে নদীর জল, অন্ধকারও যেন মুমূর্ষু চাঁদটির আলোয় সপ্রাণ ও সচল হয়ে ওঠে, পরবর্তী পঙ্‌ক্তি তরতর করে আমি লিখে যাই : *জলের কিনার কামড়ে ধরে অন্ধকারের দাঁত।*

এই 'দাঁত' শব্দটি কি 'চাঁদ'-এর সঙ্গে মেলাবার জন্যেই উঠে এলো ? তা হয়তো হবে; হোক। অনেক সময় মিলের টানে এমন শব্দের সাক্ষাতে আমরা পৌঁছে যাই যা একটি চিত্রকল্প হয়ে জ্বলে ওঠে; এবং এ দৈবের খেলা নয়, এ হচ্ছে মিলের হঠাৎ আলোকসম্পাতে উদ্ভাসিত একটি ক্রিয়া— কবিতা লেখার কাজে তুমুল আনন্দটির প্রধান এই আকস্মিক উদ্ভাসন— ঘটনা পরম্পরা থেকেই আমরা পেয়ে থাকি।

পঙ্‌ক্তিটি লিখে ফেলবার পর আমি সেই কিনার কামড়ে ধরা অন্ধকারের ভেতরে নিজেকে অনুভব করে উঠি যে, আমার কোথাও যাবার ছিলো, এবং এই যাবার জন্যেই নদীটির কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি এক হিংস্র অন্ধকার কালে। অতঃপর সহজেই লিখে ফেলি : *নৌকো ছিলো। নৌকোটা কই ? জল ছলছল করে।*

এবার ? তাহলে ? ফিরে যাবো। ওপারে যাবো না ? ও পার ? ও পার মানে কী ? বুকের ভেতরে বাড়ি, সেই বাড়িটিই কি ওপারে নয় ? কে আমাকে ওপারে আমার বাড়িটিতে যাবার উপায় করে দেবে ? পরের পঙ্‌ক্তিটি তখন নদীর পাড়ে ভুতুড়ে পরিবেশটাকেই ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে আসে, একদা দেখা মরা ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে বিস্তীর্ণ কাশবন স্মরণ হয়, লিখি : ডাকে তখন শরের বন প্রেতের কণ্ঠস্বরে। এবং সেই ডাকটি যে ভাষা চায়, বাক্য চায়, তাকে এভাবে আমি শুনে উঠি : *ও কবি তুই আমার সঙ্গে আয় চালাবি তাঁত।*

এবার পঙ্‌ক্তি পাঁচটির দিকে তাকাই।

নদীর বুকে আছাড় খায় মুমূর্ষু এক চাঁদ।
জলের কিনার কামড়ে ধরে অন্ধকারের দাঁত।
নৌকো ছিলো। নৌকোটা কই? জল ছলছল করে।
ডাকে তখন শরের বন প্রেতের কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই আমার সঙ্গে আয় চালাবি তাঁত।'

তখন আমার চোখে পড়ে, বাড়ি যাবার জন্যে নদীর পাড়ে অন্ধকারে যে লোকটি এসে দাঁড়িয়েছিলো, তাকে আমি কবি বলেই কল্পনা করেছি। এবং আমার দৃষ্টি পড়ে, 'কবি-কবিতা' প্রতীকটি আবার আমার ভেতরে কাজ করছে, ওই প্রতীক আমাকে দিয়ে আরো একটি কবিতা লিখিয়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু কবি তো আমার কবিতায় সেই ব্যক্তির প্রতীক যে সুস্থতায় স্থিত হতে চায়, উর্ধে উড্ডীন হতে চায় সঙ্গীতধ্বনির মতো, যে নিঃসঙ্গ তবু অগ্রসর হয়ে চলেছে বিরূপ বিরুদ্ধ কালের ভেতর দিয়ে মানব-স্বপ্নের মানচিত্র হাতে।

বর্তমানের বাস্তবতা আমি ভুলে যাই না; সেই বাস্তবতাকে করোটিতে রেখে, আমি লিখে চলি পরবর্তী পাঁচটি পঙ্‌ক্তি, এবং এতক্ষণে আমার ভেতর-মিস্ত্রি বলে দিয়েছে যে, পরবর্তী স্তবকও পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতেই এসে যেতে হবে প্রথম স্তবকটির বিন্যাস ও মিল অনুসরণ করে; লিখে ফেললাম :

একটি লোক থমকে পড়ে হঠাৎ রাস্তায়।
যাবার জন্যে বেরিয়েছিলো অঘোর সন্ধ্যায়।
পত্র ছিলো। পত্রটা কই? বাতাস হা হা করে।
ডাকে তখন শরের বন প্রেতের কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই পথ হারালি? আমার সঙ্গে আয়।'

কিন্তু মোটেই তৃপ্তিকর হলো না ব্যাপারটা। স্তবকটি লিখে ফেলবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো, এর ভেতরে অনেকগুলো ফাঁক রয়ে গেছে। পত্র? কিসের পত্র? কার পত্র? উত্তর দিতে পারলাম না। যাকে কবি বলে সম্বোধন করিয়েছি প্রেতের কণ্ঠে, সে হঠাৎ শাদামাটা 'লোক'-এ পরিণত হয়ে গেলো এটাই বা কেমন? আর পথ হারাবার কথাই যদি হয়, সে সংবাদ দ্বিতীয় স্তবকে দিলাম কেন? এবং, আরো গুরুতর, পথ কি সত্যি সত্যি সে হারিয়েছে? সে তো নদীর পাড় পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছেছে; এখন সমুখে শুধু নৌকোটি তার নেই— এই তো!

মনটা বিমর্ষ হয়ে গেলো; মনে হলো, এ কবিতার কোনো সম্ভাবনা নেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবার। তবু চেষ্টা করে যেতে হয়। একেবারে শেষ অবধি না দেখে হাল ছেড়ে দেয়া কর্তব্য হবে না। ভাবতে ভাবতে, পত্রের একটা সংকেত পেলাম। এমন কি হতে পারে না, পত্রটি কোনো নিমন্ত্রণের? কার নিমন্ত্রণ হতে পারে?

স্মরণ হলো, কবিতায় আমি মাঝে মাঝে বাংলার পাল বংশের আদি রাজা গোপালের কথা বলেছি, নৈরাজ্যে ভরা বাংলাদেশে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন গোপাল, সেই গোপালের অভিষেকটিকে আমি সুসময়ে প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হিসেবে বহুবার কবিতায় ব্যবহার করেছি। ভাবলাম, পত্রটি গোপালের অভিষেকে উপস্থিত থাকবার নিমন্ত্রণপত্র হিসেবে দেখলে কেমন হয়? কেমন হয়, যদি কল্পনা করি সেই নিমন্ত্রণে বেরিয়েছিলেন কবি। এমনও মনে পড়লো, ওই যে নৌকোর কথা বলা হয়েছে প্রথমে, সেই নৌকোটিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি প্রতীকে পরিণত বহুদিন থেকে। রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করি; কেবল বাংলাদেশের নয়, দুর্ভাগা প্রতিটি দেশের। মানুষ স্বপ্ন দেখে মানবিক জীবনের, সংগ্রাম করে, কিন্তু স্বপ্ন তার দুঃস্বপ্নে পতিত হয় বারবার।

আমি পরবর্তী স্তবকটি লিখে ফেলি, আগের মিল ও বিন্যাস অনুসরণ করে, এবং কলমের অভিজ্ঞতা থেকে ভেতরে ভেতরে জেনে যাই এটিই হবে এ কবিতার— যদি একে কবিতাই হতে হয় তো— শেষ স্তবক। লিখি :

আজ গোপালের অভিষেকে ছিলো নেমতন্ন।
অনেকদিনের পরে যদি ভাগ্যে জোটে অন্ন।
স্বপ্ন ছিলো। স্বপ্নটা কই? স্বপ্ন চিতায় চড়ে।
ডাকে তখন শরের বন প্রেতের কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই আমার সঙ্গে আয় হবি আজ গণ্য।'

গণ্য! না, না। এ শব্দটি আমি লিখতে চাই নি, ওই 'নেমতন্ন' আর 'অন্ন' এ দুটির সঙ্গে মিল দিতে গিয়েই যে লিখে ফেলেছি 'গণ্য', এটি আমার চোখে অবিলম্বে ধরা পড়ে; ধরা পড়ে, শব্দটি শুধু এ ক্ষেত্রে আরোপিতই নয়, একেবারে অর্থহীন ও প্রসঙ্গহীন। কার সঙ্গে সে গণ্য হবে? প্রেতের সঙ্গে? কবিও তবে প্রেত হয়ে যাবেন? এ যে আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

আমি তাকিয়ে দেখি তিনটি স্তবক, তিনটি স্তবকের পনেরোটি পঙ্‌ক্তি; সখেদে দেখতে পাই— কবিতাটি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো হয়েছে; প্রথম স্তবক এখন তিনটি স্তবকের পরম্পরায় ফেলে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, বলবার কথাটি পরিষ্কার না বুঝে নিয়েই কাগজে অক্ষরপাত করা হয়েছে, এবং হাতড়ে হাতড়ে অগ্রসর হওয়া গেছে। হ্যাঁ, কবি আছে, কবি যে আমার কবিতায় বারবার প্রতীক হয়ে এসেছে সেই প্রতীকেরও একটা আভাসও আছে, কিন্তু বর্ণনায় সঙ্গতি নেই, অন্তর্গত নাটক নেই, কোনো কোনো অংশ সমতল ও দুর্বল, অপ্রাসঙ্গিকতা আছে, বাহুল্য আছে; এমনকি কোনো নবীন কবিও যা করবে না— নিছক মিল দেবার জন্যেই শব্দ লিখেছি অন্তত দুটি জায়গায়— দ্বিতীয় স্তবকের প্রথমে : রাস্তায় ও সন্ধ্যায়, তৃতীয় স্তবকের শেষে : নেমতন্ন, অন্ন ও গণ্য।

অচিরে সম্পূর্ণ পাতাটির ওপর কাটাচিহ্ন দিয়ে আমি খাতাটি মুড়ে রাখি। আশা করা গিয়েছিলো এ একটি কবিতা হয়ে উঠবে; হলো না; পুরো পাতাটি বাতিল করে পরের শাদা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আছি— মাঝেমাঝেই, সকাল থেকে সন্ধে অবধি। আছি একটি গ্রামে; বাইরে বিশাল আকাশ; শীতের ঘোর কুয়াশা— সেও যেন খাতার শাদা পৃষ্ঠা। তাকিয়ে আছি শাদা পৃষ্ঠার দিকে তো বটেই, কিন্তু করোটি নয় শাদা শূন্য; দুটি স্থির বিষয় আমাকে এখনো মাতিয়ে রাখছে একটি কবিতার জন্যে; জানি, সে অপেক্ষা করছে কোথাও— আমারই ভেতরে।

ওই দুটি বিষয়ের একটি হচ্ছে জায়মান কবিতাটির রূপ-শরীর। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, কবিতাটি যদি এসেই যায়, তবে সে আসবে পাঁচটি পঙ্‌ক্তির একেকটি স্তবকে, মোট তিনটি স্তবকে; অন্ত্যমিলের দিক থেকে তার প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি হবে এক ধ্বনির, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটি হবে আরেক ধ্বনির— ক-ক-খ-খ-ক, এই বিন্যাসে। আরেকটি বিষয়ও স্থির বলেই কবিতা-রক্তের প্রবাহে জানি : কবিতাটির প্রথম খসড়ায় যে 'ও কবি' সম্বোধন আছে, সেইটি নিয়েই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে; সম্বোধনটিকে চাবি বলেছি, এই চাবিটি নিয়েই অতঃপর তাহলে কাজ করা যাক।

অচিরেই প্রথম খসড়া থেকে বর্জন করি রাজা গোপালের উল্লেখ ও তার ভাবমণ্ডলটিকে; কবি-তেই থাকি স্থির। স্মরণ করি, কবি এখন পথভ্রান্ত, তার কলম বিমূঢ়। তাঁকে আশা দেবে কে ? কে আমাদের সমুখে অগ্রসর করায়, অতীত যদি না করায় ?— আমি বাংলা ভাষার পূর্বগত কবিদের কল্পনা করে উঠি। জানি, এখনো এ কবিতা নয়, তবু করোটির ভেতর থেকে ওই তাকে অক্ষরে না ধরেও এখন আমার নিস্তার নেই; কারণ, এই হচ্ছে আমার অভ্যেস— চিন্তাগুলোকে একবার অন্তত লিখে দেখা, যাতে বর্জন করতে পারি চোখে দেখার আলোতেই। আমি লিখে ফেলি : শব্দগুলো আছাড় খায় অঘোর স্তব্ধতায়। কোন শব্দ ? কবিতার শব্দ। কবি লিখতে লিখতে দেখে উঠেছে, তার শব্দসমূহ ক্রমশ অর্থহীন অব্যয় ধ্বনিতে পরিণত। জানি, কবিতা হচ্ছে না, তবু কথাগুলোকে মুক্তি দেবার জন্যেই লিখে ফেলি পরের পঙ্‌ক্তি : একটি লোক থমকে গেছে হঠাৎ রাস্তায়। দুর্বল পঙ্‌ক্তি হলো; হোক! লিখতে চাই নি 'লোক'— তবু লিখলাম। 'রাস্তা'টিও কিছু বলছে না, এসেছে কেবল 'স্তব্ধতায়'-এর মিলের টানে; আসুক। অতঃপর :

পত্র ছিলো। পত্রটা কই ? বাতাস হা হা করে।
ডাকলো তখন শরের বন চণ্ডীদাসের স্বরে—
'ও কবি তুই পথ হারালি ? আমার সঙ্গে আয়।'

পত্র কিসের পত্র ? এটা তবে রাজা গোপালের অভিষেকের নেমতন্নের পত্র যে লিখেছিলাম প্রথম খসড়ায়, তারই স্মৃতিকণা। আর ওই প্রথম খসড়ার 'পরীর কণ্ঠস্বর'-এর বদলে এবার লিখেছি একজন কবির স্বরের কথা, 'চণ্ডীদাসের স্বর'।

চণ্ডীদাস কবিকে ডাক দিচ্ছেন — 'আমার সঙ্গে আয়।' কোথায় নিয়ে যেতে চান তিনি কবিকে ? এই তো সেই চণ্ডীদাস যিনি বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— তিনি তবে সেই মানুষের কাছেই নিতে চান পথভ্রান্ত এবং স্তব্ধতায় পতিত কবিকে ? তাহলে পরের স্তবকে আরো অতীতে যাই না কেন ?— চর্যাপদের দূর অতীতে ? লিখি : *চর্যাপদের পাঠ হবে আজ, ছিলো নেমতন্ন।*

দেখা যাচ্ছে, গোপালের অভিষেকে নেমতন্নের কথা এখনো ভুলি নি! নেমতন্ন ঠিক রেখে তার প্রসঙ্গটা বদলে নিয়েছি মাত্র— চর্যাপদের পাঠ আসরে কবির ছিলো নেমতন্ন। বেশ তো, সে নেমতন্নই হোক। লক্ষ করি, একটা সময় যাচ্ছে অনেকদিন থেকে যখন আমরা বাংলা কবিতার শেকড় থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, যখন আমরা আর বাংলার জীবন ও নিসর্গ থেকে, বাঙালির পুরান ও ইতিহাস থেকে কবিতার রূপকল্প চিত্রকল্প নির্মাণ আর করছি না; তাই চর্যাপদের পাঠ আসরে নেমতন্ন পেয়ে আমার কবিতার এই কবি আশা করছে : *অনেকদিনের পরে যদি ভাগ্যে জোটে অন্ন।* কিন্তু সন্দেহ হয়, বাংলা ও বাঙালির যে-কবিতা হওয়া উচিত ছিলো— এইখানে আমি কেবল কবিতার কথা ভাবছি না আর, তারচেয়েও বড় পরিসরে ভাবছি আমাদের ইতিহাস চেতনার কথা— কবিতার পাঠকের কথা যে ভাবছি, সে শুধু কবিতারই পাঠক মাত্র নয়, সে বাঙালি, আজকের এই ইতিহাস বিস্মৃত বাঙালি। তাই কলম এখন অক্ষরপাত করে :

পাঠক ছিলো। পাঠক কই ? পাঠক চিতায় চড়ে।
ডাকলো তখন শরের বন চন্দ্রাবতীর স্বরে—
'ও কবি দ্যাখ, বাংলাভাষার কাব্য সোনার বন্ন।'

কবি চন্দ্রাবতীর উল্লেখে, তাঁর নারীকণ্ঠে রূপকথার ভাষার ছোঁয়া আনি 'বর্ণ'কে 'বন্ন' লিখে। কিন্তু চন্দ্রাবতীই বা কেন এলেন এখানে ? ময়মনসিংহ গীতিকার কবিগণের মধ্যে চন্দ্রাবতী অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর— সেই সূত্রেই কি ? নাকি, যেমন পাঠকের বেলায় চেয়েছি হোক সে বাঙালিরই বর্ণনা, তেমনি চন্দ্রাবতীও কেবল কবি হিসেবে এখানে নন, তিনি এসেছেন তবে বঙ্গজননীর রূপে ?

আমি বলেছি আগেই, স্থির ছিলো আমার মানসে, যে, কবিতাটি যদি হয়ই, তবে হবে তিন স্তবকে, একেক স্তবকে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে। এখন শেষ স্তবক লেখার অপেক্ষা। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি, দ্বিতীয় এই খসড়ায় গোড়াতেই একটি ভুল করেছি। ভুলটি হচ্ছে— কবিতাটিকে ভেতর-ব্যক্তির কোণ থেকে কল্পনা করা হয় নি; এবং কবিতা তো সব সময়ই ভেতর-ব্যক্তির উচ্চারণ বলেই আমার আজীবন বিশ্বাস। যে-খসড়াটি এখন আমার সমুখে, এর দুটি স্তবক লিখে ফেলবার পরপরই দেখলাম, দৃষ্টিকোণ যদি পালটে না নিই তাহলে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যদি কবিতাটিকে করোটি থেকে নামাতেই হয়, আমাকে তবে হতে হবে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী এবং অধিক সাংকেতিক।

আরো একবার আমি খাতার পাতায় খসড়াটি কেটে দিয়ে পাতা ওলটাই।

কিন্তু আমি ভুলতে পারি না সেই মুহূর্তের কথা, যখন আমি প্রথম স্তবকে প্রথম 'ও কবি' সম্বোধনটি লিখেছিলাম; লিখেছিলাম মোটেই সচেতন না থেকে; কিন্তু লিখে ফেলবার পর এখন আর কিছুতেই তার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছি না। আমি জানি, এই সম্বোধনটিই আসলে এ কবিতার— যদি এ কবিতাটি অতঃপর হয়েই ওঠে— তার চাবি। এই চাবি দিয়েই আমাকে দরোজা খুলতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার আমি কাটা পাতাটিকে টেবিলে রেখে স্থির হয়ে বসি। এবং লিখে ফেলি :

স্তম্ভিত হাত প্রবেশ করে গভীর স্তব্ধতায়।
পথিক ওঠে ত্রস্ত হয়ে অঘোর সন্ধ্যায়।
পত্র ছিলো। পত্রটা কই? বাতাস হা হা করে।
ডাকল তখন শরের বন পরীর কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই পথ হারালি? আমার সঙ্গে আয়।'

ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে মুমূর্ষু এক চাঁদ।
গ্রামের কিনার কামড়ে ধরে অন্ধকারের দাঁত।
নৌকো ছিলো। নৌকোটা কই? জল ছলছল করে।
ডাকল তখন শরের বন পরীর কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই আমার সঙ্গে আয় চালাবি তাঁত।'

শব্দ-মাকু তীক্ষ্ণ দু'মুখ গর্ভে সুতো তার।
টানাপোড়েন জীবন যাপন এমন নগ্নতার।
স্বপ্ন ছিলো। স্বপ্নটা কই? চোখ টলটল করে।
ডাকল তখন শরের বন পরীর কণ্ঠস্বরে—
'ও কবি তুই বয়ন করিস বস্ত্র কবিতার।'

এবং এই প্রথম আমার মনে হয়— করোটির অন্তর্গত কবিতাটিকে একটি শরীর দান করা গেছে যা আমার জন্যে তৃপ্তিকর। কবিতায় যে সংকেত কাজ করে, প্রতীক যে সংবাদ বহন করে, ছন্দ যে চলন রচনা করে এবং স্তবক-স্থাপত্য যে বাসযোগ্যতা দান করে— আমি অনুভব করে উঠি তা সকলই সাধিত হয়েছে এবার। এবং এইই হচ্ছে কবিতাটি যে তিনটি খসড়ার কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রে হয়েছে স্থাপিত।

কবি কিনা প্রতিমাশিল্পী

একজন কবি : তিনি তাঁর সময়ের প্রতিমাশিল্পী। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যান শব্দ, ছন্দ এবং পূর্বগণের শস্যপ্রসবী করণকৌশল; কিন্তু এ সকল তিনি এদের অবয়বমূল্যে গ্রহণ করেন না; বলা যায়, করতে পারেন না— যদি তাঁকে তাঁর নিজের কবিতাটি লিখতে হয়; তিনি তাঁর সময়কে দৃষ্টির যে কোণ ও ব্যক্তিত্ব-পাটাতন থেকে দেখেন ও সেই দেখার ভেতর থেকে তাঁর যে বলবার কথাটির চাপ অন্তঃস্থলে অনবরত তিনি অনুভব করে ওঠেন, সেই কোণ-ব্যক্তিত্ব-চাপ তাঁকে দিয়ে একটা মৌলিক কাজ করিয়ে নেয় কবিতাটি লিখে ফেলবার আগেই; তিনি তাঁর ভাষার প্রতিটি শব্দকে তার কৌমার্যে আবিষ্কার করে নেন, তাঁর ভাষার কবিতা-ছন্দের নতুন আপন চাল ও মেধা নির্ণয় করে নেন— এবং এ সবই তাঁকে করতে হয় তাঁর সময়ের বাস্তবতায় স্নাত হয়ে, একমাত্র তাঁরই নিজস্ব বিশিষ্ট অনুভবে প্রসাধিত হয়ে উঠে; একই সময়ে একই বাস্তবতা অবলোকন করে দু'জন কবি, যদি তাঁরা প্রকৃতই কবি হন, একই কালে এক রকম কবিতা লেখেন না।

কিন্তু ওই যে বলেছি— কবিকে একজন 'প্রতিমাশিল্পী', ওই 'প্রতিমা' শব্দটির প্রচলিত ব্যঞ্জনা কারণে মনেই হতে পারে এক স্থির স্নিগ্ধ মূর্তির কথা; কিন্তু না; 'প্রতিমা' শব্দটি আমি রূপনির্মাণের দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি ধারক হিসেবে ব্যবহার করেছি; আর, প্রতিমা তো কেবল স্মিতদুর্গা নন, করালকালীও বটে, কখনো কখনো ভগ্ননাসা স্ফিংকস কিম্বা শেয়ালমুণ্ডু মানবধড় মিশরীয় কোনো দেবতা; এমনকি, শ্মশানের হাঁড়ি, বেহুলার কলার ভেলা, রামকিংকরের ভাস্কর্য 'কংকালীতলার পথে'।

আমি আমার সময়ের ও অস্তিত্বের বাস্তবতাকে দেখেছি, আমার কবিতার সেই শুরু থেকেই, চূর্ণিত আকারে; বলেছি তা চূর্ণিত দর্পণ, বলেছি টুকরোগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণধার; আরো বলেছি, টুকরোগুলো অনবরত আমি মুঠোয় তুলে নিচ্ছি, মুঠোয় চেপে ধরছি, করতল রক্তাক্ত হচ্ছে, কিন্তু ফেলে দিচ্ছি না বা ফেলে দিতে পারছি না; যা বলি নি— আমার কবিতার ভেতর দিয়ে সেই রক্তধারার বয়ে যাওয়া, টসটস করে পড়তে থাকা, বাস্তবতার টুকরোগুলোকে এই রক্তের আঠায় স্থাপনায় আনা একটি মোজাইকে, এটি লক্ষ না করে বুঝি আমার কবিতা-চেষ্টাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।

সতেরো আঠারো বছর বয়সেই শুরু হয়েছিলো আমার কবিতা-ভেতরে বাস্তবতার চূর্ণিত টুকরো নিয়ে মোজাইক রচনার এই প্রক্রিয়াটি, দীর্ঘদিন কবিতা লেখা এবং এখনো লিখে যাওয়ার কালে তার করণ পালটেছে বটে— সেটাই স্বাভাবিক— কিন্তু ধরন পালটায় নি। আমার কাব্যসূচনার প্রায় চার দশক পরে লেখা কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশ করা গিয়েছিলো *নাভিমূলে ভস্মাধার* নামে একটি বই; সেই কবিতাগুলোতে দেখছি আমার সময়ের বাস্তবতারই চূর্ণিত চিত্রগুলো, এবং এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমি টুকরোগুলোকে গ্রথিত করছি, সাজিয়ে নিচ্ছি, রক্তের আঠায়

সেঁটে নিচ্ছি একেকটি মোজাইকে। এ ক্ষেত্রে করণ পালটেছে এই যে, আমি দেখতে পাচ্ছি এর একেকটি কবিতা একেকটি ক্ষুদ্র মোজাইক বটে, আবার সবগুলো মিলে, ওই বত্রিশটি কবিতা মিলে রচনা করেছে বড় মাপের একক একটি মোজাইক। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এই বইটিতে কবিতা-করণের নতুন একটি দিক : আমি একটি কেন্দ্রীয় ভাব-কল্পনা থেকে, মূল একটি চিত্রকল্প নিয়ে, একটানা বত্রিশটি কবিতা লিখে গেছি বিরতিহীন, কোনো কোনো দিন তিন এমনকি চারটি কবিতা। তবে এইটিও একেবারে নতুন ও প্রথম আমার বেলায় তা ঠিক নয়, যদি মনে রাখি যে, আমার প্রথম বয়সের কবিতারা যে আছে *একদা এক রাজ্যে* ও *বিরতিহীন উৎসব-এ*, তারা শেষ পর্যন্ত একটি সংগমে পৌঁছেছে *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য় এসে। বলা যাবে, *নাভিমূলে ভস্মাধার* কবিতামালায় আমার যাত্রা ছিলো এমত যে, একটি কেন্দ্র থেকে অগ্নিবাজির মতো চতুর্দিকে ওরা উৎক্ষীপ্ত হয়েছে, আর *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য় চতুর্দিকে উৎক্ষীপ্ত অগ্নিবাজি এসে ক্রমেই একটি কেন্দ্রে অবতীর্ণ হচ্ছে, যেন কেন্দ্রই অবিরাম তাদের শুষে নিচ্ছে।

কেন্দ্রের দিকে এই অভিগমন যখন আমার নিজের কাছেই হয় আবিষ্কৃত তখন একদিন আমার ভেতরে দেখতে পাই কবিতার সম্পূর্ণ নতুন একটি চাপ ও নির্গমন কাতরতা; তখন এক সারাদিন ব্যাপী উন্মত্ত মগ্নতার ভেতরে লিখে ফেলি *অস্তিত্ব পথিক আমি* শিরোনামে একটি কবিতা এবং অনুভব করি একটি পর্যায় অতিক্রম বা একটি বাঁক বদলের ধাক্কা চলছে ভেতরে ভেতরে। অনায়াসে তখন দেখতে পাই চূর্ণিত বাস্তবতার টুকরোগুলো করতলে কীভাবে পিষ্ট করে জন্ম দিচ্ছি কবিতার, কীভাবে তাদের ভেতরে চলছে কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপ ও কেন্দ্রে অবতরণের ব্যাপারটি। উনিশ শ' উনসত্তরে লেখা *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-র প্রায় আটশো পঙ্‌ক্তি উচ্চারণের পর, সমস্ত প্রশ্ন, প্রকৃতি ও আত্মব্যবচ্ছেদের পর এই ভাবে, কেন্দ্রীয় উপলব্ধির বিন্দুতে অবতীর্ণ হই যে :

পিঙ্গল জটায়
স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাবো আমি,
স্মৃতির সাগরে। জন্মে জন্মে বারবার
কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায়।

এবং এর পঁচিশ বছর পরে লেখা *নাভিমূলে ভস্মাধার* কবিতামালার কেন্দ্রীয় কবিতাটি কবিসংঘের প্রতি শুরুই হচ্ছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে :

উড়ে গেছে পদ্যপরী আমাদের বিশ্বনাথ গ্রাম থেকে নাকি ?
জরি চুমকি ঘাগরা গহনা সব শ্যাম-ভূমে ফেলে ?
পদচিহ্নটুকু নেই! তবে কি সে পরী নয় ? ভুত ?
বাঙালির ঘাড় ধরে কাব্যকলা করিয়ে নিয়েছে ?
রবীন্দ্রনাথের মতো কবি তবে খেটেছেন ভুতের বেগার ?

আর এই প্রশ্ন-কেন্দ্র থেকেই উৎক্ষীপ্ত হতে থাকছে বত্রিশটি কবিতা। এবং এই চাবির পরে, আমাদের পক্ষে দেখে নেয়া সম্ভব হবে আমার কবিতা-করণের একটি অভ্যন্তর; বস্তুত, করণই আমাদের কবি-মুখ রচনা করে; এই করণের কারণেই একই সময়ের দু'জন কবি একরকম কবিতা লেখেন না। আমরা ভ্রান্তি ও মরুভূমিতে পড়ে যাই তখনই, যখন আমরা কবিতার একটি রূপে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি ও সেই কারণে অপর সকল কবিতাকে কবিতা বলে চিনে উঠতে অক্ষম হই।

বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা : কবি ও কবিগণ কিভাবে

একসময় আমার এমন একটা সময় আসে যখন কবিতা আর লিখছি না; কবিতাকে যে একেবারে ভুলে গিয়েছি তাও নয়— এলোমেলো অনুবাদ করতে থাকি ইংরেজি কবিতা ও ইংরেজির মাধ্যমে অন্য ভাষার কবিতা। খুব একটা বাছাই করে, পরিকল্পনা করে অনুবাদ, তাও নয়। এ যেন হাতুড়ি ও ছেনি তৈরি রাখা, তৈরি রাখা পেশিবল; কিন্তু পিটবো যে তেমন ইস্পাতখণ্ড সমুখে দেখতে পাচ্ছি না, গড়বো যে তেমন প্রস্তরই বা কই ?

তারপর সেই বৈশাখের দিন আসে; ১৩৭৬ সনের বৈশাখ। দিনটির কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে— মঞ্জু আমার স্ত্রী গেছেন তাঁর চাকুরিস্থলে, শিশুকন্যা বিদিতাকে আমি সকালের দুধ খাইয়ে জামা পালটিয়ে ছেড়ে দিয়েছি জাহাজের ডেকের মতো বারান্দায় আমার তখনকার গ্রীন রোডের দোতলার ফ্ল্যাটে। খুব বড় একটা টেবিল ছিলো আমার, তারই একপ্রান্তে চেয়ার টেনে কলম কাগজ নিয়ে বসেছি কিছু একটা অনুবাদ করবো, গত রাতে একটা ছোটগল্প লেখা গিয়েছিলো— তার পাতাগুলো পাশে নড়ছে হাল্‌কা হাওয়ায়, নেরুদার একটা বই খুলে বসেছি, কবিতাও একটা ঠিক করেছি ভাষান্তর করবার জন্যে, হঠাৎ ভেতরটা থমথম করে উঠলো। কী হলো, আমি শাদা কাগজ টেনে লিখে ফেললাম নিজেরই দুটি লাইন :

বহুদিন থেকে আমি লিখছি কবিতা,
বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা।

এবং এক মুহূর্তের ব্যবধানে একটি প্রশ্ন করে উঠলাম নিজেকেই :

অথবা এই কি সত্য কোনোদিন আমি
লিখি নি কবিতা পূর্বে, পরে, বর্তমানে ?

প্রশ্নটি করবার পরে পরেই, স্পষ্ট মনে আছে, বিদিতা হঠাৎ ছুটে এসে আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে আদুরে গলায় জানতে চায়, 'বাবা, আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি ?' 'না, নাতো, মা।' বলতে বলতে, মেয়েটিকে বাঁ হাতে সামলাতে সামলাতে আমি ডান হাতে ততক্ষণে লিখে চলেছি :

তাহলে একে কি বলি ? এই যা লিখেছি
শোকগ্রস্ত জননীর মতো ?

অর্থাৎ, এই যে এতকাল আমি কবিতা লিখেছি— একে আমি কী বলবো যদি না কবিতা বলি ? এবং সে কেমন লেখা, কেমন তার উচ্চারণ ? শোকগ্রস্ত জননীর মতোই কি নয় ? কোন্ সে জননী ? এ কি সেই জননী যাকে আমি সম্বোধন করে ইতোপূর্বের শেষ কবিতা একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু লিখেছিলাম শুরুতেই এই বলে :

হে জননী
তোমার প্রশংসা-গাথা রচনায় আমি আজ আগ্রহী আবার।

জননী তবে আমিই স্বয়ং ? নাকি, আমার যে-জননী, এই মাটি, মাটির এ ইতিহাস, এই গোষ্ঠি, এই জন, সেই জননীর কণ্ঠে যে বিলাপ আমি অন্তর্গত অভ্যন্তরে এতকাল শুনেছি, সেই বিলাপই কি ছিলো আমার কবিতার রূপ বস্তুত ?

এতটুকু লিখবার পর তাকিয়ে দেখি পঙ্‌ক্তিগুলোর দিকে; লক্ষ করি দুটি বিষয় : এক, আমি চোদ্দ অক্ষরের প্রাচীন পয়ারে কথাগুলো লিখেছি, কিন্তু সে পয়ারে আমি শুনতে পাচ্ছি গদ্যস্পন্দন, দেখতে পাচ্ছি প্রবন্ধের বাঁধন-ধরন। আমি আরো অনুভব করি, প্রথম যে-দুটি পঙ্‌ক্তি, তা একটি অবস্থার বর্ণনা বটে, আবার একই সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ চূড়ান্ত উচ্চারণও বটে। তবে ওই যে তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ধারায় চতুর্থে এসে আমি করেছি প্রশ্ন, 'তাহলে একে কি বলি ?' ওটাই আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছে জোয়ারের জলে, টানের বানে; এখন আমি এগিয়ে যেতে পারি আমারই কবিতা-স্তব্ধতা ও সময়-অনুভব নিয়ে।

এই এগিয়ে যেতে যেতেই অতঃপর এগারোটি দিনে— একটানা এগারো দিন লেগেছিল এ দীর্ঘ কবিতাটি লিখতে— আমি কবি-কবিতাকে একটির প্রতীক করে তুলি। এবং এ কবিতায় কবি-কবিতা যে প্রতীক হয়ে উঠেছিলো তারই ধারাবাহিকতায় শামসুর রাহমানের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে লেখা কবিতায় যখন আমি ধ্রুবপদের মতো বলেছি : *দীর্ঘ হোক আপনার জীবন, ত্বরান্বিত হোক মানবের স্বপ্নসমূহের অনুবাদ*— তখন আমি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, মানবের স্বপ্নসমূহের অনুবাদককেই আমি [illegible] বলতে চেয়েছি।

এখন আমি *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-র ভেতর থেকে কবি-কবিতা প্রতীকটি হয়ে উঠবার দিকে চোখ [illegible] বাতে চাই। সেই যে কবি, যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো *একদা*

এক রাজ্যে আর *বিরতিহীন উৎসব*-এর কবিতাগুলোতে, সেই যার প্রথম দেখা পাওয়া গিয়েছিলো প্রেমবিচ্ছেদ খিন্ন ও বয়সের আগেই বৃদ্ধ এক যুবক রূপে, অচিরেই যাকে আমি দেখেছিলাম এক হাতে যে রক্তগোলাপ আরেক হাতে নিশান নিয়ে আছে, যার পায়ের নিচে চূর্ণিত সব চিত্র, খণ্ডিত সব বাস্তব, নষ্ট ধ্বস্ত সময় থেকে যে উত্থিত এবং সময় যার পঙ্খহীন চোখে নিষ্করুণ অবলোকিত, সেই কবিকে তবে আমি এবার *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*-য় দেখেছি কি রূপে ?

এই কবি এখন আর তৃতীয় পুরুষে নয় উত্তম পুরুষেই চিত্রিত; এবং এ দীর্ঘ কবিতার প্রস্তাবনাতে যদিও বলা যাচ্ছে একান্ত আমারই কথা, কিন্তু আমার বাইরে যে আমাদেরই বহুবচন/একবচন করে তুলতেও চেয়েছি সেটা স্পষ্ট হবে যদি এ কবিতার শেষভাগে এই অংশটি দেখি :

সকালে উঠবে তুমি,
খাবে কালো কফি, আড্ডায় আবার যাবে।
রোজ যাকে দ্যাখো সে যখন এসে বলে,
'শোনো, আজ লিখেছি কবিতা।'— অবিকল
তাকে মনে হয় দলছুট নীলগাই
সারাদিন একা একা মালভূমি চষে
এখন দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গিত মেঘে
শিং তুলে।

এই যে কবিটির কথা এখানে বলেছি, যে আজ এসে বলছে সে লিখেছে নতুন একটি কবিতা, যাঁকে মনে হচ্ছে যেন নীলগাই, শিং তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক উচ্চ মালভূমিতে, তরঙ্গিত মেঘের পটভূমিতে সে-কবি তরুণ শামসুর রাহমান, এবং সে-আড্ডা বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং। শামসুর রাহমানকে এখানে নাম ধরে উল্লেখ করি নি, কিন্তু আর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পরেই করবো এবং তখন পেছন ফিরে উদ্ধৃত অংশে তাঁকে চিনে নিতে পারবো। এই সঙ্গে কবি শহীদ কাদরির কথাও এনেছি, আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রথম বয়সের কয়েকজন বন্ধুকে— খালেদ চৌধুরী, সুকুমার দাস, সঞ্জীব দত্ত— এক ওই সঞ্জীব ছাড়া যাঁরা কবিতা লিখতেন না, কিন্তু কবিতা, সময় ও অস্তিত্বকে আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছেনেছুনে দেখতেন না। এসেছেন তাঁরা এভাবে :

খালেদ খুঁজবে এসে, 'আছে
নাকি সুকুমার ? অথবা সঞ্জীব দত্ত ?'

আমার উত্তর :

জানি না, দেখি নি।

খালেদের তখন প্রস্তাব :

'বিশুদ্ধ সংখ্যার ছকে
খেলি আয় অস্তিত্বের খেলা।' কারা যেন
রাস্তা হাঁটে, অন্ধকারে হা হা করে হাসে।
ভাঙা তোরণের নীচে শহীদের কণ্ঠ
ফেরে, 'আজ মা গেলেন।'

এমনকি বিউটি বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার প্রহ্লাদের কথাও এনেছি— পরে যার মৃত্যু হয় একাত্তরে পাকিস্তানি সৈনিকের হাতে। সে কবি নয়, ব্যবসায়ী, সে কবি না হয়েও কবিদের আশ্রয়দাতা, গুরুত্বপূর্ণ সেও, আমাদের বহুবচনের ভেতরে সেও আছে এভাবে :

'দামটা দেবেন?'
রাস্তায় ভূতের মতো প্রসারিত হাত
প্রহ্লাদের।

এবং এই কবি নয়, ব্যবসায়ী প্রহ্লাদের পরেপরেই, সচেতনভাবে, কবি ও কবি নয় এমন সকলকে জুড়ে দিয়ে সর্বসমেত এক বহুবচনের রূপ রচনার পরিকল্পনায় আমি এবার শামসুর রাহমানের কথা এনে ফেলি অনায়াসে :

শামসুর রাহমান ফিরে
একবার দেখবে তোমাকে। তারপর
হেঁটে হেঁটে নীলখুরে সূক্ষ্ম ধূলি তুলে
চলে যাবে চন্দ্রের শহরে।

কিন্তু যে একবচন দিয়ে শুরু করা গিয়েছিল, কবিতাটি অন্তিম তরংগে এসে, আমি মনে করি, কেবল ব্যক্তি আমার বক্তব্য থাকে না আর, হয় তা আমাদের প্রত্যেকেরই— কবি বা কবি নই— যদি স্মরণ রাখি সেই কথা যা আগে বলেছি, যে, মানবের স্বপ্নসমূহের অনুবাদই কবি তথা মানবের কাজ এবং মানবিক জীবনই হচ্ছে প্রতীক অর্থে কবিতা। এবার সেই ব্যক্তিটির দিকে তাকাবো। কবিতাটির শুরুভাগে সে এরকম :

মধ্যরাতে শব্দ তুলে যায় দ্রুতযান,
স্মৃতিগণ আসে তারই মতো হু হু করে —
রেস্তোরাঁ, পত্রিকা, কফি, সিগারেট, ছবি,
তার গলা টেলিফোনে, কড়া শাদা জামা,
দুপুরে হঠাৎ জলে নামবার সাধ,
সতর্ক দোকান থেকে চুরি করে আনা
কোনো কবিতার বই, আপন মৈথুন,
পকেটে কবিতা যেটি দুপুরে লিখেছি।
সন্ধ্যার অঙ্গারে লাল এখনো তন্দুর।

হ্যাঁ, সৃষ্টি ও শুভজীবনের জন্যে যে তন্দুর আমরা জ্বেলেছিলাম, তৈরি হচ্ছিলো স্বাস্থ্যদায়ী রুটি, এই ভাঙনের সন্ধ্যায় সে তন্দুরকে তো এখনো চাপা আগুনের তাপে দেখতে পাচ্ছি লাল হয়ে আছে; এখনো সেই প্রাণিত প্রথম দিনগুলোর কথা মনে আছে :

এমন বিশ্বাস ছিল শুধু কবিতায়
প্রথমে করব জয় সুরূপা, বিরূপা;
তারপর পরিবার, যারা রোজ বলে,
'কবিতার সরোবরে ফোটে অনাহার,
ছেঁড়া চটি, শস্তা মদ, আসক্তি বেশ্যায়';
তারপর বাংলাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা;
ফর্মায় ফর্মায় ক্রমে বেড়ে উঠে হবে
কবিতার সংকলন খদ্দরে বাঁধানো,
যে কোনো ঋতুতে আর যে কোনো উৎসবে
পাটভাঙা পাঞ্জাবিতে লম্বমান যুবা
পড়বে সে বই থেকে, বাংলার তারিখে
আমার জন্মের দিন হবে লাল ছুটি।

এখন ঈষৎ বিস্মিত হয়তো হতে হয় যে, আমাদের ভূখণ্ডটিকে সেই ১৯৬৯ সালেই 'বাংলাদেশ' বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিলো— এবং কবিতাটি একবার পুরো পড়ে উঠবার পর আমরা যদি বুঝে যাই যে কবি-কবিতা একটি প্রতীক এখানে, তাহলে, স্পষ্ট হয়ে যাবে, যে, বাংলার তারিখে আমার জন্মের দিন লাল অক্ষরে ছুটির দিন হয়ে যে থাকবে— বস্তুত তা এই ভূখণ্ডে মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই জন্মদিন। কিন্তু এর পরপরই যে প্রশ্ন করা গিয়েছিলো, আজো সে প্রশ্ন করা যাবে বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রের বিষয়ে :

কি করেছি আমি সেই দিনগুলো নিয়ে ?
চকচকে ধাতুখণ্ড মুদ্রাশালা থেকে
জ্যাজের ঝনৎকারে যখন বেরুতো ?
এখন সে সব দিন বিনষ্ট, স্বর্গত ?

বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা এক অর্থে আমার আত্মজীবন তো বটেই, অধিক অর্থে এ আমার সময়েরই জীবনী। কবি ও কবিগণ যদি বোদলেয়ারের কথায় হন সত্যদ্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথের কথায় যদি তাঁরা হন আমাদেরই পুনরুত্থানের কারক, তবে তারই সত্যতা খানিক হলেও কবি-কবিতা প্রতীকে আমি আনবার চেষ্টা করেছি এই দীর্ঘ কবিতায়।

সনেটের অধিকার

শান্তিনিকেতনে টুরিস্ট লজে, আমরা বাংলাদেশের কয়েকজন কবি অতিথি। মেতে উঠেছি আড্ডায়— কেবল পশ্চিম বঙ্গের কবি বন্ধুদের সঙ্গেই নয়, আমরা বাংলাদেশের কবিরাও নিজেদের ভেতরে রাত আর দিন এক হয়ে যাওয়া আড্ডার সুযোগ পেয়ে গেছি এই সুবাদে। শামসুর রাহমান তো মাঝেমাঝেই বলছেন, 'ওহ, অনেকদিন পরে প্রাণ ভরে হাসছি।' কিন্তু, তারপরেও আমার সঙ্গে ওঁর যেটি হয়, যখন কেবল আমরা দু'জন একা থাকি, নিজেদের রচনার গূঢ় গোপন প্রক্রিয়াটি নিয়ে কথা হয়।

সেদিন ভোরে চা-পাউরুটির সন্ধানে সিঁড়ি দিয়ে নামছি শামসুর রাহমানকে সঙ্গে নিয়ে, হঠাৎ তিনি বললেন, 'ইদানিং সনেট আমাকে পেয়ে বসেছে। যা কিছুই ভাবছি, সনেট হয়েই যেন ধরা দিচ্ছে।'

'এটা কি চান না তবে ?'

উত্তর দিলেন না তিনি, চুপ করে রইলেন। স্মরণ না করে পারি না, শামসুর রাহমানের রচনার পরিমাণ এত বিপুল ও বিচিত্র, পাঠকের কাছে প্রায় ধরাই পড়ে না যে বাংলাদেশের বর্তমান কবিদের মধ্যে সনেটের প্রধান রূপকারও তিনি। অনেকদিন আগেই এটি লক্ষ করে একদা তাঁকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম শুধু সনেট নিয়েই একটি কবিতার বই করতে। সে বইটি তাঁর *মাতাল ঋত্বিক।*

বললাম, 'মনে হচ্ছে, সনেটই আপনাকে জোর করে লিখিয়ে নিচ্ছে সনেট।'

ঈষৎ হেসে শামসুর রাহমান বললেন, 'হয়তো।'

বললাম, 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সনেট আমাদের দখল করে নেয় যখন আমরা হঠাৎ দেখে উঠি যে, বলবার কথাটি ক্রমেই এলিয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, তখন একটা চিকিৎসা আমরা নিজেরাই করি— সনেটের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করি। সনেটের চোদ্দ লাইনের ভেতরে, মিল বিন্যাসের কড়া ছকের ভেতরে, নিজেকে বেঁধে ফেলি; বলি, হ্যাঁ, এইতো, এই আমি পারি স্বল্পভাষী হয়েও পূর্ণভাষী হতে।'

পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে কামড় দিতে দিতে শামসুর রাহমান বললেন, 'একেকটা সময় আসে, যখন একেকটা ফর্ম আমাদের অধিকার করে নেয়। কেন এ রকম হয়, সবসময় নিজেও বুঝে ওঠা যায় না। ইদানিং সনেট লিখে খুব আনন্দ পাচ্ছি, সবকিছু যেন সনেটের চোদ্দ লাইনেই গুছিয়ে আসছে এখন। আসলে, সৃষ্টির অনেকখানিই অন্ধকার। ব্যাখ্যা করা যায় না। হোক না, সনেট যখন হচ্ছে, সনেটই হোক।'

এই কথাটি নিয়েই ভাবছি— কেন এরকম হয় ? কী করে একটি কবিতার বীজ আমাদের করোটিতে পড়তেই আমরা নির্ণয় করে উঠি এটি এই ছন্দেই পাতা ছড়াবে ? এটা কি এমন যে, যে-কোনো ছন্দ বা ফর্ম, যেমন সনেট, আমি যেমন ইচ্ছে বেছে নিতে পারি ? অথবা, এর আছে গভীর কোনো বিজ্ঞান ?— এবং, বীজটিই বলে দেয় আমাদের, এইভাবে আমাকে হয়ে উঠতে দাও ?

আমার নিজের বিশেষ প্রসঙ্গটিও আমাকে ভাবিত করে তোলে। আমি কবিতা লিখি, গল্প-উপন্যাসও লিখি, নাটক লিখি। আমারই বা কেন এমন হয় যে, একটা সময় আসে যখন দিনের পর দিন যে-কোনো বীজই কবিতা হয়ে ওঠে! আবার কখনো কেবল নাটকই লিখে চলি, কবিতা আর আসে না। কিছুদিন কেবল ছোটগল্পই। যেন জ্বরতাড়িত একেকটি কাল— শামসুর রাহমান যাকে বলেন 'অধিকার করে নেয়া'।

লক্ষ করি, উপন্যাসের বেলায় ঠিক এরকমটি হয় না। আমার উপন্যাসের বীজ আসে কবিতার মতোই, কিন্তু লিখতে বসি খুব সচেতন একটা সিদ্ধান্ত ও সময় নিয়ে। বীজটিকে দীর্ঘ বড় দীর্ঘদিন করোটির মাটিতে বপন করে রাখি, জলসেচ করি, কিন্তু চাপা দিয়ে রাখি তার পত্রের উদ্গম। তারপর একদিন লিখতে শুরু করি, করনিকের মতো প্রতিদিন লিখে চলি। প্রেরণা বলে যে একটি কথা আছে, সেই প্রেরণাটিকে টানটান রাখি দীর্ঘদিন ধরে— কবিতা বা ছোটগল্পের মতো স্বল্পকালের জন্যে নয়। এমনকি নাটক লেখার মতো অপেক্ষাকৃত অধিক কালের জন্যেও সে প্রেরণা ধরে রাখা নয়। উপন্যাস লেখার ওই প্রেরণাটি ধরে রাখতে হয় আরো দীর্ঘ বড় দীর্ঘকাল; এবং, সেই দীর্ঘকালের ভেতরেই আমাকে হানা দেয় কবিতা, কবিতা লেখা হয়ে যায়, কখনোবা একটি ছোটগল্প— এক বসাতেই। আর, এ সকলের ভেতর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে চলে উপন্যাস লেখার কাজটি।

কিন্তু, একসময় উপন্যাসও আমাকে 'অধিকার' করে ফেলে কবিতা, গল্প বা নাটকের মতোই। উপন্যাসও আমাকে পেয়ে বসে। উপন্যাসের একটা ছক আছে। সব লেখকেরই উপন্যাসে এই ছকটি দ্রষ্টব্য যে এর একটি শিখর আছে। সেই শিখরটি উপন্যাসের মাঝামাঝি তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অনেক সময় প্রথম সিকিভাগে, কখনো শেষ সিকিভাগে স্থাপিত। এই শিখরটিকে অক্ষরপাতে ছুঁয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বেলায় যেটি হয়— কবিতার মতোই আমাকে অধিকার করে বসে জায়মান উপন্যাসটি। আমি আর অবসর দেখি না; ভূতগ্রস্তের মতো লিখে চলি যতক্ষণ না উপন্যাসটির অন্তিম সমতলে নেমে আসি।

পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, কেবল দুটি উপন্যাসে আমি প্রথম বাক্যটি লিখে ফেলার মুহূর্ত থেকেই কবিতা বা ছোটগল্পের মতো অধিকৃত হয়ে গিয়েছিলাম— *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* আর *অন্তর্গত*। এর ভেতরে *অন্তর্গত*-কে আলাদা রাখতে পারি, কারণ ওটি ছিলো গদ্য কবিতায় লেখা— কথাকাব্য। তবে এই আমি দেখছি, আমার বেলায় উপন্যাস লেখা ঠিক কবিতার মতো অধিকৃত হয়ে নয়, বরং উপন্যাসকেই অধিকার করে লেখা।

কবিতার ব্যাপারে, অনুমান করি, বীজটিই বলে দেয় কী হবে এর আঙ্গিক এবং ছন্দ। এবং এই বীজ, সন্দেহ করি, আসলে একটি বাক্য, একটি সম্পূর্ণ বাক্য। এবং সে বাক্যটি কবিতার শুরু, শেষ বা মধ্যভাগে কোথাও তার জায়গা করে নেয়। আমার একটি অবসরের খেলা আছে, কোনো বুধ-কবির একটি কবিতা নিয়ে গোয়েন্দার মতো আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি কোন বাক্যটি কবির করোটিতে রোপিত হয়েছিলো

প্রথম। প্রথম এই বাক্য যেটি করোটিতে জন্ম-চঞ্চল হয়ে ওঠে, কবিতা লিখতে বসিয়ে দেয় আমাদের, আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি সেটি থেকে যায় যেমনটি এসেছিলো অবিকল তেমনই আমাদের কবিতায়। প্রথম ওই বাক্যটিই ধরিয়ে দেয় অপেক্ষমান কবিতাটির ছন্দরূপ।

যদি এমত একটি বাক্য প্রথম এসে যায়— *হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে*— তখন জীবনানন্দর পক্ষেও আর সম্ভব নয় বাক্যটিকে অন্য কোনো ছন্দে লেখা, যেমন, কল্পনা করা যাক— হাজার বছর হাঁটছি আমি এই পৃথিবীর পথ। যদি করোটিতে রোপিত প্রথম বীজ বাক্যটি হয়— *মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে,* তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও সাধ্য নেই কিছুদূর লিখে ফেলার পর এর ছন্দটি বদলে নিয়ে এমত লিখতে যে, *অনেক করেছি আমি মন দেয়া নেয়া / মরিয়াছি সহস্র মৃত্যুতে।* কিম্বা হাসান হাফিজুর রহমান যখন তাঁর করোটিতে অনুভব করে ওঠেন, এবং সে অনুভবটি শ্রুতিগ্রাহ্য এই বাক্য হয়ে তাঁকেই শোনায় যে, *মরুভূমি তার শরীরে অসার ধুলার রাশি / উড়াবেই কেন দিনরাত বসে বলো না এসে,* তখন এরই ধারাবাহিকতায় তাঁকে লিখে যেতে হয় পুরো কবিতাটি; এবং তিনিও আর পারেন না এমত রূপে বাক্যটিকে তথা পুরো কবিতাটিকেই সাজাতে যে, *মরুভূমি কেন তার শরীরে অসার ধুলারাশি / উড়াবেই দিনরাত বসে, বলো এসে।*

কিন্তু সনেট ? সনেটের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অক্ষর সংখ্যা চোদ্দ, আঠারো, বাইশ, এমনকি ছাব্বিশ হলেও, আর এমনকি সনেটের ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন করে পয়ারে তা লেখা না হলেও, তার মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা চোদ্দই; এবং এই চোদ্দ পঙ্‌ক্তির ভেতরেও আছে প্রথম আট ও দ্বিতীয় ছ' পঙ্‌ক্তির বিন্যাস-বিজ্ঞান। তারপর আরো আছে— মিল বিন্যাস; মিলবর্জিত সনেটকে আমি ব্যতিক্রম বলেই জানি। সনেটের ওই মিলেরও কত বিচিত্র স্থাপনা— কক খখ; কখ কখ; কখ খক; কখগঘ, কখগঘ; কখগঘ ঘগখক; কখগঘ গঘকখ এবং আরো বিচিত্র বহু। কঠিন এই বাঁধা ছকের ভেতরে বলবার কথাটিকে পূর্ণ করে বলা, মনে হয়, এ কেবল বীজবাক্যের ওপর নির্ভর করে না, এমনও নয় যে বীজবাক্যটি সনেটের শরীরে যে-কোনো একটি পঙ্‌ক্তি হয়ে দেখা দেবে। অনুমান করি বীজবাক্যটি হয় সনেটের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির যে-কোনো একটি বা একসঙ্গেই দুটো, এবং নিপুণ রাজমিস্তিরির মতো এরই ওপরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা পুরো স্তম্ভটি; ছাদের উচ্চতাটি আমরা জানি— চোদ্দ পঙ্‌ক্তি, সেই উচ্চতাকে ক্রমে স্পর্শ করা, ধারণা করি এই হচ্ছে সনেটের নির্মাণ।

তবে কি এমন ভাববো, সনেট যখন আমরা লিখি, কিম্বা সনেট যেকালে অধিকার করে নেয় আমাদের কলম, তখন আমরা এমন একটি মনোভঙ্গির অন্তর্গত হয়ে যাই যখন আমাদের কাছে এই পরিপার্শ্ব ও সময়, এই অভিজ্ঞতা ও অনুভব, অনবরত এপিগ্রাম আকারে, যেনবা আঙটির হীরকের মতো তীব্র ক্ষুদ্র দীপ্তিমান হয়ে ধরা দিতে থাকে ?

কবিতা এখন

একজনের কথা শেকড়ে খুব টান দিয়ে মনে পড়ছে এই ভোরবেলায় আকাশ যখন রোদ্দুরের করতলতাপ দিয়ে ঘুমন্ত আমার চোখ টিপে ধরেছে— এই রকম একটি বাক্য লিখলে, মনেই হতে পারে আমি কোনো নারীর কথা ভাবছি; মনেই হতে পারে, সেই নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত।

আসলে, কোনো কোনো শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যগ্রন্থনার ধরনই এরকম দাঁড়িয়ে যায় আমাদের দীর্ঘ অভ্যেসে যে, ওর ভেতর থেকে বাঁধা অর্থটাই উঁকি দেয়; যদিবা অন্য কোনো অর্থ বেরিয়ে আসে, আমরা হতাশ কিম্বা বিস্মিত হই।

এই যে বাক্যটি শুরুতেই লিখেছি, যদি খুলে বলি, আসলে আমার মনে পড়ছিলো নজরুল ইসলামকে তাঁর সেই কবিতার সেই আশ্চর্য চিত্রপ্রতিমাটির সূত্রে— 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই', আমি জানি, প্রায় সকলেই হকচকিয়ে যাবেন।

এইটে আমাকে খুব ভাবায়; দীর্ঘদিন থেকে আমি দেখি, ভাষা মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে অভ্যেসের দাসত্ব আমরা কী শোকাবহভাবে স্বীকার করে চলেছি। কোনো দাসত্বের ভেতরেই আনন্দ নেই, স্বাধীন স্ফূর্তি নেই; সৃজনশীল লেখায়, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন এবং শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রচনায়, অভ্যেসের দাসত্বের কোনো অবকাশই নেই; অথচ অভ্যেসের এই দাসত্বেরই শেকল বাংলাদেশের সাহিত্যে— কি গল্প উপন্যাস, কি কবিতায় এখন ছত্রে ছত্রে বাজে। আমি অবসন্ন বোধ করি।

ওই অভ্যেসের দাসত্ব থেকে উচ্চারণকে মুক্তি দেবার কাজটি হয় একজন কবির প্রাথমিক কাজ। কবি যখন আমাদের অভ্যেসগুলোকে ভেঙে দেন, তখন ঔপন্যাসিক আসেন এগিয়ে এবং নতুন সেই প্রকাশরূপকে প্রতিদিনের জীবনের জন্যে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। কবির বক্তব্য শুধু নয়, কীভাবে তা উক্ত, এই দুই মিলিয়েই তাঁর কবিতা। বাংলাদেশের কবিতায় এই দুয়ের মিলন বড় দুর্ঘট বলেই দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি। বাংলাদেশের বর্তমান কবিতা পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, অভ্যেসের দাসত্ব আমরা এখনো ষোলোআনাই ঘাড়নিচু করে চলেছি; আর এরই অনিবার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের উপন্যাসের ভাষা অবনত থেকে আরো অবনত হয়ে চলেছে। এর জন্যে আমি আমাদের কবিতাকেই দায়ী করতে চাই। আমাদের কবিতা এখন আদৌ আর সন্ধান করে দেখছে না শব্দ, বাক্য, বাক্‌স্পন্দন এবং উচ্চারণ গঠনের অন্যতর সম্ভাবনাগুলো।

নেরুদার সাবধানবাণী

আমার লাইব্রেরির তাক থেকে পুরনো একটি বই এসে হঠাৎ হাতে ঠেকলো। পাবলো নেরুদার চটি একটি কবিতার বই *লেট দ্য রেল স্প্লিটার এওয়েক*। ঢাকেশ্বরী রোডে ছিলো বিবলিওফাইল নামে বইয়ের একটি দোকান, সেখান থেকে কিনেছিলাম। তারিখটি এখনো লেখা আছে, কালি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তবু পড়া যায়— নভেম্বর, উনিশশো বাহান্ন।

চমকে উঠলাম এই বইয়ের ভূমিকায় পাবলো নেরুদার প্রবন্ধটি আবার পড়ে। স্তম্ভিত হলাম, আমার প্রিয় একজন কবি টি এস এলিয়ট, একজন ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্রে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য দেখে। বিস্মিত হলাম, বয়স যখন কাঁচা এবং মনের ওপর ছাপ পড়ে যায় সহজেই, তখন এবং তখনো নেরুদার ওই শক্ত নিষেধ, তাঁর ওই বিরূপ পর্যবেক্ষণ কোনো প্রভাবই ফেলে নি আমার ওপরে। এলিয়টের কাছে, সার্ত্রের কাছে আমি অনেক শিখেছি, নিয়েছি এবং এখনো আমার পাঠগ্রহণ তাঁদের কাছে শেষ হয়ে যায় নি। পাঠ নিয়েছি নেরুদার কাছেও। নেরুদা এবং এলিয়ট, দু'জনের কাছেই।

হাতে গণা কয়েকজন কবি— তাদের মধ্যে নেরুদা এবং এলিয়টও যে আমরা আমাদের হয়ে ওঠার সেই সময়ে খুব বড় করে পড়েছি, এ কথা আজ আমার কিংবা শামসুর রাহমানের কবিতার দিকে যখন ফিরে তাকাই, গোপন থাকে না।

পাবলো নেরুদার সেই প্রবন্ধ থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদে খানিক উদ্ধৃত করি :

আমরা যারা এই সময়ের কবি, আমাদের ভেতরে ধারণ করছি পরস্পর বিরোধী দুই শক্তি। সময় এসেছে একটিকে বেছে নেবার। আমাদের নিজস্ব ধরনটিকে আলাদা করে নেবার ব্যাপার এটি নয়; বরং এ হচ্ছে আমাদের অন্তর্গত দায়িত্ববোধকেই বেছে নেয়া।

ব্যাপক পচনধরা ধ্যানধারণা আজ আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রের ওপরে বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে আছে; আর আমাদের অনেকেই সরল বিশ্বাসে সে বাতাস নিঃশ্বাস নেবার আরো অযোগ্য করে তুলেছি। কিন্তু এ বাতাস আমাদের, শিল্পীদের, জন্যেই নয় কেবল, বরং সকল মানুষের, এখন যারা জীবিত, ভবিষ্যতে যারা আসবে।

পৃথিবীতে আমরা আমাদের কেমন চিহ্ন রেখে যাবো? সে কি দম আটকানো মানুষের খিঁচুনিধরা পায়ের ছাপ ভিজে কাদায়, এমত?

স্পষ্টই দেখা যায়, আমাদের সময়ের অনেক সৃষ্টিশীল চিত্তই বুঝতে পারছেন না যে, তাঁরা যাকে মনে করছেন তাঁদের অস্তিত্ববোধের গভীরতম প্রকাশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি তাঁদের চেতনায় তাঁদেরই চরম শত্রুর ঢেলে দেয়া মারাত্মক বিষের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।

মুমূর্ষু পুঁজিবাদ এখন মানবিক সব সৃষ্টির পেয়ালা ভরে তুলছে তিক্তরসে। যাবত বিষ মেশানো সে রস আমরা পান করছি। তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পচনধরা ওই সমাজব্যবস্থার তিক্তপিত্ত জর্জরিত। আর আমাদের লাতিন আমেরিকার তরুণেরা পান করে চলেছে সেই বিষ যা গলা টিপে মারতে চায় মানবের ভবিষ্যত নিয়ে সকল আশা, ঢেলে দিতে চায় সর্বাংশেই হতাশা।

অতঃপর, হায়েনারা যদি কলম বা টাইপরাইটার চালাতে পারতো, তাহলে তারা লিখতো কবি টি এস এলিয়ট বা ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্রের মতো!— এক সম্মেলনে এ কথা উচ্চারিত হতে শুনে পাবলো নেরুদা বলেন, *আমি মনে করি, এ কথা বললে পশুদেরই অপমান করা হয়। বুদ্ধিবৃত্তি এবং রচনাক্ষমতা পেলে পশুরা যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তথাকথিত এই বুধগণের মতো ধ্বংস আর পাপের অনয়-বার্তা প্রচার করাটাকেই ধর্ম করে তুলতো, এ আমি বিশ্বাস করি না। এবং এই মন্তব্য করে তিনি এলিয়ট ও সার্ত্র বা তাঁদের ধরনের সকল লেখক সম্পর্কে বলছেন, আজ পৃথিবীতে যে ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি করা হচ্ছে ওঁরা হচ্ছেন তারই পুরোহিত, ওঁরা হচ্ছেন সমূহ জীবন-বিনাশের সক্রিয় বীজাণু। অন্যায় এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখবার জন্যে আনবিক বোমা ফেলে মানুষকে শায়েস্তা করবার আগে মানুষের আত্মাকেই ধ্বংস করবার কাজটি ওঁরা হাতে নিয়েছেন। পুঁজিবাদের অন্তিমদশার গোলযোগে তাঁরা আমাদের গভীরতর উদ্বেগগুলোকে টেনে বার করছেন এবং মানব-চেতনার আলোকে এমত সীমিত করছেন যেন তা ভ্রষ্ট, নষ্ট আর অসুস্থকেই উদ্ভাসিত করে কেবল।*

সেদিন, সেই কাঁচা বয়সেই, নেরুদার কথাটা গ্রহণ করতে পারি নি; তবে কারণটি তখন স্পষ্ট করে নিজেও বুঝি নি; আজ বুঝি; আজ আমি স্পষ্ট জানি, কবিতা আর রাজনীতি— এ দুয়ের জমি এক, বীজ ভিন্ন।

সংবাদ তথ্য এবং কবিতা

৫,৮০০,০০০ রাইফেল আর কারবাইন
১০২,০০০ মেশিন গান
২৮,০০০ ট্রেঞ্চ মর্টার
৫৩,০০০ কামান
বলতে পারছি না কতগুলো ক্ষেপনাস্ত্র, মাইন, ফিউজ,
১৩,০০০ বিমান
২৪,০০০ বিমানের এঞ্জিন

৫০,০০০ গোলাবাহী গাড়ি
এখন
৫৫,০০০ লরি
১১,০০০ ফিল্ড কিচেন
১,১৫০ ফিল্ড বেকারি।

ওপরের এই পঙ্‌ক্তিগুলোকে কি মনে হচ্ছে নিতান্তই তালিকা ? তালিকাই বটে; কিন্তু কোনো সামরিক বাহিনীর ফাইলে পাওয়া যাবে না এটি; আমাদের সন্ধান করতে হবে কবি টি এস এলিয়টের কাব্যসংগ্রহ; আমরা দেখতে পাবো, তিনি, এলিয়ট তাঁর *কোরিওলান* শীর্ষক কবিতায় কবিতারই পঙ্‌ক্তি হিসেবে রচনা করেছিলেন এই তালিকাটি।

বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম যৌবনে যখন পাঠ নিচ্ছিলাম কবিতার, এলিয়টের এই পঙ্‌ক্তিগুলোর সাক্ষাতে বড় বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম। এই কি কবিতা ? এসব কি কবিতার পঙ্‌ক্তি হয় কখনো ? কী বলতে চান তিনি এমত একটি ফর্দ রচনা করে ?

অচিরেই মেনে নিই, যেহেতু এলিয়ট, আমাকে মেনে নিতেই হয়— যদিও মনের ভেতরে কাঁটা একটা থেকেই যায় যে— তিনি আমাদের মনে যুদ্ধের বিধ্বংসি বিকট আয়োজনের সংবাদ খুব ঠাণ্ডা ও নিস্পৃহ স্বরে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, তাই এ তালিকা।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিক আমি ওই কাঁটাটি বহন করে চলেছি; চল্লিশ বৎসর ধরে আমি ছিলাম অক্ষম এর মধ্যে কবিতা কোথায় অনুভব করতে।

তারপর পহেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, 'সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় একটি তালিকার সাক্ষাত পাই। চল্লিশ বৎসর পরে অকস্মাৎ আমি স্মরণ করে উঠি এলিয়টের কোরিওলান কবিতায় সেই তালিকাটি; আমার শরীর হিম হয়ে যায়; আমি কবিতা ও অভিজ্ঞতার পরস্পর প্রবিষ্ট বিদ্যুতে ঝলসে যাই।

৮৫ প্লাটুন পুলিশ (১ প্লাটুন = ১০ জন)
৭ প্লাটুন বি ডি আর (১ প্লাটুন = ৩০ জন)
১২৬ জন পুলিশ অফিসার
১২৫ জন মহিলা পুলিশ
পুলিশ ও বি ডি আর মোট ২,২০০ জন
এছাড়া
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ডি জি এফ আই
কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শাদা পোশাকে, তাদের সংখ্যা অজ্ঞাত

একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা যে আন্দোলন থেকে, বায়ান্নোর সেই ভাষা আন্দোলনের ছাত্র শহীদদের রক্ত ধোয়া রাজপথে, সেই আন্দোলনেরই

উষ্ণ রক্ত ও জীবন্ত স্মৃতি দিয়ে গড়ে তোলা বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনে নেমে পড়া বাহিনীরই বিবরণ এই তালিকায়; এবং তারা সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধাবস্থায় উদ্যত, যেন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে এবারের বইমেলা নির্বিঘ্নে উদ্বোধন করতে পারেন স্বাধীন এই দেশটিরই প্রধানমন্ত্রী।

বারুদের ধোঁয়া আর শত শত ছাত্রের আর্ত চিৎকার আর বর্বর পিটুনির ফলে তাদের শরীর থেকে রক্তপাত তখনো মিলিয়ে যায় নি এর আগের দিন জগন্নাথ হলে ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলায়; সে হামলা স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তরে এই জগন্নাথ হল সহ পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশনকে। সেদিন তো ওরা ছিলো দখলদার বাহিনী; আজ এরাও কি তাই ? তবে কি আমরা স্বাধীন নই আর ? অধিকৃত দাস তবে এখন এই জাতি ?

পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকাটির দিকে আমি তাকিয়ে আছি; তালিকা, নিতান্ত একটি তালিকাই কীভাবে উদঘাটিত করতে পারে মানবের বিকট একটি বর্তমান; এলিয়টের প্রতিভার সমুখে আমি প্রণত হয়ে আছি আজ তিনটি দিন।

কবিকণ্ঠে কবিতার উচ্চারণ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনে তোলা ভিডিও ছবিতে, ছাত্রছাত্রীদের বলছিলেন কবিতার কথা। পর্দায় ক্লোজআপে শক্তির মুখ; মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে, তাঁর সারাজীবনের সাধনা কবিতা বিষয়ে তিনি বলছেন, *কবিতা সৃষ্টি করে একটি রহস্য, সেই রহস্যটি ভেদ করতে হয়। একেকজন একেকভাবে সেই রহস্য ভেদ করে।*

আরেকটি শটে শক্তিকে দেখা গেলো, চেয়ারে বসে আছেন আমাদের দিকে পেছন ফিরে, সমুখে ছাত্রছাত্রীরা, আবৃত্তি করছেন তাঁরই একটি বিখ্যাত কবিতা; আর এই আবৃত্তির শল্যে নিজেই তিনি এ কবিতার রহস্য ভেদ করলেন একেবারে নিজস্ব ধরনে; এবং তখনই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা গেলো। কবিতাটির প্রথম স্তবক ছাপার অক্ষরে এরকম—

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

আমরা এই পঙ্‌ক্তিগুলো নিজের ধরনে একবার পড়ে নিই, এবং এখন দেখি— শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন আবৃত্তি করলেন, করলেন কীভাবে ? কণ্ঠ তো শোনাতে

পারবো না, লিখিত আকারে তাঁর আবৃত্তির সংকেত দেয়া যায় কয়েকটি চিহ্ন ও রেখা যোগ করে : যেমন,

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
জলে ভেসে যায়— 'কার শব ?'
—'কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি!' — 'স্বেচ্ছাচারী!!'

প্রতিটি রেখাটানা শব্দ শক্তি উচ্চারণ করলেন দাপটের সঙ্গে; হাইফেন অংশে নাটকীয় স্তব্ধতা; আর এতেই কবিতাটি হয়ে উঠলো আমাদের যার যার নিজস্ব পাঠ এবং রহস্যভেদ প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমরা আবিষ্কার করে উঠলাম 'কার শব ?' নিতান্তই ছিলো এক বিষয়ী মানুষের প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটি হয়ে উঠলো ওই যতিপাত ও সহসা উচ্চকণ্ঠের দরুণ পায়ের তলায় মাটি সরিয়ে নেবার মতো অপ্রত্যাশিত এক বিবরণ। আমরা প্রহত হয়ে জেনে গেলাম— শুরুতেই 'তীরে' শব্দটি শুনে আমরা যে একটি নদীর কথা ভেবেছিলাম— আসলে সে নদী নয় আদৌ, নয় 'রাতের কল্লোল' সেই নদীটিরও কল্লোল; নদী নয়, জীবনই বস্তুত; জলেরও কল্লোল নয়— জীবন-মৃত্যু-জীবনেরই বিরামহীন প্রবহমানতার ধ্বনি এ— যেন আমাদের ধাক্কা দিয়ে বলে গেলো, 'আমিই ভাঙি, আমিই গড়ি আমার আছে আমারই এক নিয়ম, এবং আমার নেই কোনো পক্ষপাত।'

আমি যে বিশ্বাস করি কবিতা ছাপার অক্ষরে আমরা প্রকাশ করলেও আসলে তা পুরোপুরি কানে শোনবার জিনিশ— শক্তির ওই আবৃত্তি আমার সে বিশ্বাসকেই আরো জোরালো করে। কবিতা লেখার কালে জায়মান কবিতাটি আমি কানে শুনতে শুনতেই বয়ন করে চলি। ছাপা কবিতা— কবিতাটিরই স্মারক মাত্র, কবিতার আসল বাস জিহ্বায় এবং গন্তব্য তার আমাদেরই শ্রুতিতে। তাই আমি মনে করি, একজন ভালো কবিকে তাঁর কবিতার সবচেয়ে ভালো আবৃত্তিকার হতেই হয়।

কিন্তু এ কথা বলেই জিভ কাটছি। এলিয়টের আবৃত্তি শুনেছি— নিতান্তই যেন একটি বিবরণ পড়ে যাচ্ছেন ঠাণ্ডা গলায়, একতালে একরৈখিক স্বরে। আবার ডিলান টমাসের আবৃত্তি শুনে দেখেছি— এটাও রেকর্ডে শোনা— কী অসাধারণ সে উচ্চারণ, কীই না নাটকীয় যতিপাত ও স্বরের ওঠানামা। ডিলান টমাসের যে-কবিতা ছাপার পাতায় পড়ে মনে হয়েছিলো দুর্বোধ্য, তাঁর কণ্ঠে সেই কবিতাই শুনে বুঝে গেলাম প্রাঞ্জল; না, বোঝা বলাটাও ঠিক হলো না— স্পন্দনে স্পন্দনে সে সত্য ও সরল হয়ে অংকিত হয়ে গেলো অনুভবের পটে।

রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠে আবৃত্তি আমরা রেকর্ডে শুনেছি। তাঁর কণ্ঠের যে চিকণতা ওই রেকর্ডে পাই, আমার ধারণা ওটি সেকেলে রেকর্ডে শব্দ-গতি যথাযথ ধরা যেতো না বলেই। কিন্তু তারপরেও যে দীর্ঘ টানে ও আবেগে তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতা, তা আমাদের কাছে পুরনোকালের বলেই মনে হবে— সেই কালের যখন

কবিতাকে মনে করা হতো গদ্যের থেকে, নাটকের সংলাপ থেকে, ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন চারিত্রে উচ্চারণ করবার মতো রচনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বরং তার দীপ্তি ও চরিত্র নিয়ে জিহ্বায় রচিত হয়েছে শম্ভু মিত্র বা প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিতে।

বিষ্ণু দে-র আবৃত্তি শুনেছি; এলিয়টকে তিনি খুব নিজ-কাছের বলে ভাবতেন বলেই কিনা জানি না, তাঁর নিজেরই কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন এলিয়টের মতো বিবরণপাঠের মতো করে। পাবলো নেরুদার আবৃত্তি শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিলো— রেকর্ডে নয়— লন্ডনের এক কবিতাপাঠের আসরে; তাঁর কণ্ঠে তাঁরই কবিতার উচ্চারণ— স্পেনীয় ভাষা আমি এক বর্ণ না বুঝলেও— আমাকে মনে করিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে; নেরুদার কণ্ঠে পেয়েছি যেন রবীন্দ্রনাথেরই শব্দসকলের দুলিয়ে টানা উচ্চারণ ও আবেগের উত্তলতা। কিন্তু যখন কবি মাইকেল হামবার্গার আবৃত্তি করলেন নেরুদারই ইংরেজি অনুবাদ— পড়া হচ্ছিলো মূল এক স্তবক নেরুদা, অনুবাদে সেই স্তবকই হামাবার্গার— তখন কবিতাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো মূলের অভিপ্রায় এবং উচ্চারণে তার ভাব-সংকেত ধরে।

তাহলে ওই কথাটি আমার ফিরিয়ে নিতেই হয়। কবিকে তাঁর কবিতার সবচেয়ে ভালো আবৃত্তিকার হওয়াটা জরুরি নয়। কবি নিশ্চয় আদর্শ উচ্চারণটি কানে শোনেন ঠিকই, নইলে রচনাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, কিন্তু করোটিতে শোনা সেই ধ্বনি তাঁর নিজের জিহ্বায় নাও আসতে পারে। এলে ভালো। এলে আমাদেরই সহায় হয় কবিতাটিকে আরো তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে তার সর্ব অভিপ্রায় সমেত। তাই আমি এখনো এ প্রত্যাশা ছাড়ছি না যে, কবি হবেন তাঁরই কবিতার প্রতিভাবান আবৃত্তিকারও বটে— তাঁরই কবিতার।

শব্দ : সংগত ও অসংগত

শব্দ থাকে অভিধানে, আর থাকে প্রতিদিনের উচ্চারণে। কবির কলমে অভিধানের সেইসব শব্দই হয়ে ওঠে নতুন— কবির নিজস্ব অভিপ্রায়ে। কবির হাতে শব্দ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তার প্রচলিত অভিধা থেকে।

বস্তুত যে-কোনো শব্দই যে নিতান্ত ধ্বনি মাত্র, অভিপ্রায়ই সব— শুধু কবি নয়, সবার উচ্চারণেই; এটি আমি প্রথম জেনেছিলাম সার্ভান্তেসের উপন্যাস ডন কিহোতি থেকে প্রথম। শব্দ সম্পর্কে গভীর একটি ধারণা তিনি আমাদের দিয়েছেন আপাত লঘুচালে এভাবে : ডন কিহোতি একক যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়বেন, তার সঙ্গী হবেন সাঞ্চো পাঞ্জা। সাঞ্চো এসে ডন কিহোতিকে বলছেন, 'প্রভু, আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আমি আমার স্ত্রীকে সংযত করিয়েছি।'

ডন কিহোতি বললেন, 'সংযত নয়, সাঞ্চো, সম্মত। বলো, সম্মত করিয়েছো।'

সাঞ্চোর উত্তর, 'যদ্দুর স্মরণ হয়, আমি আপনাকে এর আগেও দু'একবার বলেছি, প্রভু, আপনি যদি বুঝেই থাকেন কী আমি বলতে চাই, তাহলে আর আমার কথার কোনো শব্দ দয়া করে সংশোধন করবেন না।'

বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করবার কালে ওই কবির এক চেতনা-মূল শব্দ, ফরাসিতে 'এনুই', যার বাংলা তাৎক্ষণিকভাবে মনে হবে উদাসীনতা, কিন্তু বোদলেয়ার যদি বাংলায় লিখতেন তবে তাঁর কলমে এর বাংলা-শরীর কী হতো, এ ভাবনায় বহু বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। তিনি নাড়াচাড়া করেছেন 'উদাস' শব্দটির নানা চেহারা নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করেছেন উদাস নয় ওই ফরাসি 'এনুই'-এর বাংলা সমান্তরাল হচ্ছে 'অবসাদ'; সমান্তরাল, কেননা কোনো শব্দেরই অনুবাদ অন্য ভাষায় অবিকল করা যায় না, যতই অবিকল মনে হোক, সমান্তরাল সে মাত্র। অবসাদ : এতে আছে ক্লান্তির ক্রিয়া, আছে বিষণ্ণতার স্পর্শ, সেই সঙ্গে সাময়িক মৃত্যুর স্তব্ধতা। বোদলেয়ারের মানসিক মানচিত্রের অবতল ভূমিসমূহের বর্ণনায়, বুদ্ধদেব মনে করেছেন, অবসাদ-ই হচ্ছে 'এনুই'-এর তুল্য বাংলা প্রতিরূপ।

বলে নেয়া ভালো, বোদলেয়ার যে 'এনুই' ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়, তার সাক্ষাত ফরাসি অভিধানে পাওয়া গেলেও, কবিতার পর কবিতার ভেতর দিয়ে তিনি একে নিজস্ব এক সার্বভৌম অভিধায় নতুন শব্দ করে তুলেছেন, এমনই নতুন যে বোদলেয়ারের পর এখন পর্যন্ত আর কোনো ফরাসি কবির পক্ষে 'এনুই' ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার না করে; যেমন, আমাদের বাংলায়, একটি উদাহরণ দিই, *তরী* বা *রথ* বা তোরণ সম্ভব নয় ব্যবহার করা রবীন্দ্রনাথকে মনে না করে। মনে না করে কি!— ব্যবহার করাটা নেহাতই হবে অসংগত।

শব্দের ওই সংগত-অসংগত নিয়ে নিজের একটা কথা বলি। ওই অনুবাদ সূত্রেই কথাটা বলছি। কবিতা-শুরুর দিনগুলোতে আমি টি এস এলিয়ট যে নিবিড়ভাবে পড়তাম, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমার প্রথম কবিতার বই *একদা এক রাজ্যে*-র বেশ কয়েকটি কবিতায়। তখন এতদূর পর্যন্ত আমি নিবিষ্ট ছিলাম এলিয়টে যে তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা আদ্যোপান্ত আমার কণ্ঠস্থ ছিলো। সেই তখন কিছু অনুবাদও করেছিলাম এলিয়টের। *লাভ সং অব আলফ্রেড জে প্রুফক* অনুবাদ করতে বসেছিলাম। ও কবিতার প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তি হচ্ছে : *লেট আস গো দেন ইউ অ্যান্ড আই / হোয়েন দা ইভনিং ইজ স্প্রেড আউট এগেনস্ট দা স্কাই / লাইক আ পেশেন্ট ইথারাইজ্‌ড আপ্‌ন আ টেব্‌ল।* লেট আস গো দেন-এর অনুবাদ 'তবে চলো যাওয়া যাক' তো করা গেলো, আটকে গেলাম ইভনিং শব্দটা নিয়ে। ইভনিং আর বাংলায় সন্ধ্যা কি এক ? অপরাহ্ন— চলবে ? লিখলাম— অপরাহ্ন শুয়ে আছে যখন আকাশে— নাকি, অপরাহ্ন পড়ে আছে যখন আকাশে ?— ইভনিং-এর বাংলা অপরাহ্নই আমি স্থির রেখে দিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা নয় কেন ইভনিং ?

এর উত্তরটা পেতে আমাকে দুটি যুগেরও অধিককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঠিক বছরখানেক আগে গিয়েছিলাম লেনিনগ্রাদ। সেখানে তখন শাদা-রাত চলছে, অর্থাৎ সূর্য তখন ভালো করে অস্তই যাচ্ছে না, মাঝরাত পর্যন্ত আকাশে লেগে আছে পাণ্ডুর আলো। হোটেল থেকে বেরিয়ে নেভা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, রাত তখন প্রায় এগারোটা, পথঘাট নির্জন, জনশূন্য, কেবল আকাশে ওই আলো। হঠাৎ আমার মনে হলো যেন মূর্চ্ছিত! মূর্চ্ছিত ওই আলোটি। আর তখনই এলিয়টের সেই অপরাহ্নটিকে আমি দেখে উঠলাম— যেন ইথারে মগ্নচেতন রোগী, পড়ে আছে অপারশেনের টেবিলে। সন্ধ্যা শব্দটির ভেতরে যে বাংলায় আমরা শান্ততা, স্তব্ধতা, এমনকি বিষণ্নতাও বোধ করে উঠি— অপরাহ্ন তা থেকে মুক্ত; বুদ্ধদেব বসুর কথায় এই তো সেই শব্দ যা নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন, যাকে কবিতার অভিপ্রায়ে ভরে তোলা যায়। অর্থাৎ সঙ্গত হয়ে ওঠে— কবিতার জন্যে ও কবিতার কারণেই।

কবি ও চিত্রকরের এই একটা মিল

কোনো এক মুখ ? একটি বিশেষ মুখ ? অনেক ও অসংখ্য; তবে যে একটি মুখ আমরা প্রতিদিন দেখি, সে আমাদের এবং কেবল আমাদেরই বটে; এবং তার সঙ্গেই আমাদের এক অদ্ভুত সখ্য। কত প্রেম, কত রক্ত, কত প্রতারণা, কত পরাজয়, তবু কত জীবনের সাধ জীবন নিজেই আমাদের রক্তে রটায় দেখি; অবাক হতেই হয়, অমাবস্যা ভেঙে উঠে আসে চাঁদ; কত মানুষ আসে, যায়, যায় এবং আসে, শেষ পর্যন্ত কেবল একটিই মুখ থেকে যায় আমার কাছে এবং আমার জন্যেই।

সময় নিজেরই মুখ আঁকে আমাদের প্রতেকের অন্তর্গত পটে।

এই মুখে পড়ে আছে মানবের সুদীর্ঘ সকল মানবের আদল— সাক্ষাতে জনক ও জননীর, নারীর ও সন্তানের আর এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুরও; বদ্বীপ রয়ে গেছে অত্যন্ত গভীরে এক অন্তর্লীন স্তরে; যার জন্যে যুদ্ধ করে মৃত্যুও বরণ করতে পারি এমত মনে হয়, সেই অনুভবটি নিয়ে আজ রাতে কলম আর ব্রাশ নিয়ে আমি অস্থির এবং ক্রমাগত দুলছি— একটি কবিতা হবে ? কিংবা এক ছবি— আমি ছবিও যে আঁকি।

একটি কবিতা যখন দাঁড়িয়ে যায়, কবিতাটিকে সকলের জন্যে উপস্থিত করি যখন, তখন কেবল আমিই জানি— একজন কবিই কেবল সকরুণ এই জানেন যে, এই একটির পেছনে পড়ে আছে আরো কত কবিতার লাশ, আরো কত কবিতাকে নষ্ট হয়ে যেতে হয়েছে গর্ভে, ভ্রূণে, এমনকি পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণের পরেও করেছে প্রাণত্যাগ। আমার মনে হয়, সকল শিল্পমাধ্যমের ভেতরে একমাত্র কবিতা ও

চিত্ররচনার ক্ষেত্রেই কেবল শিল্পীর নিজের হাতে চলেই চলে এই আপন রচনার হত্যা, মৃত্যু তথা বর্জনের প্রক্রিয়াটি অবিরাম ও অনিবার্যভাবে অবিরাম ও অনিবার্যভাবে।

চিত্রকর একটি ছবি করবার জন্যে এঁকে থাকেন স্কেচের পর স্কেচ, কবি তাঁর কবিতার জন্যে দ্রুত হাতে টুকে নেন করোটির ভেতরে উড্ডিন পঙ্‌ক্তিসকল; চিত্রকরের সকল স্কেচই পায় না কিছু পটে ব্রাশে রঙে সম্পূর্ণতা; কবির সকল পঙ্‌ক্তিই সজ্জিত হয় না কবিতায়।

চিত্রকরের বেলায় আরো এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া আমি আবিষ্কার করি বহুদিন আগে, যখন প্যারিসে পিকাসোর দেহাবসানের পর পর তাঁর বিশাল এক প্রদর্শনী দেখি; আমি দেখি তেলরঙে আঁকা পিকাসোর একটি চিত্র, দাঁড়িয়ে থাকা নারীর দেহ, সমুখ থেকে সে দৃশ্যমান; কিন্তু সেই চিত্রটি আঁকবার আগে পিকাসো তাঁর নোটবইয়ে এর যে সকল প্রস্তুতি-স্কেচ করেছেন, তাও প্রদর্শিত ছিলো, এবং সেখানে দেখা গেলো— তিনি নারীদেহটিকে সমুখ থেকে আঁকবার জন্যে বেশ কয়েকটি খসড়া করেছেন দেহটিকে বিপরীত দিক থেকে দেখে; আমার মনে পড়ছে, ওই সব স্কেচের পাশে লেখা ছিলো পিকাসোর নিজেরই কথা— একটি দেহকে সমুখ থেকে আঁকবার জন্যে প্রথমেই আমার প্রয়োজন হয় বিপরীত তথা পেছন থেকে দেখবার, কেবল তাহলেই আমি দেহটিকে সমুখ থেকে সবলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি, আর অন্য কোনোভাবে নয়।

বিস্মিত হয়েছিলাম এই তথ্য জেনে; কিন্তু, অচিরেই আবিষ্কার করি যে, কবিও এর সমান্তরাল একটি কাজ করেন বৈকি; কবি তাঁর বলবার কথাটি নয়, কেমন করে বলবেন সেই ভঙ্গিটিকে চারপাশ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরে থাকেন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে। কবির এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট ধরা পড়বে, যদি আমরা জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করি; 'রূপসী বাংলা'র প্রকাশিত সেই পাণ্ডুলিপি গ্রন্থটি খুলে আমরা দেখতে পাবো, জীবনানন্দ কেবল একটি শব্দ বা চিত্রকল্প বা বাক্যই কেটে নতুন করে লিখছেন না, বরং এ যেন একটি ভাব-মূর্তিকে কখনো সমুখ, কখনো পেছন থেকে অবলোকন করছেন।

কবিতা ছাড়া দেবার আর কিছু তো নেই

মনে পড়ছে মির্জা গালিবের লেখা একটি চিঠির কয়েকটি ছত্র। এই মুহূর্তে আমার যে মানসিক অবস্থা, তার সঙ্গে মিল পাচ্ছি; আঠারোশ' পঞ্চাশ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁর এক বন্ধু যিনি 'হাকির' এই ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন, তাঁকে লিখছেন :

ধুলায় গড়া আমার এই দেহের এখন কোনো জীবন নেই, যেমন নেই ধূলি ঝড়ের চঞ্চলতায় যদিও তাকে মনে হতে পারে সপ্রাণ। যেনবা আমি বাগানে এক বুলবুলের

ছবিমাত্র; গোলাপের সুগন্ধ পেয়ে গান গেয়ে সে উঠবে না। কিম্বা এই, আমি এক তলোয়ারের ধার বটে, দুঃশীল ঝড়ের বুকে কোপ মারতে অক্ষম সে বটে। আমার যে হৃদয় ছিলো একদিন উল্লসিত, আজ সে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। কী গভীর ছিলো সেই উল্লাস, আর কী নির্মম কুঠারাঘাতেই না দ্বিখণ্ডিত সে আজ।

একদিন এক নিদ্রাহীন রাতে আমি আমার বিপর্যস্ত চিত্তকে বললাম, আমাকে কণ্ঠ দাও ফিরে, আমি যাবো রাজসন্নিধানে, বলবো, আমি মানুষের ইচ্ছার আয়না, আমি কবি, আমি গাইবো। উত্তর তো এই পেলাম : আরে নির্বোধ, কবিতার সময় তো এ নয়, কবিতার সময় কবে শেষ হয়ে গেছে। যদি তোমার কণ্ঠে এখনো কোনো উচ্চারণ সম্ভব তো বলো— আমি ক্ষতবিক্ষত, আমাকে চিকিৎসা দাও; আমি মৃত, জীবন দাও আমাকে।

মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবের একটি গজলের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখন স্মরণ করে উঠি :

হৃদয়ে অসুখ। ওষুধ কোথাও নেই।
স্বাস্থ্যেই আছি। তবু কিছু ভালো নেই।
সারে ক্ষতমুখ, রক্ত তবুও ঝরে।
চাকা থেমে যায়, তবু চাকা থেমে নেই।
অনুরোধ করি, গালিব, কিছু তো বলো।
এই তো গজল— এ ছাড়া কিছু তো নেই।

এই গজলই সব; এই কবিতাই সব; এইই সব— একজন কবির দেবার। তিনি না বদলাতে পারেন সমাজ, না চালনা করতে পারেন রাষ্ট্র, না পোষণ করতে পারেন একটি মানুষকেও; কিন্তু এই তাঁরই রচনা সমাজের ভেতরে গভীর গোপনে কাজ করে চলে নিঃশব্দে গোপনে, রাষ্ট্র তার স্বপ্ন এবং স্থিতি ফিরে পায় তাঁরই রচনায়, মানুষ পুনরুত্থিত হয়।

এই কথাটি বলতে না বলতেই মনে পড়লো আনাতোল ফ্রাঁসের একটি ছোটগল্পের কথা— *নোৎরদামের বাজিকর*। গল্পটা সংক্ষেপে এই :

ছিলো এক গরীব বাজিকর। পথে পথে খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। দুটো একটা পয়সা ছুড়ে দিলেই সে খুশি। অল্পই তার চাওয়া। বাজির খেলা দেখিয়েই তার আনন্দ। জীবনে আর কিছুই সে শেখে নি, শিখেছে শুধু রঙিন বল আর দড়িদড়ার খেলা, আর চিৎ-উপুড়-গোল হয়ে হাত-পায়ের হরেক রকম বাজি। ওই তার জীবন, ওই তার জীবিকা, ওতেই তার আনন্দ।

ক্রমে বুড়ো হলো সে। শরীরটাও মন্দ হয়ে পড়লো। শীতের একদিন সে ভাঙা শরীর নিয়ে আশ্রয় নিলো এক গীর্জায়। মাতা মেরীর নামে উৎসর্গ করা এই গীর্জা। যাজক যাজিকারা দিনরাত উপাসনায় ব্যস্ত। মাতা মেরীকে তুষ্ট করবার জন্যে প্রাণান্ত তাদের সাধনা। তাদের কেউ সুন্দর হস্তাক্ষরে চিত্রশোভিত করে বাইবেলের পাণ্ডুলিপি

রচনা করছে মাতা মেরীকে নিবেদন করবে বলে। কেউ গীর্জার বাগানটিকে স্বর্গতুল্য করে রচনা করছে, চারা লাগাচ্ছে, জলসেচ করছে। কেউবা মাতা মেরীর মূর্তির বেদীটিকে দীপে ধূপে সুন্দর করে তুলছে। বুড়ো সেই বাজিকরেরই কিছু দেবার নেই, করবার নেই মাতা মেরীর জন্যে। কিন্তু তারও বাসনা মাতা মেরীর জন্যে সেও কিছু করে, তাঁর পায়ে সেও তার অর্ঘ্য ঢালে। সে তো বাজি দেখানো ছাড়া আর কিছুই জানে না। একদিন সে স্থির করলো এই বাজিই সে উৎসর্গ করবে মাতা মেরীকে। একদিন যখন গীর্জার ভেতরে কেউ নেই, সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত, বাজিকর নিঃশব্দে এসে বসলো মাতা মেরীর মূর্তিটির চরণপ্রান্তে। তারপর— দেখাতে লাগলো তার বাজির খেলা। পড়ে গেলো এক যাজকের চোখে সে হঠাৎ। যাজক উঠলো ক্ষিপ্ত হয়ে। ডেকে আনলো সে আর সব যাজক যাজিকাকে। এ যে রীতিমতো মাতা মেরীকে নিয়ে ঠাট্টা! ঈশ্বরের সন্তান যিশুর পবিত্র কুমারী মাতা মেরীর সামনে সামান্য ওই বাজিকরের বাজি দেখানো! ব্যাটাকে এক্ষুনি ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই কর্তব্য। তবেই রক্ষা হয় মাতা মেরীর সম্মান। ছুটে এলো তারা বুড়ো বাজিকরকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে, আর তক্ষুনি ঘটে গেলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। পাথরের মূর্তি মাতা মেরী হয়ে উঠলেন জীবন্ত। তিনি নেমে এলেন বেদি থেকে। মুখ তাঁর পবিত্র করুণায় স্মিত। বাজি দেখাতে দেখাতে বুড়ো বাজিকরের কপালে জমেছে ঘাম। মাতা মেরী ধীরে এগিয়ে এসে তাঁর কপাল থেকে সস্নেহে মুছিয়ে দিলেন শ্রমের সেই স্বেদবিন্দু। গ্রহণ করলেন তার বাজি-নিবেদন ভক্তের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে। সেই বাজিকরের মতো— গালিবের মতো— পৃথিবীর সকল কবিরই সমাজকে মানুষকে রাষ্ট্রকে সভ্যতাকে দেবার কিছুই নেই কবিতা ছাড়া।

ভাব ও ছন্দ

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আকাশের ওই ওপরে দাঁড়িয়ে আছে স্থির একটি আলো, সন্ধ্যাতারা এখনো কি বলা যাবে তাকে ?— এখন অনেক রাত, আকাশে শাদা শাদা মেঘ, সেই মেঘে চাঁদের আলো পড়ে সন্তের চুলের মতে দেখাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না চাঁদটিকে, গভীর চুলের ভেতরে সে হারিয়ে গেছে, গ্রামগভীরে এই বাড়িটির দ্বিতলে আমি আজ রাতের মতো আশ্রয় পেয়েছি, আজ রাতটিতে ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার, চারদিকে তরঙ্গের মতো এই যে গড়াচ্ছে কুয়াশা আর চাঁদের আলো, মাঠের ওপর কুয়াশার ঘন বিস্তারের ভেতর থেকে এই যে একবার দেখা দিচ্ছে গাছ, আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আর হঠাৎ ওই পাখিটির ডাক, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, মানুষ তার নিজের আর্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে পাখির স্বরটিকে, আমি দ্বিতলের বারান্দায়

বেরিয়ে এসে অনুভব করি পৌষের কনকনে শীতের ভেতরে এক ধরনের উষ্ণতা, এই উষ্ণতার ভেতরে সৃষ্টির তাপ টের পাই, যেন পৃথিবীর গহ্বর থেকে উঠে এসে গাছ শস্য নক্ষত্র স্পর্শ করে আছে, ওপাশে একটি পুকর, সেই পুকুরে কোথা থেকে ছোট্ট একটি আলো এসে তার কুয়াশা-ঘষা প্রতিফলন নিয়ে টলটল করছে, দীপ্তিময় আঙুলের মতো জলের অতলে পৃথিবীর নাভির দিকে ইঙ্গিত করে আছে সে, আমি দূরে ভালো করে দৃষ্টি যদি দিই দেখতে পাই সাঁকো, পিঠ উঁচু করে বিশাল সজারুর মতো হামা দিয়ে আছে, আমার চোখের ভেতরে চিত্রের পর চিত্র খেলা করছে, আমার রক্তের ভেতরে লাল কণিকা সমূহ সবুজ বলে এখন অনুভব করছি, আমার হাত থেকে উদ্ভিদের সুবাস টের পাচ্ছি, আমার দেহের ভেতরে ক্রমেই এমন এক ভারহীনতা বড় হচ্ছে যেন আমি অচিরেই ভেসে যাবো কুয়াশার ভেতর দিয়ে দূরে ওই স্থির আলোটির দিকে, যাবো, তবু আমার ছায়াটির জন্যে বড় কাতরতা ঝরে পড়বে, পাখিটি আবার ওঠে ডেকে, পিউ কাঁহা, আমার স্মরণ হয় আমরা এমত আরোপিত অনুভবের ভেতর দিয়েই ক্রমাগত অগ্রসর হই। আরোপিত— কিন্তু এই আরোপ-ক্রিয়া থেকেই তো কবিতা!

পায়ের পাতায় সজল স্পর্শে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে যায়; অবিকল এই কথাটি সেইদিনই ভোরে আমার ঘুমজড়ানো মাথায় এসেছিলো; লিখে ফেলবার পর এখন পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করি, বাক্যটিতে ছন্দের দোলা আছে, কবিতার পংক্তির মতো বেশ পড়ে নেয়া যায়— 'পায়ের পাতায়— সজল স্পর্শে— অন্ধকারে— ঘুম ভেঙে যায়।'

তবে কি কবিতা লিখতে লিখতে আমাদের একটা অভ্যেস হয়ে যায়, ইংরেজিতে যাকে বলে রিফ্লেক্স, ছন্দ ব্যবহারের ? এবং এমনই এ অভ্যেস যে, উচ্চারণ না করেই আমরা আমাদের করোটির ভেতরে শব্দগুলোকে একটি দোলা-বিন্যাসে চয়ন ও বয়ন করে চলি ?

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কবিতাটির কথা, যার শুরু, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী'। তখন ঘোর অসুস্থ তিনি, সেই প্রভাত বেলায় তখন তাঁর জ্ঞান প্রায় লুপ্ত, তখনো তো তিনি ছন্দেই শব্দগুলোকে করোটির ভেতরে ধরেছেন, এবং কেবল তাই নয়, বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক ছন্দরূপটিই নির্ণয় করে নিয়েছেন!

আচ্ছা, একজন কবির পক্ষে এ হয়তো সত্যি, কিন্তু কবিতা যাঁরা লেখেন না, তাঁদের বেলা ?

প্রত্যেক ভাষার স্বাভাবিক একটি ছন্দ আছে, বাংলারও আছে; কেউ কেউ বলেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, যে, বাংলা সংলাপে ছড়ার ছন্দের চাল লক্ষ করা যায়; আমার নিজের মনে হয়েছে, আমাদের প্রতিদিনের সংলাপে পয়ারের চাল স্পষ্ট; কবিতার অনেক পরে যখন আমি কাব্যনাট্য লিখতে শুরু করি, বাংলা ভাষার এই চলন ও চাল নিয়ে খুব ভাবতে হয় আমাকে; এখনো ভেবে চলেছি। আমার

কবিতাতেও আমি যে এ বিষয়ে আমার বা রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণে পুরোপুরি সত্য দেখি নি, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমার নিজেরই অনেক কবিতায়, যেগুলো আমার নিজের কাছেই ভালো কবিতা হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছে। এইসব কবিতায় আমি ব্যবহার করেছি গদ্যছন্দ এবং বারবার পাঠে আবিষ্কার করেছি, ওইসব কবিতায় ব্যবহৃত গদ্যছন্দে— গদ্যছন্দ মানেই যেহেতু ছন্দহীনতা নয়— তারা এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পয়ারের, কখনো কখনো ছড়ার চাল, তবে পয়ারই বেশিরভাগ।

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম বিষয়টি নিয়ে এবং এরকম একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম— আমাদের সাধারণ কথায় থাকে ছড়ার চাল, কিন্তু একটু ভেবে, একটু হিসেব করে, একটু আনুষ্ঠানিকভাবে যখন আমরা কথা বলি তখনই এসে যায় পয়ার। কাব্যনাট্য লিখতে গিয়ে দেখেছি, আঞ্চলিক ভাষায় এমত আনুষ্ঠানিক উচ্চারণও যেন ছড়ার চালেই বেরিয়ে আসে। এই বেরিয়ে আসাটা কতটা স্বাভাবিক, সেটি পরীক্ষা করবার জন্যেই *পরানের গহীন ভিতর* সনেটমালায় আমি আঠারো মাত্রার পয়ার ব্যবহার করি এবং আরো নিবিষ্ট ও শাসিত পরীক্ষার জন্যে সনেটের ফর্ম নিই; এবং মনে হয় উৎরে যাই।

তবু বলি, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ এখনো আমি স্থির নির্ণয় করতে পারি নি। ভাষা বদলায়, মানুষ বদলায়, কাল বদলায়— যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাই সব বদলে দেয়। যে-বাংলা ভাষা এখন আমরা ব্যবহার করছি তার চাল ও চলন ক্রমাগত পরিবর্তিত কাল ও অভিজ্ঞতার কারণেই বদলে যাচ্ছে, গেছে— রবীন্দ্রনাথ থেকে তো অনেক বদলে গেছে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। 'নতুন' এই বাংলা ভাষার ছন্দ-চাল এখন আমাদের এ কালে কেমন, এ যদি আমরা বুঝে উঠতে না পারি তাহলে কবিতায় ও কাব্যনাট্যে, এবং কথাসাহিত্যেও— কারণ একালে কথাসাহিত্য আবার ফিরে যেতে চাইছে তার মূল রূপ মহাকাব্যের মেজাজের দিকে— আমাদের নতুন ও নিজস্ব কাব্যভাষা উপস্থিত করতে আমরা এখনো ব্যর্থই থেকে যাবো।

কবিতার কিমিয়া : টুকরো কিছু কথা

১. একটি কবিতা লেখার পর নিজেই সে কবিতাটিকে বিচার করা যেতে পারে চারটি দিক থেকে। কবিতাটি কি কবিতা হয়েছে? নিজেরই লেখা আগের কবিতা-সকলে এ কবিতাটির অবস্থানটি কেমন— এগিয়েছে, পিছিয়েছে, একই বৃত্তে আছে? বাংলা কবিতার একটি সমকালীন ধারা আছে; সেই ধারাতেই বা এ কবিতাটি স্থান করে নিতে পারছে? পুরোপুরি জানি বা না জানি, এই মুহূর্তে কবিতার একটি বিশ্বমান আছে, সেখানেই বা কবিতাটি দাঁড়াতে পারবে কি?

২. একটি কবিতা পড়ে তার অর্থ খোঁজা কর্তব্য নয়। বরং সঙ্গত এই ও এতটুকুই যে, কবিতাটি কীভাবে আমাকে স্পর্শ করছে; কবিতাটি কতখানি আমাকেই স্থানচ্যুত করছে গভীরতর অর্থে।

৩. কবিতার কাছে বাণী পেতে চাই না, পেতে চাই অভিজ্ঞতা। পাঠক-শ্রোতার ভেতরেই যে-অভিজ্ঞতা আছে কুয়াশার মতো অনির্দিষ্ট শরীরে, তাকে আকার ধরে উঠতে সাহায্য করা চাই কবিতার।

৪. কবিতার জন্যে সত্যিই যদি কারো টান থাকে তো, কবিতা সে কেবল পড়তেই চাইবে না, কবিতার ভেতরে সে নিঃশ্বাস নিতে চাইবে। কবিতা যাকে স্পর্শ করে সে আসলে জীবনেরই স্পর্শ পায়। কবিতায় যে বাঁচে, জীবনেও সে বাঁচে। দুঃখময় কবিতাও আমাদের গভীর অর্থে সুখী করে।

৫. কবিতা যেন একটি অভিনয়-অনুষ্ঠান। শব্দসকল এর চরিত্র, ছন্দ এর আলোকসম্পাত, ধ্বনিসঙ্গীত এর দৃশ্যসজ্জা, স্তবক এর বেশভূষা। এর প্রেক্ষাগৃহ আমাদের মনন-সমন্বিত বীক্ষা, অনুভব এর মঞ্চ।

৬. কোনো কবিতাই দুর্বোধ্য নয়, যে-অর্থে দুর্বোধ্য নয় দাবাখেলা। দাবাখেলার প্রতিটি ঘুঁটির চাল যদি একেকরকম হয়, যদি এর দান হয় জটিল অংকচিন্তাসাধ্য, তবে তা যেমন সেই জটিলতা ভেদ করে জয়ে পৌছুনোর জন্যে, কবিতাও ঠিক তাই। কবিতার জটিলতা উপলব্ধির জটিলতাকে প্রাঞ্জল করবার জন্যেই। কবিতার দুর্বোধ্যতা জীবনের দুর্বোধ্য কিছুকে সুবোধ্য করবার কারণেই।

৭. বিষয় ও আঙ্গিক— কবিতায় আছে দুটোই; আলাদা করবার উপায় নেই। কবি ডব্লু বি ইয়েটসের অসামান্য সেই পঙ্‌ক্তি দুটি— *ও বডি সোয়েড্ টু মিউজিক, ও ব্রাইটেনিং গ্লাস / হাউ ক্যান উই নো দা ডান্সার ফ্রম দা ডান্স ?*— নৃত্য থেকে নর্তককে আলাদা করবো কোন উপায়ে ? করাই যায় না। নৃত্যই নর্তক, নর্তকই নৃত্য।

৮. একজন জীবনানন্দের চিত্রকল্পে *পাখির নীড়ের মতো চোখ* তুলেছিলো বনলতা সেন। একেকটি চিত্রকল্প যেন একেকটি ঢিল— ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে জলের বুকে— কবিতার পঙ্‌ক্তির শরীরে। তারপর ক্রমাগত ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গতি আছে তার। বৃত্তও আছে। বৃত্ত সে রচনা করছে। বৃত্তটি ছোট থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে। হতে হতে সে পাড়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসছে কেন্দ্রের দিকে— সবটাই ফিরে

আসছে না— কিছুবা পাড়েই অবসিত হয়ে পড়ছে, কিছুবা যাত্রা করছে ফিরতি পথে। আর, কেন্দ্রটিও এখন আর নয় স্পষ্ট, যতখানি সে স্পষ্ট ছিলো ঢিলটি ছুঁড়ে দেবার মুহূর্তে। নীড় ভেঙে বনলতাই তখন সত্য, অথবা নীড়েই সে সত্য হয়ে রইলো— চিত্রকল্পের যতটুকই ফিরে এলো আবার তার কেন্দ্রে— ওইখানে।

৯. বাজিকর একটি বল হাতে নেয়, নাচায়, তারপর দুটি, তিনটি, চারটি, এবং আরো আরো— সবই তার হাতে নেচে ওঠে, হাওয়ায় ওঠে পড়ে, হাতে ফিরে আসে, মাটিতে পড়ে যায় না; রচিত হয় এক বিস্ময়। কবিতারও প্রতীক-রূপ-চিত্রকল্প ঠিক এমনই; একটিও হাত ফসকে— কবিতা ফসকে— পড়ে যাবার উপায় নেই— পড়ে গেলেই ভেঙে যাবে ইন্দ্রজাল। শামসুর রাহমানের *স্বাধীনতা তুমি* কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে। পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি আলাদা করে দেখলে মনেই হতে পারে যেন তালিকার পর তালিকা— কিন্তু ওরা সেই বাজিকরের হাতে বলের পর বল— একটার পর একটা ছুঁড়ে দেয়া উর্ধ্বে; ওই সবটা নিয়েই খেলা— ওই সব চিত্রমালা ধরেই হয়ে ওঠা একটি চিত্র— স্বাধীনতা তুমি— এই তুমি-টারই রূপচিত্র হয়ে উঠছে কবিতাটি।

১০. প্রতিটি মানুষ, যারই আছে আবেগ এবং ভাষা, নিশ্চয় তার কবিতা বিষয়ে কিছু না কিছু জানা আছে— হতে পারে তার সূত্র বিদ্যালয়ে সাহিত্যপাঠের কবিতাংশে পড়া, নিশ্চয় তা মায়ের মুখে শোনা পদ্য আর ছড়া, অথবা হঠাৎ কোথাও একটি কবিতা শোনা বা পত্রিকায় পড়ে ওঠা। কিন্তু যতটুকই সে জানে তা স্পষ্টজ্ঞান নাও হতে পারে— সাধারণত না হওয়াটাই স্বাভাবিক, তার ভেতরে এই জানাশোনাটির উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন সে নাও থাকতে পারে— আবারো, না থাকাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু একবার যদি সে এমন একটি কবিতা শুনে ওঠে, একবার যদি সে পেছন ফিরে এমন একটি কবিতা স্মরণ করতে পারে যা সে ছোটবেলায় পড়েছে বা শুনেছে— তার ভেতরে একটা বদল ঘটে যায়। সে তখন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে কবিতার শক্তি— কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। এই কিছুক্ষণটাকে দীর্ঘক্ষণ করবার জন্যে সে প্রেরণাও অনুভব করতে পারে। এই প্রেরণাই একজনকে কবিতার পাঠক করে তোলে অতঃপর। তাগাদা দিয়ে, কবিরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেও একজনকে কবিতার পাঠক করে তুলতে পারেন না, যদি না সেই একজনটি নিজেই হঠাৎ আবিষ্কার করে উঠতে পারে কবিতার শক্তি।

১১. একজন কবির একটি কোনো কবিতা যদি বুঝে ওঠা না যায়, যদি তার বিদ্যুতটি অনুভব না করা যায়, তবে আমাদের কর্তব্য হয় ওই একই কবির অন্য কবিতাগুলোরও পরিচয় নেবার। অর্থাৎ একটি কবিতা পড়েই একজন কবিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া উচিত নয়, তাঁর আরো রচনা পড়া চাই। তখন আশা করা যেতে পারে

প্রথম ওই না-বোঝা না-ভালো লাগা কবিতাটিও অনুভবের ভেতরে এসে পড়বে। একটি কবিতাই একজন কবির সব নয়, তাঁর সব কবিতা নিয়েই তিনি কবি।

১২. উপন্যাসের বেলায় আধখানা পড়েই ছেড়ে দেয়া যায় ভালো লাগছে না বলে, নাটকও আধখানা দেখেই ভালো লাগছে না বলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা নেই— কিন্তু কবিতা সাধারণত আকারে ছোটমাপের বলে ভালোই লাগছে-না-লাগছে-না করেও পুরোটা শোনা বা পড়া হয়েই যায়। তাই কবিতার সব সমালোচনাই সাধারণজনের শুরু হয় 'কবিতাটি আমার ভালো লেগেছে' কিম্বা 'কবিতাটি আমার ভালো লাগে নি' দিয়ে। এর অধিক তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। উপন্যাসটি জমে নি, তারা বলতে পারে। নাটকটি ধীর বা চমকপ্রদ নয়, তারা বলবে। কিন্তু কবিতার বিষয়ে জমিয়ে তোলা বা চমকপ্রদ— এমন মন্তব্য শোনা যাবে না। অনেক কবিকেই তাই দেখা যায় কবিতাকে জমিয়ে তুলতে নৃত্যপর ছন্দ এবং চমকানো চিত্রকল্প প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করছেন। এ দুইই কবিতাকে ক্ষুন্ন করে; কবিকে কবি নয়— মনোহারি দোকানদারে পরিণত করে।

১৩. কবিতা কেবল শব্দ দিয়ে রচিত নয়, শব্দের সমাহার নয় কবিতা। কবিতায় আছে প্রতীক, আছে রূপকল্প চিত্রকল্প। অধিকাংশ পাঠকই কবিতার ভেতরের এই আবশ্যিক উপকরণগুলো লক্ষ করতে পারে না। কবিতাকে যে নিছক শব্দগাঁথাই মনে করা হয় তার কারণ, আমরা আমাদের সব চিন্তাভাবনা শব্দ দিয়েই করি। কিন্তু ক'জন লক্ষ করি যে, আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তাতেও আছে প্রতীক আর রূপকল্প চিত্রকল্পের অনবরত ব্যবহার ? একটি দুটি উদাহরণ দেয়া যাক— প্রেমে পড়া-র ভেতরে ওই *পড়াটাই* কি একটি চিত্র নয় ? *সোনামুখ* করে কেউ কথা যখন বলছে তখন কি রূপকল্পই আমরা দেখছি না ? আমাদের *পতাকা* যখন তুলে ধরছি, একটি প্রতীকই কি সেটি নয় ?

১৪. কবি তাঁর কবিতায় যা করেন— নতুন প্রতীক, নতুন চিত্রকল্প, নতুন রূপকল্প তৈরি করেন। নতুন ও নিজস্ব। ওই নিজস্ব আর নতুনত্বের জন্যেই এ সকল আপাতদৃষ্টে অদ্ভুত মনে হতে পারে— হয়েও থাকে। কিন্তু একদিন ওই সকলই আমাদের প্রাত্যহিক কথাবার্তাতেও এসে যায় আমাদেরই অলক্ষে। এভাবেই নজরুলের *দুর্গমগিরি কান্তারমরু-র* 'কাণ্ডারী' রূপকল্পটি সাধারণের সাধারণ কথাতে এসে যায়। লাগাই বাংলার বিশেষণ হিসেবে জীবনানন্দের *রূপসী* শব্দটি, অধিক কি— রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলাকে *সোনার বাংলা* বলাটাও ছিলো আমাদের কল্পনার বাইরেই।

১৫. প্রতীক শুধু কবিতার নয়, ইতিহাসেরও, সংস্কৃতিরও। এমনকি অংকের সংখ্যাও প্রতীক হয়ে ওঠে— একুশে, একাত্তর। পতাকা প্রথমে জাতির স্বপ্ন প্রকাশ করে, পরে স্বাধীনতা আন্দোলন বা যুদ্ধের প্রতীক হয়ে ওঠে— তারপর সে রাষ্ট্রকেই চিহ্নিত করে। এ সবের ভেতরে আবেগের যে একটা চাপ ও ক্রিয়া বর্তমান, কবিতার ভেতরে প্রতীকেও— চিত্রকল্পেও তা থাকে, একই মাত্রায়, কিন্তু বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত হয়ে। বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত— কিন্তু তার অভিপ্রায় ও যাত্রা সকল মানুষের দিকে। শামসুর রাহমানের *আসাদের* শার্ট কবিতাটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ওই শার্ট আসাদেরই ব্যক্তিগত, ওই শার্টের দিকে শামসুর রাহমানের দৃষ্টিপাতও বিশিষ্ট— কিন্তু এই শার্টই হয়ে ওঠে প্রতীক এবং যাত্রা করে আমাদেরই লোকসকলের স্মৃতি ও ইতিহাসের দিকে।

১৬. কথা বলবার জন্যে আমরা শব্দ ব্যবহার করি; কবিরাও তাই করেন। আমরা ঠিক-ঠিক শব্দ ভেবে না পেলে কাউকে জিগ্যেস করি কিম্বা অভিধানের পাতা ওলটাই। কবি তাঁর শব্দের জন্যে নিজের ভেতরে প্রবেশ করেন। কারণ ? কবির কাছে শব্দ, শব্দ নয়— কয়েকটি লক্ষণ ও ব্যঞ্জনা ধরেই একেকটি শব্দ এবং অভিধানে তা পাওয়া যাবে না। কবি জানেন, একেকটি শব্দ একেকটি অনুভব; মাছ, মাছ নয়, মাছের অনুভব; দেশ, দেশ নয়, দেশের অনুভব; তুমি, তুমি নয়, তুমি-র অনুভব। কবি জানেন, শব্দ ধ্বনিসঙ্গীত ধরে; শুষ্কং কাষ্ঠং শুকনো কাঠ, নিরস তরুবরও শুকনো কাঠ; দুটোর ধ্বনিসঙ্গীত আলাদা— শুষ্কং কাষ্ঠেই যেন শুকনো কাঠ খটখট করে উঠছে, নিরস তরুবরে নয়। কবি জানেন, একেকটি শব্দ হচ্ছে সেই ভাষাভাষী জাতির ইতিহাস-সভ্যতা-সংস্কৃতির সাঁটলিপি; কৃষ্ণচূড়া এ বাংলাদেশে শুধু ফুল নয় ভাষা আন্দোলনকে ধরে; রক্ত এ বাংলাদেশে একাত্তরকে ধারণ করে; গায়ে হলুদ শরীরে হলুদ লেপন নয়, বিয়ের খবরটা পৌঁছে দেয়। এবং কবি জানেন, শব্দ আসলে চিত্র; মূর্ত বিমূর্ত সকল শব্দই যে চিত্র তা যে-কোনো শব্দের মূল বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসবে। শব্দের ওই অনুভব, ওই ধ্বনিসঙ্গীত, ওই সাঁটলিপি, ওই চিত্রই— কবিতা লিখতে গিয়ে যদি শব্দ সন্ধানই করেন কবি তো ওইসকলই সন্ধান করেন এবং তাঁর পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করেন।

১৭. কবিতার বিষয় বাস্তব হলেও, কবিতার সারসত্তা অতিক্রম করে যায় সমূহ বাস্তবতাকেই। কবিতায় পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে শব্দের অনুভব, ধ্বনিসঙ্গীত, সাঁটলিপি ও চিত্র একে চায় অপরকে, আর তখনই প্রতিদিনের ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে যায় কবিতার ভাষা— এমনকি চলতি মুখের ভাষায় কবিতাটি লেখা হলেও; অনেকটাই সঙ্গীতের মতো সে শুদ্ধস্বরের হয়ে ওঠে— তার স্তরান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথের *পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর*-ও এর প্রতিটি শব্দের সামান্য

সাধারণত্ব সত্ত্বেও কবিতার উচ্চারণে তারা উত্তীর্ণ ও উড্ডীন হয় সঙ্গীতের মতো। এবং বাস্তবতা বর্ণনা করেও অতিক্রম করে যায় বাস্তবতা, কিন্তু প্রবিষ্ট হয়ে যায় গূঢ় সত্য এক আশ্চর্য বাস্তবতার ভেতরে— চিরকালের মতো।

১৮. কবি ডব্লু এইচ অডেন বলেছেন, কবিতা লেখার আশা করতে হলে শব্দের চারধারে থাকা চাই, শোনা চাই পরস্পর কী তারা বলে। অডেন আরো বলছেন, *কবিতাকে চিত্রের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য করবার প্রয়াস আমাদের নিয়ে যায়— যে, ক হচ্ছে খ-এর মতো, গ হচ্ছে ঘ-এর মতো, চ হচ্ছে ছ-এর মতো।* তিনি বলছেন, *এও যথেষ্ট নয় যে যা আমি লিখেছি তা কেবল সত্য; আমার নিজের কাছে তৃপ্তিকর হতে হলে কবিতাটিকে হতে হবে সার্বভৌম।*

১৯. আমার ধারণা, একটি কবিতার ওই সার্বভৌমত্ব আসতে পারে কেবল তখনই যখন কবি শব্দের চারিত্র ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেন। শব্দের চারিত্র যেমন আছে, তেমনই আছে তার স্পর্শ এবং ভার। কোনো শব্দ ভারী, কোনো শব্দ নির্ভার। কোনো শব্দ খসখসে, কোনো শব্দ মসৃণ। কোনো শব্দ নিরেট, কোনো শব্দ প্রতিধ্বনিময়। এমনকি, কোনো শব্দ গোল, কোনো শব্দ চৌকো! এর প্রতিটিই কোনো না কোনো কাজে লাগে— লাগানো চাই। কিছু শব্দ কবিতায় ব্যবহারই করবো না, এটা হয় না। বাতিল শব্দ বলে কিছু নেই। তবে, হ্যাঁ, বাতিল হয়ে যায় কোনো শব্দ যখন তা একজন পূর্ববর্তী কবির কবিতায় এমনভাবেই খেটেছিলো যে পরিণত হয়ে গেছে ক্রীতদাসে। রবীন্দ্রনাথের বহু শব্দই এখন আমাদের কাছে বাতিল হয়ে গেছে— কারণ সে সকলের ওপর পড়ে গেছে তাঁর সিলমোহর।

২০. কবিতায় বাক্য গঠনের বেলাতেও একই কথা। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান— কবিতায় এঁদের বাক্যগঠন ও বাগ্‌ধারার এমনই এক নিজস্ব রূপ লক্ষ করি— যাকে বলি ওঁদের কাব্যভাষা— যে, অপর কেউ অমন লিখলে তার কবিতা ছাড়িয়ে ওঁদেরই কাউকে মনে পড়বে। আমরা যে বলি রাবীন্দ্রিক বা জীবনানন্দীয় সুর— সেটা ওঁদের ওই বাক্যগঠন ও বাগ্‌ধারা থেকেই প্রধানত আমরা ধরে ফেলি।

২১. আইরিশ কবি ডোনাল্ড ডেভি ভাষা ও কাব্যভাষা নিয়ে বলেন, তফাতটা আসলে বাক্যগঠনেরও নয়, ক্রিয়াপদ স্থাপনের এবং শব্দ নির্বাচনের। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে কবিতা লিখেও ঠিক গদ্যের চারিত্রে ক্রিয়াপদ না বসাবার দিকেই বরাবর ঝুঁকে ছিলেন। শামসুর রাহমানেরও ঝোঁক ক্রিয়াপদকে গদ্যের চালে না বসাবার— তাঁর গদ্য কবিতাতেও। এটি হয়, সম্ভবত, কবিতাটির ধ্বনিসঙ্গীত তৈরির নিজস্ব বিশিষ্ট

সুরবিস্তারের পক্ষপাতে। কিন্তু শব্দ নির্বাচন ? কাব্যিক আর অকাব্যিক বলে শব্দের একটা জাতবিচার এখনো কেউ কেউ করে থাকেন। আসলে সব শব্দই কাব্যিক। এমনকি সম্ভাষণে সুপ্রাচীন লো শব্দটিও যে একালেও বর্জনযোগ্য নয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার প্রমাণ রেখেছেন বহু কবিতায়। ডোনাল্ড ডেভি বলছেন, অকাব্যিক শব্দ বলতে আমরা যেটি ধরে নিই, তা হচ্ছে আর কিছু নয়– শব্দটা এই বিশেষ কবিতায় বিষয়ের সঙ্গে মিলছে না। এমন অকাব্যিক শব্দের দুটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন হোমার থেকে। হোমার তাঁর ইলিয়ড কাব্যে বীর অ্যাজাক্সকে উপমা দিতে গাধা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, আর অডিসি কাব্যে ইউলেসিসের চিত্রকল্প তৈরি করেছিলেন— যেন আগুনে ঝলসানো হচ্ছে বৃষমাংস। ডেভি বলছেন, গাধা এবং বৃষমাংস শব্দ দুটি অকাব্যিক নয়, ওই দুই বীরের বর্ণনাক্ষেত্রেই তারা হয়ে গেছে অকাব্যিক।

২২. কাব্যভাষা— সরল বা জটিল— প্রথাগত বা প্রথাভাঙা— যাই হোক না কেন, আমাদের যাপিত জীবনের মতোই এর ব্যাখ্যা করা মুশকিল, ব্যাখ্যা চাওয়াটাও বোধহয় বোকামিই। এতটুকুই বলা যায় যে, জীবন যেমন গভীরতা ও জটিলতা নিয়ে উপস্থিত, কাব্যভাষাও তাই। জীবনকেই বা ক'জন আমরা বুঝি ? কাব্যভাষা— কবিতা বোঝা তো পরের ব্যাপার।

২৩. একটি ভালো কবিতা যখন দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তখন সেটি তার দৈন্য নয়, ওইটিই তার প্রাণ। জীবনই যখন দুর্বোধ্য, জীবনের অর্থ খোঁজাই যখন অনেকে মনে করেন বিড়ম্বনা, এবং অধিকাংশই মনে করেন অপ্রয়োজনীয়— মনে করেন, শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকা আর পরিবার পোষণ করাটাই জীবন; তখন কবিতা ওই তথাকথিত দুর্বোধ্যতা যে তাঁরা ঘুচিয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন, এ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

২৪. সুবোধ্য বা দুর্বোধ্য যাই হোক, একটি ভালো কবিতা তার স্বর শব্দ ও ধ্বনি ধরে আমাদের খানিকটা হলেও প্রথমত ছন্দ-বিস্ময়, দ্বিতীয়ত ভাষা-বিস্ময়, তৃতীয়ত— এখানেই আর স্পষ্ট করে বলা শক্ত— আমাদের নিয়ে যায় এমন একটা স্তরে যা কোনো না কোনো অর্থে আমরা প্রাত্যহিকের উর্ধ্বে বলেই অনুভব করে উঠি— এমনকি একজন সাধারণ পাঠকও।

২৫. স্মরণ করা যেতে পারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই চিঠি, তাঁর বন্ধু রাজনারায়ন বসুকে লিখছেন ইংরেজিতে— বাংলায় এরকম : তোমাকে একটা মজার ছোট্ট ঘটনা বলি। কয়েকদিন আগে আমাকে চীনাবাজারে যেতে হয়েছিলো। সেখানে

দেখলাম দোকানের একটা লোক মন দিয়ে *মেঘনাদ* পড়ছে। ভেতরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী পড়ছেন ? লোকটা ইংরেজি ভালোই বলে। বললো, মশাই, আমি একটা নতুন কাব্য পড়ছি। আমি বললাম, কাব্য! আমি তো জানি আপনাদের ভাষায় কাব্য বলে কিছু নেই। সে বললো, সে কী, মশাই, এই যে কাব্যটা পড়ছি, এ আমাদের জাতির জন্যে গৌরব। আমি বললাম, তবে খানিক পড়ে শোনান তো দেখি। দোকানের লোকটি তখন আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললো, মশাই, আমার মনে হয় না আপনি এ কবির মর্ম বুঝতে পারবেন। জবাবে আমি বললাম, শুনেই দেখি না! তখন সে দ্বিতীয় সর্গের সেই জায়গাটা আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলো যেখানে কামদেব ফিরে গেছে রতির কাছে, দাঁড়িয়ে আছে শিবের প্রাসাদের হাঁতির দাঁতে তৈরি তোরণের বাইরে, রতি তাকে বলছে— *বাঁচালে দাসীরে / আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।* কী চমৎকার করেই না আবৃত্তি করলো লোকটি। মনে মনে ভাবলাম ওই তাদের কথা যারা নিজেদের বিদ্বান আর পণ্ডিত ভাবে। লোকটির হাত থেকে বইখানা নিয়ে, তাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে, আমিও খানিক আবৃত্তি করে শোনালাম। ব্যগ্র হয়ে সে তখন জিগ্যেস করলো কোথায় আমি থাকি ? যা হোক তাকে একটা উত্তর দিলাম। আমি তো নতুন লোকের সঙ্গে মাখামাখি করে ওঠাটা বিরক্তিকরই মনে করি। করমর্দন করে বিদায় নেবার সময় প্রশ্ন করলাম, কী! অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলায় চলবে তো ? সে উত্তর দিলো, বলেন কি, মশাই ? চলবে না মানে ? এর তুল্য ভাবের ছন্দ বাংলায় আর হয় না। —আমরা কি বলবো না, ছন্দটাই শুধু নয়, সে তো আছেই, তার স্পন্দন, সেই স্পন্দনের মাত্রা ধরে কবিতাটিই একজন সাধারণ পাঠক, এমনকি মুদি দোকানের একটি লোককে কতখানিই না স্পর্শ করেছিলো। আর এই স্পর্শ করাটা তো নিরুত্তাপ নয়, বেগহীনও নয়— ওই লোকটিকে প্রাত্যহিক থেকে কিছুটা হলেও উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিলো। কবিতার এটাই এক কাজ।

২৬. কবিতার ভাষা দ্বিজ ভাষা; লোকমুখ থেকে কবির জিহ্বায় তার দ্বিতীয় জন্ম হয়।

২৭. প্রতিটি শব্দেরই যেমন থাকে তার বাচ্যগত আর গুণগত দিক, দুটোই— কবিতারও প্রতীক, রূপকল্প, চিত্রকল্প এ সকলেরও আছে ওই দুটি দিক। জীবনানন্দের 'পাখির নীড়ের মতো' একস্তরে শুধুই বাচ্য, আরেকস্তরে সে বাচ্যের উর্ধ্বে একটি গুণবাচক। বাচ্যকে অস্বীকার করে বিশুদ্ধ গুণবাচক হবার কোনো উপায়ই নেই কবিতার কোনো শব্দ-কল্পের। নইলে তবে শুধু ক্রন্দন বা অট্টহাসিও কাব্য পরিচয় পেতো। কবিতার এক কিমিয়া এখানেই যে সে শব্দকে শব্দ-কল্পকে দুই স্তরে স্থাপন করতে পারে একই সঙ্গে। এবং এই স্থাপনাতেই ঘটে যা কিছু ইন্দ্রজাল— কবিতার। সহজ কিন্তু আশ্চর্য একটি কবিতা-পঙ্‌ক্তির দিকে তাকানো যাক। কবি রবার্ট বার্নস যখন বলেন, 'মাই লাভ ইজ লাইক আ রেড রোজ'– আমার প্রেম লাল গোলাপের

মতো— পঙ্‌ক্তিটি যে শোনে, কীভাবে সে গ্রহণ করে ? গোলাপ সে চেনে, লাল গোলাপও সে দেখেছে, কিন্তু কবির ওই 'আমার প্রেম' সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, যদিবা জানে— তার নিজের প্রেমের কথাই সে জানে; কিন্তু ওই 'আমার প্রেম লাল গোলাপের মতো' শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে বার্নসের প্রেমটি যেমন বিশেষিত হয়ে যায়, শ্রোতার নিজের প্রেমটিও একই সঙ্গে হয়ে ওঠে বিশেষিত। কবিতায় শব্দ আর শব্দ-কল্প এভাবেই বাচ্য থেকে গুণগত পরিবর্তনের দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

২৮. 'কবিতা আমাদেরই এক আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটায়'— রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। তিনি নিজেই পুনরুত্থিত হয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষে, শেষ কবিতায়।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।

তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসজাত বোধির ভেতরে ওই ছলনাজাল— এই প্রথম এসে যায়, এই তাঁর এক নতুন উত্থান। আমরা যাঁরা কবিতা লিখি, ওই কবিতার একটা স্তরে আমরা শুধু জীবনেরই নয়, কবিতারও ছলনাজাল আবিষ্কার করে উঠতে পারি। তথাকথিত কবিতার চেয়ে ছদ্মবেশী আর কিছু নয়— মনে হয় কবিতা, ছন্দে লেখা, চিত্রকল্পে চমকপ্রদ, ধ্বনিতে মর্মরিত, রাজনৈতিক সংকেতে করতালি পাবার যোগ্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতাই কি ? কবিতার এই ছদ্মবেশ আর কবিতাকলার এই ছলনাজাল ভেদ করতে পারাটাই কবিযশোপ্রার্থীর প্রথম কাজ এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কবিদের বিরতিহীন কাজ বলে আমি মনে করি।

২৯. ল্যাজারাসকে মৃতদের দেশ থেকে উত্থিত করেছিলেন যিশু। তিনি ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট। কবিও তাই। প্রতিটি কবিতাই একটি প্রত্যাদেশ।